দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি আমার আলোচনার সময়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে থামার কারণ, এই সময়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শক্তিমান লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। এর পরে বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষ লেখা হয় নি। সম্প্রতি আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করছি। এই সব রচনা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কেননা এদের পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করি নি। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেশী ও বিদেশী লেখকের রচনায় আছে। সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন বোধ করি নি। আলোচনার সময় তাঁদের স্মরণে রেখেছি এই মাত্র।

ঐতিহাসিক তথ্য যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছি সেখানেই সংকলন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকর্মের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সংকলন করবার ইচ্ছে থাকলেও কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে ইচ্ছে পরিত্যাগ করেছি। কেবল গ্রন্থপ্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে পাঠকের সহানুভূতি প্রার্থনা করেছি। ইতিহাসের বই প্রায় সবই ইংরেজিতে। সেজন্য দীর্ঘ ইংরেজি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হয়েছি। এ ত্রুটি অনতিক্রম্য। যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রামাণিক বলে উদ্ধৃত করেছি সেগুলি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বহুজনগ্রাহ্য। আমার আলোচ্য সময়ে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল তার অনেকগুলির পরিচয় দিই নি। কেবল যেগুলির মূল্য আছে সেগুলির কথাই আলোচনা করেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য পরিচিত গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা অনুসন্ধান করেছি। জ্ঞাতসারে কোনো বই উপেক্ষা করি নি। এর পরেও যদি কোনো মূল্যবান বই অনালোচিত থাকে তবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের স্নেহে ও শাসনে এই বই লিখিত। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণার কাজ করি। তিনি যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তা চিরকাল আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমার অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন, তিনি আমার প্রণম্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন, সে কথা স্মরণ করি। বন্ধুবর শ্রীশিবচন্দ্র লাহিড়ীর উৎসাহ ও পরামর্শ এ বইয়ের পরম সম্পদ। এটি তার বন্ধুকৃত্য। আমি প্রুফ দেখায় দক্ষ নই। কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। আশা করি পাঠক এ ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন। বন্ধুবর শ্রীসুবিমল লাহিড়ী প্রুফ দেখার ব্যাপারে অকৃপণ সাহায্য করেছেন। আমার ছাত্রী শ্রীমতী রেখা রায় চৌধুরী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতীকে আশীর্বাদ জানাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভাগের শ্রীসুকুমার মিত্র নানা দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার পর থেকেই তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করেছি। তিনি সানন্দে তা স্বীকার করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে যাঁর কথা মনে পড়ছে সেই জ্ঞানতপস্বী সুধীরকুমার দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি অর্পণ করছি।

বি. দ.

উপক্রম

ইতিহাস ও উপন্যাস : তথ্য ও সত্য :

উপন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে সমালোচকবৃন্দও একমত নন। উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের ব্যর্থ চেষ্টা না করে কোনো সমালোচক উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়াও সম্ভব নয়। কেউ কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক' বিশেষণটি অনর্থক বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, উপন্যাসের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন রচনাটিকে উপন্যাস হয়ে উঠতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটি মেনে নিলে পৌরাণিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক উপন্যাস কথাগুলিও মেনে নিতে হয়। বস্তুত কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানাও হযেছে।

কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস কথাটি বহুকাল ধবে প্রচলিত। ইতিহাস-সম্পৃক্ত উপন্যাস যে প্রচলিত উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র একথা অনেকেই স্বীকাব করেন। এখন বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা যাক।

ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয়েও বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। যুগে যুগে ইতিহাসের সংজ্ঞার বদল হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক। আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে[1] তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। মানুষ অতীতের কাহিনীকে পুনঃসৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টির বিরাম নেই। কোনো এক সময়ে পুরাণ-কাহিনীই ছিল ইতিহাস। জনজীবনের আচার-নিয়ম, বিধিবিধান মানুষের কৌতূহলের বিষয়। তাকে জানবার আগ্রহে মানুষ অতীতচারণা করেছে। এই আগ্রহ কেবল এলোমেলো তথ্যসংগ্রহে অথবা ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত কাহিনীসংকলনে সীমাবদ্ধ রইল না। অতীতকাহিনী সুবিন্যস্ত ছিল ; ধারাবাহিকতা রক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হল। অতীতকাহিনী উদ্ধারে কল্পনা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে লাগল। এ যেন এক ধরণের সৌন্দর্যচর্চা। এর বিপদ যে গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিহাসবিদের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় এ রচনায় রইল না। তখন পণ্ডিতবর্গ ইতিহাসকে স্বমহিমায় স্থাপনে অগ্রসর

হলেন। মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হল যথার্থ ইতিহাস। ইতিহাস রচনায় বস্তুলীন মনোভাবের প্রাধান্যও দেখা দিল। বস্তুর বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাকে প্রকাশ করাই ঐতিহাসিকের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। অতীতের ঘটনার নিছক সংকলন আর ইতিহাসবিদ্‌কে তৃপ্তি দিতে পারল না। বস্তুবিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকাহিনীর আত্মার পরিচয় দিতে ঐতিহাসিক অধিকতর আগ্রহী হলেন। এখানেও বিপদের সম্ভাবনা। ইতিহাস ও পুরাণের ভেদরেখাটি অনেক সময়েই লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রধান লক্ষ্য হল তখন পরিবর্তনের সূত্রটিকে আবিষ্কার করা। এই পরিবর্তন নিয়মশাসিত এবং কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। ইতিহাস যাত্রী মানবের বিবরণ। একজন সমালোচক বলেছেন, 'The object of the study of history is the development of human societies in space and time.'

কিন্তু প্রাচীনকালে ইতিহাস ও সাহিত্য যমজ ভাই ছিল। ইতিহাসকে সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা বলেই গণ্য করা হত। কহ্লণ তো তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ রাজতরঙ্গিণী লিখেছিলেন কাব্যরীতির বিধিবিধান মেনে। তথ্যের অভাব দেখা দিলেই কল্পনা সে অভাব অনায়াসে দূর করে দিয়েছে। তথাপি ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত এইভাবেই। অতীত তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে মানুষের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে কল্পনাশ্রিত এসব রচনাতেই।

অতীতকে জানবার প্রত্যক্ষ উপায় নেই। অতীত হচ্ছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য। প্রত্নলেখ, পুথির সাহায্যে অতীতকে জানা যাচ্ছে। আবার চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংবাদপত্র এবং জনজীবনের পারিবারিক কাহিনীও অতীত সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেয়। কিন্তু যেহেতু এগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতা আরোপিত হবার সম্ভাবনা সেহেতু ঐতিহাসিকের কাছে প্রাগুক্ত তথ্যই অধিকতর মূল্যবান। এই জিজ্ঞাসা থেকে খননকার্য, আবিষ্কার ইত্যাদি চলল। প্রত্নতত্ত্বশালায় এর উদাহরণ মিলবে। এর ফলে তথ্য এত বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে যে কারও কারও ধারণা আর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। কেননা অতীতকে সমগ্রভাবে উদ্ধারের কোনো আশাই নেই।

ঐতিহাসিক অতীতের ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন। অথচ তিনি সত্য উদ্ধারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে কলিংউডের বক্তব্য হল, 'The historian must

ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হচ্ছেন সেই দলিল-দস্তাবেজের রচয়িতাদের সম্বন্ধেও তাঁকে অবহিত হতে হবে। বস্তুত প্রত্নলেখ, শিলালেখ, গুহালিপি, স্তম্ভলিপিতে যে কথা উৎকীর্ণ আছে সেগুলির বক্তব্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। কেননা যাঁরা লিখিয়েছেন এবং যাঁরা লিখেছেন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসমত কাজ করেছেন। ভিন্ন মতের অবকাশ নিশ্চয়ই সেখানে ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন ইতিহাসবিদের মনন এবং মননশাসিত কল্পনার। যে ভাবে অশোক কোনো একটি গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার সমাধান করেছেন, তাঁর গৃহীত পন্থা ছাড়াও অন্য কি পন্থা ছিল এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে ঐতিহাসিককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এক কথায় তিনি অতীত ঘটনার পুনরভিনয় করবেন। তবেই অতীত কথা কয়ে উঠবে। ইতিহাসবিদ্ যখন মানুষের বিবর্তনের কথা বলেন তখন তাঁকে কেবল মানুষের বহিরঙ্গ-জীবনের উপরই নির্ভর করলে চলে না। মানুষের কর্মচিন্তার অন্তরালে যে ধ্যান ও মনন ক্রিয়াশীল ছিল তার সন্ধানও তাঁকে করতে হয়। অতীত ইতিহাসবিদের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং এই স্মৃতি প্রামাণিক তথ্যসহযোগে প্রকাশিত হয়। এই তথ্য তাঁর কাছে অপরিবর্তনীয়। পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলির কোনোটিকেই তিনি বাদ দিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এখানে ইতিহাসবিদ্কে নির্বাচন করতেই হয়। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি তথ্য গ্রহণ বর্জন করেন। এখন দেখা যাচ্ছে অতীতের তথ্য-পুঞ্জের প্রামাণিকতা ঐতিহাসিকের মননে। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের সূক্ষ্ম বিচার করেন, তাদের তাৎপর্য আবিষ্কার করেন এবং নিজের মত করে উপস্থাপিত করেন। তথ্য প্রমাণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের রায়ই চূড়ান্ত। ব্রাড্‌লে বলেছেন, 'অতীতের ঘটনার বিবরণদানই ইতিহাসবিদের কাজ নয়। যা ঘটতে পারত সেকথাও তাঁকে বলতে হবে। ঘটে যা তা সব সত্য নয়। ঐতিহাসিকের মনোভূমিতেই ঘটনার সত্যতা।' এ তো কাব্যসাহিত্যের ব্যাপার। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও লক্ষ্য এইটি।

ঐতিহাসিকের কাছে অতীতের কোনো ঘটনা বা ঘটনাপরম্পরার কতকগুলি তথ্য থাকে। তিনি সে ঘটনাপুঞ্জকে কার্যকারণসূত্র অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করেন। এই বিন্যাসকর্মেও কল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর কল্পনা কখনও তথ্যকে বাদ দিয়ে নয়। আবার ঐতিহাসিক কেবল তথ্যকে 'সিজার্স এ্যাণ্ড পেস্ট' নিয়মে সাজিয়ে দেন না। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বিবেক অনুযায়ী ঘটনাগুলির যাথার্থ্য

কল্পনা অনিয়ন্ত্রিত অথবা যথেচ্ছাচারী হয় না। কেবল তাঁর কাল্পনিক চরিত্রগুলি তাঁদের নিজস্ব নিয়মে বিকাশ লাভ করবে। কলিংউড একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। কোনো একদিন সিজার রোমে ছিলেন এবং পরবর্তী কোনো দিনে তিনি ব্রিটেনে উপস্থিত। এ দুটি তথ্য ঐতিহাসিকের কাছে আছে। কিন্তু সিজার কি করে ব্রিটেনে উপস্থিত হলেন সে তথ্য পাওয়া যায় না। এখানে ঐতিহাসিকের কল্পনা-মনন কাজ করবে। তিনি '...filled up the narrative of Caeser's doings with fanciful details such as the names of the persons he met on the way, and what he said to them, the construction would be arbitrary : it would be in fact the kind of construction which is done by an historical novelist.' মনে হয়, ঔপন্যাসিক যাত্রাপথে সিজার এবং কাল্পনিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর যে সংলাপ রচনা করবেন সেখানে তিনি সিজারের চরিত্র সম্বন্ধে নানা স্থান থেকে যে তথ্য আহরণ করেছেন তার ভিত্তিতেই তা করবেন। এমন কি কাল্পনিক চরিত্রগুলিরও দেশ কাল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে তিনি অবহিত হবেন। কলিংউড উপন্যাস ও ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান।

অতীতের কাহিনীপ্রবাহে কতকগুলি মুহূর্ত আছে যেখানে সংঘাত, সঙ্কট, আবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক এই মুহূর্তগুলির প্রত্যক্ষ রূপ দিতে চান। ইতিহাসের মর্ম উদ্‌ঘাটন করার জন্যই ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। তথ্যের প্রতি আনুগত্য শিল্প ও তথ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে না। অতীতের মানুষের দুঃখযন্ত্রণা, আনন্দ-ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা-আবেগ রচনাকর্মে নিছক বাস্তবপ্রীতিই যথেষ্ট নয়। উন্মেষশালিনী প্রতিভার সাহায্যে ঔপন্যাসিক অতীতের মানবজীবনের রঙ্গমঞ্চকে বর্তমানকালে স্থাপিত করবেন। একটি নির্দিষ্ট কালের সত্যকে আবিষ্কার করবেন মানবজীবনের তরঙ্গক্ষুব্ধ ধারাবাহিকতায়। সেখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। সেই কালটির পরিবেশ, কালের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সংস্কার ও মুক্তির জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিক কল্পনাবলে পরিস্ফুট করবেন। তিনি তথ্যের বন্ধনেই বাঁধা পড়বেন না। মানবিক সংঘাতের টানাপোড়েন বিশ্লেষণ করতে গেলে শিল্পীর স্বাধীনতা তাঁকে গ্রহণ করতে হবেই। ঐতিহাসিকও বাস্তবকে চান। ঔপন্যাসিকও বাস্তবকে চান। এখানে দুইয়ে কোনো বিরোধ নেই। এই বাস্তবতার সন্ধানে কোনো

The Idea of History, p. 240

ঔপন্যাসিক সমসাময়িক কালকে নির্বাচন করেন, কোনো ঔপন্যাসিক দূর অতীতকে। দূর অতীতের সমধর্মী ও বিরোধী তথ্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি ঐক্যবদ্ধ রচনার প্রয়াসী ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক।

দূর অতীতের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত গভীর ও বিস্তৃত হবে উপন্যাসের বাস্তবতা তত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ঔপন্যাসিক তাঁর রচনাকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কববেন। বলা বাহুল্য, অতীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং ঐতিহাসিক যেখানে অসহায়, ঔপন্যাসিক সেখানে কিছুটা মুক্ত। তাঁর কল্পনা তাঁকে মুক্তি দেয়। তবে অতীত যদি দূরের না হয় তাহলে ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা-গ্রহণ অনেক সময় বিপদের কারণ হতে পারে। নিকট অতীত আমাদের জানা ব্যাপার। সেই জানা তথ্যের পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। ঔপন্যাসিকের সত্যবোধ এবং ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা এ দুইয়ের মিলনেই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম। কিন্তু এরকম ব্যাপারও কোটিকে গোটিক। যে বিপদের সম্ভাবনার কথা বলেছি তাকে অতিক্রম করবার জন্য ঔপন্যাসিক জানা তথ্যকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তার চারপাশে কল্পনার জাল বুনতে পারেন। এমন কি ঐ জানা তথ্য কখনও কখনও গৌণ হয়ে যেতে পারে। মুখ্য স্থান নেয় কল্পনা। সেজন্যই ঔপন্যাসিক ইতিহাসবীরকে এড়িয়ে যেতে চান। অন্তত ওয়াণ্টাব স্কট তাই করেছেন। আইভ্যান হো-তে প্রথম রিচার্ড ও জনের ভূমিকা মুখ্য নয়। তিনি কিংবদন্তী এবং দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যে কল্পনার জাল ফেলেছেন। নাটকে অবশ্য এরকম কল্পনার প্রাধান্য না দিলেও চলে। কেননা নাটক খুঁটি-নাটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এ সুযোগ ছিল না। কল্পনা করতে পারেন এমন তথ্যও তিনি বেশী পান নি। সেই কারণে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে (রাজসিংহ) ইতিহাসবীরই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। তিনি মানবজীবনের কতকগুলি মৌলিক বৃত্তির বিশ্লেষণেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এবং যেহেতু এই বীর সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা দূরে সেজন্য আমরা উপন্যাসের খুঁটিনাটির বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসে পাই না। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখক দূর-কালকে অবলম্বন করেন নিছক রোমান্সপ্রীতির জন্যই নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় অনেক সময়েই ঔপন্যাসিক দূরকালকে বর্তমান কালের আধারে স্থাপন করে কল্পনা করতে ভালবাসেন। অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে বর্তমান কালের জটিলতা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সাক্ষাৎ পান। বস্তুত বর্তমান কালও তো অতীতকালের সৃষ্টি। সেই শৃঙ্খলসূত্র আবিষ্কার করাই তাঁর ধর্ম। অতীত গোপনে কাজ করে যায় বর্তমান কালের মধ্যে। বর্তমানের দর্পণে অতীত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্কট

অতীতকে বাস্তবায়িত করেছিলেন এইভাবেই। তাঁর উপন্যাসের নায়ক বড়ো মাপের নয়। মধ্যবিত্ত জাতীয়। দুইটি বিবদমান শরিকের মধ্যে আন্দোলিত মানুষের কথা তাঁর উপন্যাসে পাই। আবার এই সাধারণ মানুষ, দেশ, কাল সম্বন্ধে গভীর মনোযোগী ছিলেন বলে টলস্টয়ের ওঅর এ্যাণ্ড পীস উপন্যাস হিসাবে অদ্বিতীয়। এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে ইতিহাসবীরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক একেবারে উদাসীন থাকবেন। বীর চরিত্রের কর্মচিন্তার সঙ্গে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধনে উপন্যাসের সার্থকতা। বীর চরিত্রের আবেগ অনুভূতি এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাব উৎস দেশের কালের মধ্যেই— সেইটিই তার মহত্ত্বের উৎস। আসলে সাধাবণের আকাঙ্ক্ষাই ইতিহাসবীরের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি পাক—এই ছিল ঔপন্যাসিকেব প্রচেষ্টা। রাজসিংহ, আনন্দমঠে সে চেষ্টা আছে। মৃণালিনীতে এর অভাবই উপন্যাসটির ব্যর্থতার কারণ। স্কটেব উপন্যাসে ইতিহাসের নায়কেরও একটা ভূমিকা থাকে। এইভাবে দেখি কেবল রোমান্স নয় ঔপন্যাসিকের একটি গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনে ইতিহাসের নায়ক সক্রিয় বলে লেখকের মমত্ববোধের সঙ্গে পাঠকের সহানুভূতির মিলন ঘটে।

-বর্ণিত কালের ঐতিহাসিকতা এবং বাস্তবতা পরিস্ফুটনের জন্য ঔপন্যাসিক অনেক সময় নাটকীয কৌশলের আশ্রয় নেন। কতকগুলি নির্বাচিত ঘটনার ওপর তীব্র আলো ফেলে তিনি ঘটনার অসাধারণত্ব ফুটিযে তোলেন। একটি গৌরবময় যুগের প্রতিষ্ঠা অথবা পতনের কাহিনী রচনায় অনেক ঔপন্যাসিক আগ্রহ বোধ করতে পারেন। ধীবোদাত্ত বীরেব বর্ণনায় বিস্ময়, শঙ্কা, শ্রদ্ধা, ঘৃণা ইত্যাদির সমাবেশে উপন্যাসটি পরিণামরমণীয় হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ আছে। বীরচরিত্রেব শৌর্যবীর্যেব যথার্থ রূপ আকার পেয়েছে ঐ উপন্যাসে। তিনি ইতিহাসের বাতাবরণ প্রতিষ্ঠায় এখানে সার্থক। আবার কোনো ঔপন্যাসিকেব লক্ষ্য আরও ব্যাপক। তাঁর দৃষ্টি সমতল-মুখী। ইতিহাসের প্রবাহে কেবল রাজারাণীকেই উৎক্ষিপ্ত করে না। সাধারণের মধ্যেও তার আলোড়ন অনুভব করা যায়। পিতাপুত্র, বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকপ্রেমিকা ইত্যাদির সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হয়ে যায় ইতিহাসেব এক একটি স্মরণীয় অধ্যায়ে। এই সম্বন্ধগুলির সূক্ষ্ম টানাপোড়েন, শিহরণ-কম্পন রচনা করাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। একথা ঠিক, খুঁটিনাটি তথ্য উপন্যাসে কাম্য। কিন্তু মানুষের জীবনেব অপরিহার্য ও অনিবার্য উপাদানগুলির প্রকাশেও মানবসত্তার মূল্যায়ন সম্ভব। এর মধ্যেও কালের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার পর ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। তাদের চমৎকারিত্বও অনস্বীকার্য।

লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু যে নিগূঢ় কামনা বাসনার আলোড়নে ঘটনা সংঘটিত হয় সে বিবরণ ঔপন্যাসিকের কাছেই লভ্য, ঐতিহাসিকের কাছে নয়। লুকাস বলেছেন, '· in the secrets of the human heart, whose motions are neglected by the historians. The characters of a novel are forced to be more rational than historical characters.' ইতিহাসে প্রাপ্ত মানুষগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত। উপন্যাসে প্রাপ্ত মানুষ তাঁদের আবেগ-অনুভূতির নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে। অতি দূরেব চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিকের বাধা অনেক। অতীত জীবনেব পুনরভিজ্ঞতার সাহায্যেই কেবল গতিচঞ্চল চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব। লেখকের অভিজ্ঞতায় তাদের জন্ম। ঐতিহাসিকের কাছে কোনো তুচ্ছ ঘটনা ঔপন্যাসিকেব কাছে ব্যঞ্জনাময় হতে পারে। বস্তুত ঐতিহাসিকও যে সব সময় এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দেয় তা নয়। E. H. Carr দেখিয়েছেন যে কোনো এক শতাব্দের ঐতিহাসিক যে তথ্যকে পাদটীকায় স্থান দিয়েছিলেন পরবর্তী শতাব্দে সে তথ্য অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইতিহাসজিজ্ঞাসা শতাব্দে শতাব্দে পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইতিহাসের ভিন্নতা। উপন্যাসেও এই ভিন্নতার অবকাশ আছে। অনেক সময় ঔপন্যাসিকেব জিজ্ঞাসা ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত হয়, অনেক সময় হয় না। ঔপন্যাসিকেব লক্ষ্য কেবল অতীতের বিবরণ দান নয়, সেই কালের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন। ইতিহাসের কোনো বিপর্যয় অথবা বিকাশ জনচিত্তে প্রবল অলোড়ন তুলল। সেই সংঘাত, বিক্ষোভ অথবা উত্তেজনাকে সঠিক পথে চালনা করা ইতিহাসবীরের মুখ্য অভিপ্রায়। জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরে সেই আলোডন ও চাঞ্চল্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঔপন্যাসিকের কর্তব্য সেই সমস্ত চিত্রিত কবা। জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কবেন ঔপন্যাসিক। এ ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে (প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুনশী', 'লাল কেল্লা', তারাশঙ্করের 'রাধা' এবং 'গন্না বেগম' ইত্যাদি) দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে নায়কচরিত্রের শক্তির উৎস এই সাধাবণ মানুষ। নায়কচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনও এর জন্য দায়ী।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাব বিবরণে সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য থাকে। কিন্তু এ বিবরণও মানুষের দ্বন্দ্বসংঘাতের সূত্রেই লব্ধ। বর্ণবহুল

বিবরণে মানুষের আবেগ অনুভূতি স্পন্দিত হবে। ঘটনাগুলিও অর্থবহ হয়ে উঠবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এপিকের ভূমিকা নগণ্য নয়, কিন্তু এপিক নায়ক-সর্বস্ব , উপন্যাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং অল্পজ্ঞাত চরিত্রেরও উজ্জ্বলতা।

অতীতের ঘটনাপরম্পরা অনেক সময় অসংলগ্ন মনে হয়। কিন্তু এই আপাত অসংলগ্নতার অন্তরালে কার্যকারণ সূত্র নিশ্চয়ই রয়েছে। ঘটনাবলীর মধ্যে একটা সমগ্রতাও আছে। একটি কেন্দ্রীয় ঘটনার চতুর্দিকে বিভিন্ন ঘটনার আবর্তন লক্ষ্যগোচর হয়। কেন্দ্রীয় ঘটনার তাৎপর্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার নিরিখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যা ছিল অসংলগ্ন তাকে পাই সামগ্রিক দ্যোতনায়। অতীতের প্রতি আনুগত্যে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। ঐতিহাসিক অতীতের তথ্যের সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হন। ঔপন্যাসিক সেই সব তথ্যকে বিকৃত করেন না। তিনি সেই সাধারণ সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নবান হন। ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট অথবা প্রাপ্ত চরিত্রের প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার মধ্যে সেই সাধারণ সত্যের প্রতিফলন দেখতে পান। যতই ঔপন্যাসিক সেই সাধারণ সত্যের রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন ততই তাঁর চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ইতিহাসের অমোঘ চাপ ও টান সেই সব চরিত্রের মর্মে চাঞ্চল্য আনবে। অতীতের এমন সব কর্ম, চিন্তা, ভাবনা আছে যেগুলির আকর্ষণ আমাদের কাছে দুর্বার। সেই সব কর্ম, চিন্তা, ভাবনা (যা ঘটনা বা চরিত্র আশ্রিত) আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, আমরা সাড়াও দিই। সেই সব ঘটনা বা চরিত্রের আশ্রয়েই ঔপন্যাসিকের অন্তরাত্মা জেগে ওঠে। তাদের সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করেন। তখনই ইতিহাস হৃদয়দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে মুখর হয়ে ওঠে। সাধারণের সুখদুঃখ স্পর্শ করবার জন্য ঔপন্যাসিক অনেক সময়েই বিপ্লব অথবা বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক সময়টি নির্বাচন করেন না। তিনি হয় বিপ্লবের আগেকার অথবা পরেকার সময়কে নির্বাচন করেন। কারণ বিপ্লব অথবা বিপর্যয়ের সময় ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার প্রতি মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় না। নাটকের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই সময়টিই বেশী উপযোগী। বঙ্কিমচন্দ্র যুগান্তকারী ঘটনাকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-সমসাময়িক কালে এমন ঔপন্যাসিকের অভাব নেই যাঁরা শান্ত, ঐশ্বর্যপূর্ণ কালকেই গ্রহণ করেছেন।

ঔপন্যাসিককে ঐতিহাসিক বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে এটা ঠিক। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক বিবেক—পাত্রপাত্রী নির্বাচনে, ঘটনা নির্মাণে, আবেগ অনুভূতির প্রকাশে, চরিত্রচিত্রণে শিল্পী সত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই

রবীন্দ্রনাথ কথিত ঐতিহাসিক রসের স্বরূপ উপলব্ধ হবে—অতীত জীবন্ত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূল রাগিণী বাজে, এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূর-বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।' এখানে রবীন্দ্রনাথ 'সমুদ্রগর্জন', 'রুদ্রবীণা', 'মহান কলসংগীত', 'বৃহৎ ব্যাপার' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরাটত্ব, বিশালতাকে নির্দেশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এরকম উপন্যাসই উনবিংশ শতাব্দের শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে এরকম উপন্যাসকেই বোঝাত। কিন্তু আমরা দেখেছি, ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণ জীবনের অনুগতিও কম আকর্ষণীয় নয়। উনবিংশ শতাব্দে (বাংলাদেশের প্রসঙ্গে) মহাকাব্যের আদর্শলোক শিক্ষিত সাধারণকে আকর্ষণ করেছিল। মহাকাব্য বচনাব ধাবা অচিরেই বন্ধ হয়ে গেল। মহাকাব্যকে সরিয়ে দিয়ে উপন্যাস আপন স্থান করে নিলে। মহা-কাব্যকে সরিয়ে দিলে বটে, কিন্তু মহাকাব্যের স্পিরিটকে ভুলতে পারলে না। বঙ্কিমের উপন্যাসে মহাকাব্যের সেই গর্জনধ্বনি, রুদ্রবীণার ঝংকারের মত বৃহৎ ব্যবস্থায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসে দূরত্বের কথা বারংবার বলেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমবা কালের যাত্রার পদধ্বনি শুনতে পাই না। এই কুলটানা জীবনে মহাকালের গম্ভীর যাত্রা আমাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। বৃহতের স্পর্শে চিত্ত বিস্ফারিত হয়। এই মহাকালের স্বরূপ উদ্ঘাটন ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসে মহাকাব্যের উপাদানকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি কবিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ—ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ।' শেক্সপীয়রের 'অ্যাণ্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা'র প্রণয়কাহিনীর অনুরূপ ঘটনা সাধারণ জগতে অহরহ ঘটছে কিন্তু যখন সেই প্রণয়কাহিনী ঐতিহাসিক বিপ্লবের উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত হয়, প্রণয়ীযুগলের হৃৎস্পন্দন মহাকালের যাত্রাধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়, তখন কাহিনীতে বিস্তৃতি এবং

বিরাটত্বের মহিমা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 'হৃদয়বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন' যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, শিল্পীর প্রয়াসই এখানে মুখ্য। ইতিহাসবিদ্‌দের নয়। ঐতিহাসিকের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের পার্থক্য দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুব প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই।' ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কর্ম রস সৃজন করা। কিন্তু ইতিহাসেব সত্যের প্রতি ঔপন্যাসিকের 'খাতির' কি একেবারেই নেই! আমার মনে হয়, খাতির কেন, এই সত্য উদ্ঘাটিনে তিনি সমান তৎপর। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে বাহুবলেব ক্রিয়াকলাপই লক্ষ্য করেন নি; যে অবিচার সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁব সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রজাসাধারণের উপর কবেছিলেন তার প্রতিক্রিয়া যে কি ভয়াবহ এবং কি মর্মান্তিক হতে পারে সেকথা বঙ্কিম এই উপন্যাসে বলেছেন। 'Great Moghuls'-এর পতন তিনি ইতিহাসের সত্যের আলোকেই দেখেছেন। উপন্যাসে ইতিহাসেব ত্রুটিবিচ্যুতি একেবারে নেই এমন কথা বলি না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে অগ্নিপ্রজ্বলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন তা ইতিহাসেব ক্রমকেই অনুসবণ কবেছে। এজন্যই রাজসিংহ যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। দুর্গেশনন্দিনী ঐতিহাসিক রোমান্স। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতাবাম ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস।

. ঐতিহাসিকেব কৌতূহল থেমে নেই। আগে বলেছি তথ্য আহবণের কি বিপুল চেষ্টা চলেছে পৃথিবী জুড়ে। তথ্য আবিষ্কারের ফলে দূব নিকট হচ্ছে, অতীত তার সমগ্রতা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক তথ্য আহরণের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। ভাবতবর্ষের ইতিহাস বচনায় ' Attempts are being made at re-examining the texts in the light of our contemporary understanding of the theoretical model of the caste system, varna.'[১] ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় নূতন দিগন্তেব কথা বলেছেন শ্রীমতী থাপার, '...Archaeology is now the major source of fresh evidence, since it is unlikely that large numbers of literary sources still remain to be discovered.'[২] ঔপন্যাসিক এই

তথ্য থেকে জীবনরস নিষ্কাশিত করবেন। এই তথ্য আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাস্তবতার দাবিকে সহজেই মেটানো সম্ভব। অতীতের বৃহৎ ব্যাপার ছাড়াও বায়্যানির শঠতা, বৈদ্যের কৌশল, বিপ্রের মূর্খতা, বাণিজ্য-ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র সহজেই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গতিপ্রকৃতিও নির্ধারিত হতে পাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে পরিশ্রমী হতে হয়। তাঁকে কালানৌচিত্য দোষ থেকে মুক্ত হতে হবে। নিছক গল্পখোব পাঠকেব দিকে লক্ষ্য রেখে চরিত্রেব বিকৃতি ঘটাতে তিনি কিছুতেই পারেন না। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায বর্তমান কালে আগ্রহ সূচিত হচ্ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীব 'বেণেব মেয়ে' উপন্যাসে এই প্রচেষ্টা আছে। কাল্পনিক চরিত্রগুলি যে বিশেষ সামাজিক কাঠামোয় নিক্ষিপ্ত হয়, তাবা সেই কালেব সেই সমাজেব বলে পবিচিত হয়।

প্রথমনাথ বিশী বলেছেন, 'ইতিহাসেব সত্য ও ইতিহাসেব সম্ভাবনা ঐতিহাসিক উপন্যাসেব উপাদান। ইতিহাসেব সত্য অবিচল, তাকে বিকৃত কবা চলে না। ইতিহাসেব সম্ভাবনায় কিছু স্বাধীনতা আছে লেখকের। সত্যের অপব্যবহার কবি নি, সম্ভাবনার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহাব করতে চেষ্টা করেছি।' এই সম্ভাবনা অনন্ত। কেননা ইতিহাসও ব্যক্তিমানসেব সৃষ্টি। সফল সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁদেব বচনায় পাওয়া যাবে না। এখন ঔপন্যাসিকের কাছে এই সম্ভাব্য বস্তু অতীতেব বঙ্গমঞ্চ থেকে সন্ধান করতে হবে। 'কেবী সাহেবের মুনশী'তে বেশমী, পার্বতী, টুসকি, ফুল্‌কি চরিত্রগুলি এই সম্ভাবনার দিকটিকে বাস্তব করে তুলেছে। এখানে জীবনীর সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য। জীবনী এক জাতীয় ইতিহাসই। অবশ্য লিটন স্ট্রাচি, আন্দ্রে মোবয়াঁব জীবনী রচনার ইতিহাস আলোচনা কবলে দেখা যায় সেখানেও ব্যক্তিপুরুষটিকে বিকশিত করবার জন্য তাবা জীবনীব কতকগুলি চূড়ান্ত শিখরকেই স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন। একজন তো বলেছেন ভাল জীবনী **not made but grows,** উপন্যাসও তাই। কিন্তু জীবনী বচনায় কল্পনার স্থান নেই। উপন্যাসে আছে।

ইতিবৃত্ত রচনায পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ ইতিহাসবিদ্‌দের সম্বন্ধে নূতন কবে চিন্তা করতে আরম্ভ কবেছেন। ইতিহাস বচনার আদর্শ পরিবর্তিত হচ্ছে বারবার। ইতিহাস পক্ষপাতশূন্য হতে পাবে না। কাবণ ঐতিহাসিক সামাজিক নীতিনিয়ম শাসিত, রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথবা কোনো বিশেষ ভাবনার দ্বারা চালিত। যুগের আন্দোলন, যুগের আকাঙ্ক্ষা ঐতিহাসিককে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য করে। **Charles A. Beard**

বলেছেন, '...facts, multitudinous and beyond calculation...do not select themselves or force themselves automatically into a fixed scheme or arrangement in the mind of the historian. They are selected and ordered by him as he thinks.'[১] পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করবেই। উপন্যাসেও লেখকের ধর্ম-বিশ্বাস, নৈতিক চেতনা, স্বদেশমনোভাব বিষয় নির্বাচনে এবং কাহিনী রচনায় বিশেষ ক্রিয়াশীল থাকে। ঐতিহাসিকই যদি বস্তুবিচারে নিরপেক্ষ থাকতে না পাবেন তবে ঔপন্যাসিকেব পক্ষে তা আরও সম্ভব নয়। যেমন পৌরাণিক কাহিনীর নবমূল্যায়ন (শ্রীশচন্দ্র সেন, ত্রয়ী কাব্য) হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকও তথ্যের নবমূল্যায়ন করতে পারেন। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস সাহিত্য। রসের খেয়া পারাপার করানোই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। সেজন্য বস্তুভার নয়, তথ্যলোলুপ সংগ্রহ নয়—অতীত লেখকের হৃদয়স্পৃষ্ট হয়ে নবজন্ম লাভ করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে। অতীতের কাহিনীর মধ্যে বর্তমান কালের সাক্ষাৎ ঘটে। ' Turn the past into a parable of the present.'

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস :

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের উল্লেখও আছে। ইতিহাস বলতে বোঝাত 'ইহা এইরূপ ছিল' (ইতি হ আস)। ইতিহাসের অন্য কতকগুলি অর্থও পাই, যেমন কথা, পৌরাণিক আখ্যান, ঐতিহ্য, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস (আধুনিক অর্থে) রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। এর কারণ আগে আমাদের দেশে জাতীয় চেতনা ছিল না, সব-কিছুই কর্ম-চক্রের ফল বলে ধরা হত। সুতরাং অতীতের সম্বন্ধে তেমন কৌতুহল সেকালের লোকের ছিল না। এজন্যে বাণভট্টের 'শ্রীহর্ষচরিতে' ইতিহাসের সঙ্গে আরও বিভিন্ন বস্তু মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমাদের দেশের পুরাণগুলিও ইতিহাস আখ্যা পেয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য, পুরাণগুলি সমাজেতিহাস নয়। এমন কি কহ্লণের বই সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকরা নানা আপত্তি তুলেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেগুলিকে চম্পূকাব্য বলা হয় সেগুলি রচনার মূলে যে খাঁটি ঐতিহাসিক প্রেরণা ছিল না এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং ইতিহাস রচনার উৎসাহই যে-সাহিত্যে

নেই সে-সাহিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনীর যাথার্থ্যবিচার সম্ভব নয়। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের যেমন, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মও উনবিংশ শতাব্দীতে।

উপন্যাস অর্থটির বীজ রয়েছে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে। শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিলে রাজা দুষ্মন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কিমিদং উপন্যস্তম্'। অর্থাৎ 'একি কল্পিত কাহিনী বলছ'। এখানে স্পষ্টতঃ উপন্যাস মানে কল্পিত কাহিনী। আধুনিক কালে উপন্যাস বলতে আমরা কল্পিত কাহিনীই বুঝি। ইংরেজী Novel এবং Fictionএর (এ দুটোর অর্থ-পার্থক্য স্মরণে রেখেই বলছি) বাংলা কেন যে উপন্যাস হয়েছে তার কাবণ বোধ করি এই।

আধুনিক কালে ইতিহাস কথাটি যে অর্থে চলছে বাংলা সাহিত্যে প্রথমে সেই অর্থে ইতিহাস শব্দটি ব্যবহৃত হত না। বানানো গল্প বা ঐতিহাসিক গল্প এই দুই অর্থেই ইতিহাস কথাটি প্রযুক্ত হত। কেবীব 'ইতিহাসমালা'ব কাহিনী সবগুলো বানানো। অথচ কেবীর বইয়েব নাম ইতিহাসমালা। তুতিকাহিনীব অনুবাদ হল 'তোতা ইতিহাস'। Persian Talesএর অনুবাদ হল 'পারস্য ইতিহাস'। Arabian Nightsএর অনুবাদ পাচ্ছি 'আবব্য ইতিহাস'। বলা বাহুল্য, এই সবগুলি বইই গল্প-কাহিনী। ইতিহাস যে গল্প-কাহিনী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই বইগুলিই তাব প্রমাণ। ভারতচন্দ্র থেকে বাধামোহন সেন অবধি বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বলতে গল্প-কাহিনী এবং অতীতেব কাহিনী এই দুইই বোঝাত। প্রাচীন কবিবা—যেমন কবিকঙ্কণ[১], ভারতচন্দ্র[২], মানিকবাম—তাঁদের কাব্যকে স্থানে স্থানে ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পবে যখন ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হল তখন ইতিহাস ও উপন্যাসেব পার্থক্য সম্বন্ধে লেখকবৃন্দ সচেতন হলেন। নীলমণি বসাকের বইয়েব নাম ছিল প্রথমে 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৩৪), পরে এব নাম হল 'পারস্য উপন্যাস' (১৮৫৬)। ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্যটি সূচিত হবাব পবই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার

---

১. শুন শুন ঠাকুরানী কহি আমি হিতবাণী
ইতিহাসে কর অবধান।
নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।
সঙ্গে হৈল দেবী পূজার ইতিহাস।।

২. ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা।।

সূত্রপাত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে পূর্বের গল্পবৈশিষ্ট্যও রইল আবার তথ্যপ্রমাণও সংযোজিত হল। ঔপন্যাসিকেরা এর জন্যে গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে লিখেছেন, ইতিবৃত্তমূলক, ইতিহাসাশ্রিত, সত্যঘটনামূলক, ঐতিহাসিক উপন্যাস বা কাহিনী।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ইতিহাসের টেক্সট বই লেখা হতে লাগল পুরোদমে। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি। আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯): হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন ; প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০): মার্শম্যান (John Clark Marshman), গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৩৩): ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ; ভারতবর্ষেব ইতিহাস (১৮৪০): গোপাললাল মিত্র ; বাঙ্গালাব ইতিহাস (১৮৪০): গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ ১৮৪৮): ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড ১৮৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৯): বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সারাবলি (১৮৫১): নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাবের রাজাবলির (১৮০৮) কথাও স্মরণ করতে পারি। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে ইতিহাস পাঠে আমাদের আগ্রহ প্রবল হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের টেক্সট বইও লিখেছেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এ দুইয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন।

২

যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচাবেব পূর্বে ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতার আলোচনা প্রয়োজন। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে বর্তমানের দাবিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিলেই অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। চৈতন্যদেবের পদরেণু স্পর্শে একবার জাতি বর্তমান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল—প্রণমোহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। ফলে দেবলোকের কথার পাশাপাশি মর্তজীবনের সুখদুঃখও সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার যে ষোড়শ শতাব্দীকে *precursor* to renaissance বলেছেন সে কথা সর্বৈব সত্য। এজন্যে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে সমসাময়িক মানুষের পদাঙ্ক পড়েছে। কিন্তু এ চেতনা অচিরেই নিঃশেষিত হয়। কেননা দেশে তখন আধুনিকতার প্রস্তুতি ছিল না। তখন পর্যন্ত ভক্তিরস ছাড়া মানবরসের সন্ধান

ইতিহাসরস বলতে যা বুঝি সে বস্তু সেখানে নেই, থাকতেও পারে না। চৈতন্য-জীবনীকাব্য গ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিকতা (যা অপ্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত) ইতিহাসের তথ্য-অনুগতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দেশের কূলে কূলে বিদেশীর আনাগোনা চলছিল। দেশ যখন নানান দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন একদিন ঘুম ভাঙিয়ে, পাড়া মাতিয়ে 'বর্গী এল দেশে'। বিদেশেব আবহাওয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচিত্তকে প্রাচীনের বেড়া ডিঙিযে নবীনকে হাতছানি দিচ্ছিল। সেজন্য ভাবতচন্দ্রেব কাব্যে পাই, 'নগব পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। ভারতচন্দ্রকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল এই বলে—

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥

এ সুব নাগবিকতাব এবং নবীন সাহিত্যেব ইঙ্গিতবাহীও বটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে, ঐতিহাসিক ছড়ায়, গানে এই নতুন সুর। গঙ্গারাম দত্তেব 'মহাবাষ্ট্র পুবাণ' এই পর্যায়েব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু নামেই প্রকাশ কাব্যকাহিনীতে ইতিবৃত্তের অসদ্ভাব না থাকলেও বইটি পুরাণশ্রেণীভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অসংখ্য ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা বেরিয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই না ইতিহাস না বিশুদ্ধ কাব্য। (কাব্য কথাটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করছি)। ইতিহাসাশ্রিত কবিতাগুলিতে কোথাও রাজমালা, কোথাও বংশগরিমা, কোথাও স্থানীয় স্মরণীয় ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে। শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই-গুলিকে এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—রাষ্ট্রকথা, রাজকাহিনী, দুর্যোগবার্তা সংঘাতচিত্র।[১] রাষ্ট্রকথার অন্তর্গত এই গ্রন্থগুলি: মহারাষ্ট্রপুরাণ, অন্নদামঙ্গল, তীর্থমঙ্গলকাব্য, ববদামঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গগীতিকা, মহাপ্রস্থানের ছড়া ইত্যাদি। রাজকাহিনীর অন্তর্গত এইগুলি: কৃষ্ণমালা, রাজমালা, গাজীনামা, কীর্তিচন্দ্রের গাথা, কান্তনামা বা রাজধর্ম, প্রতাপচন্দ্র, লীলারস সঙ্গীত, বেহারোদন্ত, রাজবংশাবলী। দুর্যোগবার্তা পর্যাযেব কবিতাগুলি: দামোদরের বন্যা, ময়ূরাক্ষীর বন্যা, কীর্তিনাশার প্লাবন, ত্রিপুরার ছড়া, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া এবং কাহিনী। সংঘাতচিত্র পর্যায়ে পড়ে নানা ছোটোখাটো বিদ্রোহ নিয়ে লেখা কবিতা—যার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বলা বাহুল্য এইসব

কাহিনী-ছড়াতে সাহিত্যপ্রচেষ্টা কিছু ছিল না। রাজমহিমা, বংশগরিমা, কিংবা বিদেশীর আক্রমণে বিপর্যস্ত সমাজবৃত্ত কোনো কোনো কাহিনীর উপজীব্য। তবে এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনায় ফাঁকে ফাঁকে কবির ব্যক্তিগত শোক-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। এবং সেইখানেই কাব্যত্বের স্পর্শ লেগেছে। দুর্যোগবার্তা, সংঘাতচিত্র পর্যায়ের ছড়াগুলিতে দেশের কথা দশের কথা আছে। দেবনাথের তিতুমীরের অনুচব কর্তৃক নিধনের পর কবি এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

কইতে ফাটে বুক, বড় দুঃখ, রায় মারা গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥

এর প্রথম ছত্রে কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকম্পনটি লক্ষণীয়, দ্বিতীয় ছত্র প্রথার অনুকরণ। এমন আরো অনেক আছে। গ্রাম্যজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, সংঘাত প্রবল আলোড়ন তুলত। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে এই আলোডনের স্পর্শ লেগেছে যদিও বর্ণনা প্রায়ই বাস্তবতাকে ছাডিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে করে ঘটনাব গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নি ; কবিরা দুর্যোগের সালগুলিকে ঠিক মনে রেখেছেন—

এগারশ চৌরানব্বই ত্রিপুরের সন।
অন্নাভাবে প্রজা ক্ষিতি হইল নিধন ॥

অথবা

বিধাতা জন্মের কালে সন ১২৭৩
বার তিহাত্তর সালে পরাধীনের ভাগ্যে কি লিখিল
অন্য সুখ জাহা হোক লক্ষ্মীহীন যত লোক পেটভরা অন্ন না পাইল।

এইসব সাল তারিখ পাঠককে অতীতেব জগতে নিয়ে যায়।

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাগুলি সাময়িক ঘটনাজাত, এগুলিতে কাল-জয়িত্বের স্বাক্ষর নেই।

তথাপি দেশের কথা, অতীতেব কথাকে কাব্যে স্থান দিয়ে এঁরা একটা বড়ো কাজ করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টিকে ইহলোকমুখী করে তুলতে এ সমস্ত গাথা ছড়া কবিতা বিশেষ সহায়তায় এসেছিল। কিঞ্চিৎ ইতিহাসচেতনাও জাগিয়েছিল। এইগুলির মূল্যও সেইখানে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও জাতীয় জীবনে এইরকম কাজ করেছিল। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে একটা ন্যায়নীতি বেশ স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল তারও সূচনা এই সমস্ত ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাতে। এগুলি যে এককালে দেশের লোকেব মনের ভোজ্য যুগিয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সী সাহেবসুবোদেব রচনার মূল্য সকলেই স্বীকাব করেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' উপন্যাস নয়, জীবনীগ্রন্থ মাত্র। গ্রন্থটির কতকগুলি তথ্য ঐতিহাসিক, কতকগুলি জনশ্রুতি, কিছু ভাবতচন্দ্র থেকে নেওযা। বাংলাদেশের ইতিহাস জানবাব জন্যে পাঠক যে উৎসুক ছিলেন সে কথা রামবাম গ্রন্থের আরম্ভেই বলেছেন। কিন্তু 'আনুপূর্বক না জাননতে ক্ষোভিত হয'। বামরাম সেজন্যে প্রতাপাদিত্যজীবনী লিখলেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁহাব (অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের) বিবরণ কিঞ্চিত পাবস্য ভাষায গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহাবদিগেব স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহাব আপনাব পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আব ২ অনেকে মহাবাজাব উপাখ্যান আনুপূর্বক জানিতে আকিঞ্চন কবিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে'। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেব উদ্দেশ্য নিয়ে এ বই লিখিত। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রাথমিক প্রযোজন উপেক্ষিত, আবেগ অনুভূতিব প্রাধান্য স্বীকৃত। সেখানেই এই বইয়েব সাহিত্যিক মূল্য। এই বই যে ঐতিহাসিক উপন্যাসেব আদিরূপ তাতে সন্দেহ কববাব কাবণ নেই।

বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েব 'মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্য চবিত্রং'ও পাঠ্যপুস্তক। সিভিলিযানদেব জন্যে লেখা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানাদিক থেকে বাংলাব সমাজ ও সাহিত্যে স্মবণীয়। স্বভাবতই বাঙালী লেখকের উপজীব্য হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র। বলা বাহুল্য, ভাবতচন্দ্রেব কাব্য এ বইয়েব উৎসস্থল।[১]

ফোর্ট উইলিযম কলেজের মধ্যমণি উইলিয়ম কেবীব 'ইতিহাসমালা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটিব নামপত্রে আছে: 'A collection of stories in the Bengali Language. Collected from various sources.' গল্পগুলিব বিভিন্ন উৎস বলতে নিশ্চয়ই জনশ্রুতিই কেবীব লক্ষ্য ছিল। অনেকগুলি গল্পেব সমাপ্তিতে উপদেশটি লিপিবদ্ধ কবা আছে যেমন আছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশেব গল্পগুলিতে। কেরী ছিলেন মিশনরী। সুতরাং বাইবেলেব অনুরূপ গল্পচ্ছলে নীতিকথা বলবার ইচ্ছাও কেবীব ছিল। ঈসপেব গল্পগুলিব কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পাবি।[২] অর্থাৎ গল্প বলার দেশী ও বিদেশী

১. এই বইটি সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায: 'ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংখ্যা, ১৩৬০।

২. এই প্রসঙ্গে কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ গ্রন্থের গল্পগুলির আকৃতি প্রকৃতি স্মরণীয়।

আদর্শটি কেরীর ধ্যানে ছিল। বাংলা গল্প-উপন্যাস গঠনে কেরীর বইটির মূল্য অপরিসীম। ইতিহাসমালার ৪৬ সংখ্যক গল্পটি বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য এবং ভাঁড় মহেশের কাহিনী, ১০৯ সংখ্যক গল্পের বিষয় রূপগোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী ও ১৪৭ সংখ্যক গল্পটি আকবর শাহ ও বীরবর (বীরবল)কে নিয়ে লেখা। এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ৪৬ সংখ্যক গল্প গোপাল ভাঁড়ের গল্পের অনুরূপ। সনাতনের গল্পের কোনো ইঙ্গিত চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে নেই, কেবলমাত্র নাম দুটি ছাড়া। ১০৭ সংখ্যক গল্পও কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের উপর স্থাপিত নয়। সুতরাং এগুলি ইতিহাসের ছায়ায় নিছক গল্প মাত্র। এবং এগুলিতে গল্পরসই মুখ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনায়ও এজন্যে এ বইটির মূল্য অনস্বীকার্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীর কৃতিত্ব হচ্ছে এখানে যে এঁরা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েও স্বকীয় ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেরী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেন নি। রামরাম বসু, রাজীবলোচন প্রমুখ লেখকবৃন্দ এমন কতগুলি বিষয় নির্বাচন করলেন যেগুলি সমসাময়িক বাঙালীর পরিচিত, যে সমস্ত বিষয় শুনতে পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল আত্যন্তিক। এঁরা সেই কৌতূহল এবং আগ্রহের আনুকূল্য করে জাতীয় প্রবণতাকে পুষ্ট করেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস গঠনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানে যেখানে কলেজের লেখকবৃন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতেও এঁরা সাহায্য করেছেন। রামরাম বসু তো বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি জনপ্রিয় চরিত্ররূপায়ণের পথিকৃৎ।

৪

দুটি ইংরেজি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই করতে হয়। একটি টডের *Annals of Rajast'han*, অন্যটি কণ্টারের *Romance of History—India, Vol I & II.*

টডের রাজস্থান বেরিয়েছিল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড বার হয় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। *Annals of Rajast'han* সাফল্য পেয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে টড

এই জাতীয় আরও একখানা বই লিখলেন *Travels in Western India embracing a visit to the sacred mounts of the Jains, and the most celebrated shrines of Hindu Faith between Rajpootana and the Indus ; with an account of the Ancient city of Nehrwalled* নামে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে। এখানে লক্ষণীয় sacred mounts এবং celebrated shrines of Hindu Faith কথাগুলি। বুঝতে পারি কেন টড ভারতবাসীর এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন।[১] টডের 'রাজস্থানে'র পরবর্তীকালে অনেক অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু 'রাজস্থান'কে যথার্থ ইতিহাস বললে ভুল করা হবে। রাজপুত জাতির কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, কবির কাব্য (চান্দ বরদাইর 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ') এ-সকল ছিল মূলত টডের অবলম্বন। প্রতিটি রাজপুত জাতির বিবরণীতে টড তাঁদের পৌরাণিক কর্মবৃত্তান্তকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রাজপুত জাতির অনেক কিংবদন্তীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এ যেন বিগত শতাব্দীর অশোকের ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি। বৌদ্ধজাতকে অশোক সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেগুলিকেই ঐতিহাসিকবৃন্দ যথার্থ ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক ইতিহাস-রচনা পদ্ধতিতে শিলা-লেখগুলি ছাড়া জাতকের কোনো মূল্যই স্বীকৃত হয় নি। টডের রচনাকেও ইতিহাস বলতে পারি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্য টডের কাছে নানাদিক থেকে ঋণী। টডের গ্রন্থই বাংলা কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারের সামনে ঐতিহাসিক উপাদানের ভাণ্ডার উন্মোচিত করল। রেনেসাঁসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর বীরত্ব-উন্মাদনার প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা দিল টডের রাজস্থান তাকে অনুপ্রাণিত করল। দেশপ্রেম, সতীত্ব-গৌরব, বীরত্ব, এবং রোমান্স 'রাজস্থানে' প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক নাট্যকার কবি যথেচ্ছ টডের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনায় টডের বইখানির গুরুত্ব এই কারণে অপরিসীম। টডের গ্রন্থে Personal Narrative অংশ অত্যন্ত সুখপাঠ্য। লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির জন্যও বইখানি সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

---

১. টডের জীবনীকার এই বইটির ভূমিকায় বলেছেন—'The enthusiasm of the author, who is the historian of some remarkable events in recent Rajpoot history of which he was an eye-witness and in some of them an agent, has moreover, infused into the narrative a portion of his own feelings, and incorporated with it many of the adventures of his own life.' এই feelings এবং adventuresই ঔপন্যাসিকদের কাছে এক অজ্ঞাত জগতের দ্বার খুলে দিলে।

J. H. Caunterএর *Romance of History—India*—Vol. I & II-তে ইতিহাস লেখার চেষ্টা ছিল না। ভূমিকাতে তিনি বলেছেন—

'Romantic as are many of the events which the Mohamedan annals supply, they are nevertheless all of one tone and colouring. They want the delightful blendings and tintings of social circumstances.'

টড নিজেই আবার বলেছেন, '...it never was his intention to treat the subject in the severe style of history.

Their princes were despots, their nobles warriors, their governments tyrannies and their people slaves. The lives of their most eminent men, who were distinguished chiefly for their deeds in arms, present little else than a series of battles, their principal amusement was the chase, in which similar perils to those presented in war were courted for the stern glory which followed achievements'

এই রোমান্স ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের পরম আদরণীয় বস্তু হয়ে রইল। বলা বাহুল্য, রোমান্স রচয়িতার কাছেও এই বইটি অপরিসীম মূল্য পেয়েছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার পূর্বে ইতিহাসাশ্রিত ইংরেজি কবিতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনাকালে এগুলির গুরুত্ব অবহেলা করতে পারি না। ইতিহাসকে কাব্যরসে জারিত করে এঁরা যা রচনা করলেন তার মূল্য কম নয়। এই রচনাগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথার্থ ভূমিকা রচনা করলে। হরচন্দ্র দত্তের *The Flight of Humayun*, শশিচন্দ্রের *Jelaludeen Khilji*, *The Requiem of Timour*, *Sivajee*, *The Warrior's Return*, মধুসূদনের *The Captive Lady*, রমেশচন্দ্রের *Asoka's Message to his People* ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ইতিহাসকে সাহিত্যগুণোপেত করেছিল। শশিচন্দ্রের *The Times of Yore*-এর কথা যথাস্থানে বলেছি।

সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাস গঠনে যথার্থ ইতিহাসচর্চা এবং নানা ঐতিহাসিক গল্প কাহিনী, টডের রাজস্থান, কন্টারের রোমান্স, ইতিহাসাশ্রিত ইংরেজি কবিতার প্রেরণা ছিল। দেশীয় উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ঋণের কথাও বলতে হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। স্কটের বই যে সেযুগে আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে স্কটের প্রভাব আছে বলে মনে করি।

৫

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা কথা বলা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ধারা সৃষ্টি

করেছিলেন তা পরবর্তী কালে সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। এর কারণ অনেক। প্রথমত, সামাজিক উপন্যাসের দ্রুত বিস্তার, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আবির্ভাব, ঐতিহাসিক তথ্যের দৈন্য, ইতিহাসচর্চার প্রতি বাঙালীর অনীহা। ঐতিহাসিক উপন্যাসেব সম্ভাবনাব সার্থক পবিণতি বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। উপন্যাস বচনার একটা বাঁধাধরা আদর্শ (Pattern) নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সকলেই সেই ছাঁচে ঢেলে উপন্যাস রচনা কবতে আরম্ভ কবলেন। সুতরাং এই-সব ছাঁচে-ঢালা উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাব। সামাজিক উপন্যাসে যেমন একটা সুস্পষ্ট বিকাশ দেখি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেলায় তা লক্ষ্য করা যায় না। আদিযুগের বিষয়বস্তুর জের পরবর্তী কালেও চলেছিল। নূতন কোনো আদর্শও স্থাপিত হয নি। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাস উদ্ভবের সময়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল নানা কাবণে পববর্তী কালে অতি শীঘ্রই তাতে ভাঁটা পড়েছিল।

আমবা কেবলমাত্র বিষযবস্তুব দিক থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কতকগুলি বিভাগ কবতে পারি।

প্রথম, বাজপুতবীব এবং মোগল বাদশাব কাহিনী
দ্বিতীয়, বঙ্গেব বীব সন্তানদের প্রশস্তিমূলক আখ্যান
তৃতীয়, সিপাহীবিদ্রোহমূলক ঘটনাবলী
চতুর্থ, স্থানীয ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী
পঞ্চম, হিন্দুযুগের গৌরবময় ঘটনা।

একে একে এগুলির পরিচয দিচ্ছি।

মোগলবাদশাব ইতিহাস ঊনবিংশ শতকের গোডাব দিক থেকেই রচিত হয়েছিল। ইংবেজ ঐতিহাসিকদের পরিশ্রমে মুসলমান ঐতিহাসিকদেব গ্রন্থেব অনুবাদ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকেব মৌলিক গ্রন্থ আমরা পেয়েছিলাম। হিন্দু বাজার ইতিহাস প্রধানত কিংবদন্তী এবং কাব্য-নাটকের উপর স্থাপিত ছিল। কেবলমাত্র কিংবদন্তী এবং কাব্য-নাটকেব উপব নির্ভব করে উপন্যাস রচনা কবা সম্ভব নয়। টডেব 'বাজস্থান' মোগলবাদশার কীর্তিকাহিনী এবং রাজপুত আখ্যানকে বাংলাদেশে পবিচিত করেছিল। টডের 'বাজস্থান' মূলতঃ রাজপুত-মোগল বিরোধের ইতিহাস। তৃতীয়ত, মোগলবাদশা ছিল বিদেশাগত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত স্বদেশ-চেতনা পরাধীনতার গ্লানি বোধ কবেছিল। বিদেশীব শাসনযন্ত্রকে সকলে সুনজবে দেখেন নি। সুতরাং ইংরেজের প্রতীক হিসেবে মোগলবাদশা চিহ্নিত হয়েছিল। অবশ্য এইটি আংশিক সত্য। ইংরেজের শাসনে দেশ যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে তখন ইংরেজদের রাজশক্তি

থেকে মুক্ত হবার চেতনা দেশে আসে নি। শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। সুতরাং আমাদের মনে হয়, দেশের অধঃপতনের জন্যে ঔপন্যাসিকরা দায়ী করতে বাধ্য হয়েছিল মোগল আমলকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই হিন্দু। হিন্দুত্বের অভিমান যে একেবারে ছিল না এ কথা জোর করে বলা যায় না। আসলে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা মিশ্র অনুভূতি ক্রিয়া করেছিল। এক দিকে বিদেশী শাসনের জ্বালাযন্ত্রণা, অন্য দিকে বিদেশাগত মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সংশয়-দৃষ্টি তাঁদের ছিল। ফলে প্রায় বেশীর ভাগ উপন্যাসেই মোগলের বিরুদ্ধশক্তির প্রতি সপ্রশংস অভিনন্দন লক্ষ্য করি। তখন জাতীয় উদ্দীপনা সর্বত্র সাড়া জাগিয়েছে। এই অবস্থায় জাতীয় বীরদের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলেছি, বাঙালীর ইতিহাস তখনও লেখা হয নি। টড 'রাজস্থান' গ্রন্থে রাজপুত-জাতিব রোমান্সকে বিস্তৃত কবেছেন। সুতরাং উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ রাজপুত বীরবৃন্দকে কেন্দ্র কবে স্ফূর্তি পেলে। রাণাপ্রতাপ, বাজসিংহ, জয়সিংহ, মানসিংহ, (কোনো কোনো উপন্যাসে) পৃথ্বীবাজ ইত্যাদি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। এব মধ্যে যাঁরা আরও একটু এগিয়ে গেলেন তাঁবা বাঙালী বীবদের কাহিনীও বলতে আরম্ভ করলেন। এ সকল কাহিনীতে সর্বত্র ঐতিহাসিকতা নেই। কিন্তু বাঙালীর মর্মবেদনাব সম্যক্ প্রকাশ ঘটেছে এই-সব রচনায়। মোগল দববাব ঔপন্যাসিকদেব আকৃষ্ট করবার আরও একটা কাবণ হল এই যে সে-কাহিনী নিযে বোমান্স বস অতি সহজেই পবিবেশন করাব সুযোগ ছিল। J. H Caunterএব *Romance of History—India* দুই খণ্ড তার স্বাক্ষর বহন করছে। মুসলমান শাসনের কোনো উজ্জ্বল চিত্র আমাদেব ঔপন্যাসিকদের সামনে ছিল না। আলিবর্দীর সময়ে বার বাব মারাঠা আক্রমণে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচাবী নবাবীশাসন থেকে দেশবাসী অবশ্যই মুক্তি চেয়েছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচারিতার স্মৃতি লেখকদের স্মরণে ছিল। নবাবী আমল উনিশ শতক থেকে খুব দূরের ছিল না। লেখকবৃন্দ যখন মোগলশাসনকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু কবেছেন তখন তার রূপায়ণেও নবাবী আমলের প্রক্ষেপ পড়ল।

'মুসলমানরা যখন রাজত্ব হারাল তখন তার দশা প্রায় চরমে পৌঁছে। মুসলমানদের সেই পতন দশার ছবি নিপুণ হস্তে এঁকেছেন সৈয়দ গোলাম তাঁর সুবিখ্যাত 'সিয়ারল মোতা আখেরীন' গ্রন্থে। কি ব্যাপক দায়িত্বহীনতা যে মুসলমানদের সর্বস্তরের জীবনে দেখা দিয়েছিল তার বিচিত্র ছবি ফুটেছে তাঁর লেখায়।…মুসলমানদের অবস্থা যে ব্যাপকভাবে হীন হয়ে পড়েছিল, সমাজে যে সব কদাচার

প্রবেশ করেছিল তার সম্বন্ধে কোনো চেতনা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না, এমন-কি রাজ্য যে তাদের আর নেই সে সম্বন্ধেও তাদের চেতনা যে বহু দেরিতে আসে, তা মিথ্যা নয়।' ১

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ যখন উপন্যাস রচনা করছিলেন তখন মোগল-পাঠান শাসনের বিস্তৃত তথ্যও উদ্ঘাটিত হয় নি। ঐতিহাসিকবৃন্দও কিছু পরিমাণে একদেশদর্শী ছিলেন। সুতরাং মোগল শাসনের উজ্জ্বল চিত্র না পাওয়ার জন্যে কেবলমাত্র ঔপন্যাসিকবৃন্দকে দায়ী করলে চলবে না। ঐতিহাসিকবৃন্দের মতনিরপেক্ষতার অভাবও এর একটা মস্ত কারণ।

'এলফিনষ্টোন, ষ্টুয়ার্ট, বার্ণয়ার, ট্রাভারনিয়ার প্রভৃতি কৃত একদেশদর্শী ইতিহাস-পুস্তকই বিদ্যালয়ে চলিত। অধ্যাপকগণ ও শিক্ষকগণ তাহাই পড়াইতেন ও পড়িতেন, আর তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এ সমস্ত পুস্তকের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যুগ তখনও আরম্ভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ স্কুল কলেজেই পড়িয়াছিলেন, সুতরাং মুসলিমযুগের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সাধারণের মতোই হইয়াছিল। ভারত ইতিহাসের যে সব ঘটনাকে আজ আমরা বিতর্কমূলক বলিয়া মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো প্রচলিত বিশ্বাস মতে সে সম্বন্ধে একটা সুস্থির ধারণা করিয়াছিলেন।' ২

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলির এবার আলোচনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পর যখন মৃণালিনী লিখলেন, তখন নিশ্চয়ই ইতিবৃত্তের অভাব বোধ করেছিলেন। যতদূর বুঝি, মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল। তিনি সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী বিশ্বাস করেছিলেন কি না সে প্রসঙ্গ অবান্তর। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে **মৃণালিনীর কাহিনীগঠন শিথিল, ইতিহাসকাহিনী আরও শিথিল, অসম্বদ্ধ, খাপছাড়া। ইতিহাস মুখ্য বস্তু হলেও তথ্যের অভাবে তা ধূসরবর্ণ।** বঙ্কিমচন্দ্র যে মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন তারই খেদ প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শনে। বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনা শিক্ষিত বাঙালীকে স্পর্শ করেছিল। ১৮৮২ থেকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ এই বিশ বছরে সে বেদনার সাহিত্যরূপ দেখা দিল। আর্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) অনেকগুলি জীবনবৃত্তান্ত লিখেছিলেন।

'যোগেন্দ্রনাথ যখন জীবনবৃত্ত-রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সবে সাড়া জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই স্বভাবতই তিনি পাশ্চাত্য দেশের সেই মহাপুরুষদের জীবনী বাছিয়া লইয়াছেন যাঁহারা স্বদেশে অধীনতা মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন।' ৩

১. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ'।
এই সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের *Fall of the Moghul Empire*এর ৫৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২. রেজাউল করিম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ'।
৩. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

কিন্তু এর মধ্যে লেখকবৃন্দ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। অনুসন্ধিৎসু স্বদেশীভাবাপন্ন লেখকবৃন্দ বঙ্গের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হলেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী (১৮৬৫-১৯৩৫) দেশপ্রেমিক মহাত্মাদের চরিত্র অবলম্বন করলেন। তাঁর ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত (১৮৯৫), বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত (১৮৯৬), মহারাজ নন্দকুমার চরিত (১৮৯৯), ইত্যাদি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বারভূঞার কাহিনী এখন যতই অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হোক না কেন সেকালে বাঙালির স্বদেশী উদ্দীপনাতে এই-সকল কাহিনী ইন্ধন যুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। বঙ্গমাতার আসন ঘিরে এই সমস্ত বীরবৃন্দ সাময়িক আসন লাভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সত্ত্বেও পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে Myth রচনা করতে শিক্ষিত বাঙালি নিরুৎসাহ হয় নি। ফলে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসেও অতি সহজে এঁরা আসন পেয়ে গেলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। লেখকবৃন্দ বঙ্গের বীরসন্তানদের মধ্যে যা-কিছু মহত্ত্ব ছিল সবটুকু নিংড়ে উপন্যাসের পাত্রে স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত বীর-সন্তানদের প্রতি—সীতারাম, উদয়নারায়ণ, শোভাসিংহ, প্রতাপাদিত্য, সমশের গাজী—ঔপন্যাসিকদের শ্রদ্ধা, বিস্ময়, সপ্রশংস উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করি। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দুর্দমনীয় উৎকণ্ঠা ও আবেগ এঁদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি, এগুলিকে জীবনীপর্যায়ের গ্রন্থ হিসাবে দেখা উচিত। লেখকেরা যদিও বলেছেন তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এগুলিতে জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্যের বাইরে আর বিশেষ কিছু নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম অবশ্য এই পর্যায়ের গ্রন্থ নয়। আরও একটি কথা, নিজবাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা রাজপুতবীরদের বন্দনার মধ্য দিয়ে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পেল। কিন্তু সেও যেন একান্ত আপনার মনে হল না। সেজন্যে বাঙালি বীরদের স্বদেশ-উদ্দীপনার ইতিহাস সন্ধান করতে হল। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি মিলে গেল। বাংলায় প্রথম যুগের ইতিকথার প্রধান উৎস তো এই। নিছক ইতিহাসচর্চার কঠোর পরিশ্রমই কেবল নয় তার পশ্চাতে ছিল একটা দুর্দমনীয় আবেগ, একটা স্বতোৎসারিত প্রেরণা। আন্দ্রে মোরয়াঁ বলেছেন,

'A minor aspect of the fictional treatment of real people in the novel is the crediting of what are accepted as national characteristics to lesser known historical figures. Making traits of national character personal to a fictional individual

and thereby stamping him to typical of the race is a literary convention as old as the Elizabethan dramatists.'১

সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসগুলি আমাদেব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাব কাবণ শিক্ষিত বাঙালিব চেতনায় সিপাহীবিদ্রোহেব প্রভাব কতখানি এবং তা কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল এই উপন্যাসগুলিও তার একটা হদিস দিতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কথা আমবা সকলেই জানি যে সিপাহীবিদ্রোহ বাঙালিব চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে নি। সিপাহীবিদ্রোহ যদি সফল হত তবে নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন ব্যবস্থা খানিকটা ফিবে আসত। প্রাচীন ব্যবস্থার জীর্ণতাব জোববা এবং লালসাব লোলতাব স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন বাঙালি কখনই তা গ্রহণযোগ্য মনে কবতে পাবে নি। সুতবাং সিপাহীবিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে বিবেচিত হতে পাবে নি। এই কাবণে সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসগুলিতে সিপাহী চরিত্র উজ্জ্বল বঙে চিত্রিত নয়। প্রায়ই সিপাহীদেব নৃশংস অত্যাচাবেব মর্মন্তুদ কাহিনী উপন্যাসগুলিতে বিবৃত হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহ নিযে লেখা প্রথম উপন্যাস থেকে আমাদেব আলোচ্য সমযেব শেষ বই 'নানা সাহেব' পর্যন্ত সমস্ত বইতে লেখকরা নিজস্ব জবানিতে কবুল কবেছেন সিপাহীবিদ্রোহ উন্নতিব প্রতিবন্ধক, সিপাহীদেব চেতনায ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল বড়ো। সুতবাং এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিব প্রেবণা অন্যত্র কোথাও প্রচ্ছন্ন আছে। বজনীকান্ত গুপ্ত তিন খণ্ডে সিপাহীবিদ্রোহেব ইতিহাস বচনা কবেছিলেন। জাতি যে বহুকাল পর্যন্ত সিপাহীবিদ্রোহেব কথা মনে রেখেছিল তাব কাবণ এই বিদ্রোহ ইংবেজের স্বৈরাচাবী মনোবৃত্তিকে এবং বণিকবুদ্ধিকে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বাধ্য হযেই কোম্পানির শাসনব্যবস্থা বদ কবেছিল। ঔপন্যাসিকবা সিপাহীবিদ্রোহেব দূবগত কাবণগুলিকেই বিস্তৃত কবেছেন। ইংবেজ কোম্পানি পবাধীন জাতিব উপব শোষণেব ভাব নামিযে দিচ্ছিল। সিপাহীবিদ্রোহ এই শোষণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। ঔপন্যাসিকরা এই শোষণেব কথাও বলতে ভোলেন নি। দেশীয সিপাহীদেব তাঁবা সমর্থন কবেন নি, কিন্তু তাই বলে ইংবেজ স্তাবকতাও তার মধ্যে ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহ যে একটা নবযুগের সূচনা করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সেইটি হচ্ছে কোম্পানির বাজত্বেব অবসান ও

---

১. ***Cassel's Encyclopoedia***, **Historical Figures in Fiction. M. W. MacCulum. *Shakespeare's Roman Plays and their Background*** বইটিও দ্রষ্টব্য।

মহারানীর প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন। অন্তত ঔপন্যাসিকরা এই মনে করেছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিই ঔপন্যাসিকের বিষয়নির্বাচনে সাহায্য করেছিল।[১]

আর-এক শ্রেণীব ঐতিহাসিক উপন্যাস দেখা যায়, যেগুলির মধ্যে স্থানীয় কিংবদন্তী ইতিবৃত্ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবেছে। 'শালফুল', 'ইলছোবা', 'রণচণ্ডী' এই জাতীয় উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাসগুলিও এই পর্যায়ের। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণেব মেয়ে' উপন্যাসটিব প্রধান আকর্ষণ স্থানীয় ইতিবৃত্তের মনোরম বর্ণনায়। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় উপন্যাসে ভৌগোলিক বিবরণ একান্ত প্রত্যাশিত এবং স্থানীয় ভূগোলবিবরণ পাঠকের মনে একটা প্রত্যয়ের সুর এনে দেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায, স্থানীয় নামেব পশ্চাতে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়েব আবিষ্কাবে প্রবাদ-প্রবচন-ছড়াতে জনচিত্তস্পন্দনেব চকিতচমক দীপ্তিতে এই উপন্যাসগুলি নতুন আস্বাদ এনে দিতে সমর্থ হযেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সাধারণতঃ বাজকীয় সমাবোহ, যুদ্ধেব কোদণ্ডটঙ্কাব শুনি। কিন্তু এই জাতীয উপন্যাসে কোনো ঐশ্বর্যসমাবোহ লক্ষিত হয় না। একটা স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী যা বাংলাব বৈশিষ্ট্য ছিল—তাবই কথা বর্তমানযুগেব অতি বাস্তবজগতেব বাঙালি প'ড়ে আনন্দ পায়। আবও একটি কথা—স্বদেশপ্রেম ঐতিহাসিক উপন্যাসেব অন্যতম উপাদান। এই-সব উপন্যাসে স্পষ্টত কোথাও স্বদেশপ্রেমেব কথা নেই। বীবত্ব, উন্মাদনাব বেশও সর্বত্র দেখতে পাই না। তথাপি মনে হয, লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনেব মধ্যেই স্বদেশচর্চাব অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল। দেশপ্রীতিই লেখকদেব উদ্বুদ্ধ কবেছিল নিজ দেশের কথাকে বলতে। **Butterfield** বলেছেন—

'Even where it contains no sounding of the trumpets of nationalism, and where its author holds no patriotic motive, the historical novel cannot help reminding men of their heritage in the soil. It is often born of a kind of patriotism, it can scarcely avoid always being the inspiration of it.'[২]

শ্রীশচন্দ্র মজুমদাবেব 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন' সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কিন্তু অন্য দিক থেকে বিচাব কবলে এগুলিব ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেকালেব পাঠশালা, বসন্তোৎসব এবং গ্রামীণ জীবনই ইতিবৃত্তের ভিত্তিভূমি। সুতরাং ইতিহাসের গোড়ার কথা পাচ্ছি এই উপন্যাসগুলিতে। বাংলাব গ্রামেব হৃদ্স্পন্দনটি প্রকাশ কবেছেন শ্রীশচন্দ্র

১. বিংশ শতকের সিপাহী যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত বাংলা উপন্যাস স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়।
২. H. Butterfield—*The Historical Novel.*

মজুমদার। তাঁর 'বিশ্বনাথ' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেকালের বীরত্ব ও শৌর্যের মধ্যে যে রোমান্স রস সঞ্চিত ছিল তাকেই শ্রীশচন্দ্র নিষ্কাশিত করেছেন এই উপন্যাসে।[১]

আমরা সকলেই জানি যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের সাধনা দেশে ইতিহাসচর্চার আগ্রহ এনে দেয়। 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত দেশচর্চার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই তিনি দেশের পুরাবৃত্ত চর্চার প্রতি দেশবাসীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন। এর সুফলও ফলতে আরম্ভ করল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামদাস সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল। এঁরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে তথ্য আবিষ্কার করলেন তাতে ইতিহাসের চেহারা বদলে গেল। এই অনাবিষ্কৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটনে এক বিস্তৃততর পটভূমি ঔপন্যাসিকদের কাছে এসে গেল। এই-সব দিগন্তকে ফুলে ফলে রঙে রসে ঔপন্যাসিকবৃন্দ রাঙিয়ে তুললেন। এই পর্যায়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎকুমার রায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের উপর উপন্যাসের ইমারত প্রস্তুত হল। এরই পাশাপাশি পূর্ববর্তী ধারার জেরও সমানে চলল। এবং এই জাতীয় উপন্যাসেও পূর্ববর্তী ধারার 'টেকনিক' অবলম্বিত হল। পূর্ববর্তী ধারার প্রভাব থাকলেও এগুলিকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে রাখার কারণ এই যে এগুলি রচনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রসপরিবেশন নয়—সমগ্র যুগচিত্তের প্রাণস্পন্দনটি এর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে এও লেখকদের ধারণায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন—

'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান'

এ নিছক অন্তরের আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়—জ্ঞানের পথে তার সম্যক্ উপলব্ধি হবে এইটিও তিনি চেয়েছিলেন। সুতরাং এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের ধূসরতা অনেকাংশে কেটে গেছে, অস্পষ্ট কুহেলিকা-আচ্ছন্ন জীবনকে জ্ঞানের আলোকে এঁরা দেখেছিলেন। এবং এই কারণেই সেই যুগের শিলালেখ,

---

১. 'আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে ইতিহাস রচনা করতে হলে এক-একটি গ্রাম কিংবা এক-একটি স্মরণীয় ঘটনা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকথা রচনা করতে হবে। এই আলোকে গ্রামগুলির বিস্মৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকরা এ বিষয়ে আগে থেকেই পথ দেখিয়েছেন। লেখকেরা নিজগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করে আধুনিককালেরই একটি আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিত করেছিলেন।'

সাহিত্য, কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র ঘেঁটে, মন্থন করে এঁরা যে অমৃত উপহার দিলেন তার মধ্যে ইতিহাসের অনুস্মৃতি অনেকাংশেই বাস্তব হয়েছে। কিন্তু খাদ মেশানোর প্রয়োজন তখনও ছিল, পরেও থাকবে। স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, এই খাদের উপর নির্ভর করে। 'পাথুরে প্রমাণে'র উপর রসসর্জনার আবেগকম্পিত শিহরণটি চাই। সুতরাং ঔপন্যাসিকবৃন্দ যেখানে তথ্যের অভাব বোধ করেছেন সেখানে কল্পনার খাদ মিশিয়েছেন। সে কল্পনা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অনুসরণে পরিবেশিত। আরও একটি কথা, রাখালদাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুখ্যত ঐতিহাসিক। কিন্তু রসদৃষ্টি ছিল বলেই এঁরা ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসকে মিলিয়ে ফেলেন নি। দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং রচনাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এঁরা অবহিত ছিলেন। এই কারণে এঁদের উপন্যাসগুলিতে এক দিকে ইতিহাস অনুগতির নৈপুণ্য সুস্পষ্ট, অন্য দিকে রসদৃষ্টিরও অনপেক্ষিত প্রকাশ পরমরমণীয়তা লাভ করেছে।

৬

ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্সের প্রাচুর্য। এই রোমান্স রস পরিবেশন করা হয়েছে নানাভাবে। প্রথম **মোগলহারেমের রহস্য উদঘাটনে**, দ্বিতীয় **সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক কার্যাবলীর বিবরণে**, তৃতীয় **কোনো একটি নারীর প্রহেলিকাময় কার্যে**, চতুর্থ **স্বদেশ উদ্দীপনাতে**, পঞ্চম **নায়কের বীরোচিত কর্মের উৎসাহ উদ্দীপনায়**, ষষ্ঠ **নায়ক-নায়িকার রূপবিশ্লেষণে**, সপ্তম **অতীতের স্বপ্নময় বর্ণনায়**। এগুলি একে একে বিস্তৃতভাবে বলছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে নূতন রস পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা-তিলোত্তমাকে ঠিক হারেমের মধ্যে পাই না।[১] মতিবিবি এবং নূরজাহানের দ্বন্দ্বে (কপালকুণ্ডলা) নারীর ঈর্ষা-ফেনিল মানসিকতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। যদিচ হারেমের অস্পষ্ট পরিবেশ সেখানে উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণে মোগল হারেমের রহস্য কিছু পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মাধবীকঙ্কণে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল'। এই স্বপ্নালু এবং ঐন্দ্রজালিক বর্ণনায় রমেশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এক অলৌকিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদটিতে। বলা

১. কতলু খাঁর অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য বর্ণনায় বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

বাহুল্য, এ বর্ণনা স্বকপোলকল্পিত। মোগল বাদশাদের কাহিনীই যখন পূর্ণরূপে ইতিহাসে বর্ণিত হয় নি তখন এই জাতীয় বর্ণনায় কল্পনার আশ্রয় স্বাভাবিক। মোগল অন্তঃপুরের খোজা হাবশী, দাসদাসী, প্রহরীর সতর্কতা, বিচিত্র কারুকার্য-মণ্ডিত আবাসগৃহ, অন্তঃপুবেব গোলকধাঁধা এ সমস্তই রমেশচন্দ্র অতি সাবধানে পাঠকের সামনে তুলে ধবেছিলেন। ইতিহাসেব দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয়, রমেশচন্দ্রের অনেক আগেই তাঁব পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্ত *The Times of Yor*"-এ (১৮৪৫ ?) বঙ্গমহাল বহস্য উদ্ঘাটন কবেছিলেন আকবব বাদশাহেব নওবোজার উৎসবকে কেন্দ্র কবে। কিন্তু বমেশচন্দ্রেব কৃতিত্ব এই যে তিনি অন্তঃপুরের চিত্র পরিবেশনে সাহিত্যেব ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন কবেন নি। হীবামুক্তামাণিক্যেব ছটাব অন্তবালে কত নির্মম নিষ্ঠুবতা ও ঈর্ষা কুটিলতা চাপা পড়ে আছে ঔপন্যাসিক তাবই বর্ণনা কবেছেন।

মোগল বিলাস-ঐশ্বর্যেব বহিবঙ্গ রূপ লেখকদের গোচবে ছিল। অন্তত পক্ষে মোগল স্থাপত্য এবং চিত্রকলাব সংবাদ ঔপন্যাসিকেবা জানতেন। এবই প্রক্ষেপ কবেছেন তাঁবা অন্তঃপুব বর্ণনায। বাহিরেব রূপবহস্যেব বিস্ময অন্তঃপুবেব বহস্যকে আরও ঘনীভূত কবেছে। এ কথা বলবাব কাবণ এই যে এই লেখকবৃন্দই যখন হিন্দু বাজাব অন্তঃপুবেব বর্ণনায় মুখব হযেছেন তখন প্রাযশই শুদ্ধাচারিতা, পবিত্রতাব বাড়াবাড়ি কবেছেন। আসল কথা, বাস্তব কোনো তথ্য হাতে না থাকাতে লেখকবৃন্দ যথেচ্ছ কল্পনাব আশ্রয় নিতে বাধ্য হযেছিলেন। আব যা আমাদেব জ্ঞানেব বহির্ভূত, যাব কথা আমবা কিছুই জানি না তাব সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল এবং আগ্রহ স্বাভাবিক। লেখকবৃন্দও সেই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এজন্যে বমেশচন্দ্র যে পথ খুলে দিলেন সে পথে অনেক কবিযশপ্রার্থী প্রবেশ কবে নিজেব নিজেব লক্ষ্যে পৌঁছবাব চেষ্টা করেছিলেন।[১] কিন্তু তাঁদেব ক্ষমতা ছিল না। ফলে বমেশচন্দ্রের সংযম, ঔচিত্যবোধকে এঁবা ধূলিসাৎ করে দিলেন। এব চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই হবিসাধন মুখোপাধ্যায়েব উপন্যাসগুলিতে। তাঁব 'বঙ্গমহাল বহস্য' এক কালে 'Best Seller' ছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে পাঠকদেব এই জাতীয় কৌতূহল। হরিসাধনবাবু পর্দাব পব পর্দা উঠিয়েছেন, পাঠকেব রুদ্ধনিঃশ্বাস চরমে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের কথা স্মবণ কবি। যে দিব্যরূপিণীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাব বর্ণনা দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়।

১. 'রাজসিংহে'র—(১৮৯৩, পুনঃপ্রণীত সংস্করণ) মোগল অন্তঃপুর বর্ণনা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে।

এই কবিত্বের আবরণ উন্মোচন করলে দেখা যাবে যে বাদশাহজাদীর অচরিতার্থ কামনা পাষাণফলকে রক্তের স্বাক্ষরে দীপ্যমান। কবি যা করেছেন, ঔপন্যাসিকেরা তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে, তরল করে পরিবেশন করেছেন। বর্ণনায় বিশেষত্ব নেই, সবই প্রায় একরঙা। এবং তরলিত হয়ে সে বর্ণনা প্রায়ই ফিকে এবং একঘেয়েমির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে কদাচিৎ ঔপন্যাসিকেরা খোজা প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নারীহৃদয়ের মূকবাণীকে মুখর করে তুলতে পেরেছেন। তাও অতিকথনের চাপে হৃদয়রহস্য অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। আরও একটি কথা, ইংরেজি অনুবাদের হিড়িকও এই সময়ে খুব দেখা যায়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে রেনল্ডসের অনুবাদ বার হতে থাকে। হরিচরণ রায়ের অনুবাদ লণ্ডন-রহস্য (১৮৭১) এবং ফকিরচাঁদ বসুর উজীরপুত্র (১৮৭২-৭৬) সে সময়ে বেশ নাম কিনেছিল। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হরিদাসের গুপ্তকথা বা আমার গুপ্তকথা (১৮৭২-৭৩) সে-যুগের জনপ্রিয় গ্রন্থ।[১] বলা বাহুল্য, রেনল্ডসের এই-সব বইয়ের প্রভাব তদানীন্তন পাঠক সমাজে সর্বাধিক ছিল। গল্পখোর পাঠকদের দাবি মেটানোর পক্ষে রেনল্ডসের জুড়ি ছিল না। রেনল্ডস অন্তঃপুরের রহস্য উদ্ঘাটন, নানা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা, প্রেমোপাখ্যানে ভাবালুতার স্পর্শ দিয়ে উপন্যাসকে জমকালো করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি ঔপন্যাসিকবৃন্দও সে পথ অনুসরণ করলেন। **ঐতিহাসিক কাহিনী গঠনে স্কটের চেয়ে রেনল্ডসই যে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল সে** সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সাধুসন্ন্যাসীর ভূমিকা ঐতিহাসিক উপন্যাসের অপর বিশেষত্ব। এই সাধুসন্ন্যাসীদের কোথাও সক্রিয়ভাবে উপন্যাসের ঘটনার স্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে, আবার কোথাও নিষ্ক্রিয়ভাবে উপদেষ্টার ভূমিকা অবলম্বন করতে দেখি। বলা বাহুল্য, **এই বিষয়টিও ঔপন্যাসিকেরা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে**। বঙ্কিমের পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপাখ্যানে রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ পাই। রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, চণ্ডীচরণ সেন, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায়

'In the eighties and the nineties of the last century, the books of fiction that were most read happened to be the mystery, specially that of Reynolds.' P. R. Sen, *Western Influence in Bengali Literature.*

১. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ। পৃ. ১৭৩-১৭৪

সকলেই এই সাধুসন্ন্যাসীর কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে 'স্বামী'-দের যুদ্ধে যোগদান করতে দেখি। আদর্শ এবং লক্ষ্যে এক হয়ে এই সাধুসন্ন্যাসীরা দেশোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন[১]। দেশোদ্ধার ব্রত অনেকগুলি উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। আব উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার সকলেবই এই ধাবণা ছিল যে এই দেশোদ্ধার ব্রতে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকারীদের হাতে থাকত গীতা এবং তাঁরা আনন্দমঠ থেকে তাঁদেব দেশচর্যাব শিক্ষা গ্রহণ করতেন। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মেব (স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ) প্রভাব এই সমস্ত উপন্যাসে এসে গেছে। আবাব নিছক একটি আধ্যাত্মিক শক্তিব প্রভাব দেখাবাব জন্যে সাধুসন্ন্যাসীব নানা অলৌকিক কার্যাবলী এই সমস্ত উপন্যাসে বেশ খানিকটা অংশ জুড়েছে। প্রধানত এই সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীব বাসভূমি স্থাপন কবা হয়েছে দূবপ্রান্তে—প্রায়শই নদীব ধাবে কিংবা কোনো গুপ্ত গুহাব সন্নিকটে। এই সমস্ত অঞ্চলের বহস্যময় বর্ণনা এবং প্রাচীন ভাবতের পূত আদর্শের (প্রধানত যা বনভূমি এবং নির্জনতাকে অবলম্বন কবে গড়ে উঠেছিল—এই ধারণাব জন্যে) উজ্জ্বল মহিমময ছবি লেখকবৃন্দ দিয়েছেন। বোমান্সেব সুব এসেছে এই অলৌকিকতাকে কেন্দ্র কবে। যখন দেখি নাযকেব কার্য উপন্যাসের মহাপুরুষদেব ভবিষ্যৎবাণীর উপর নির্ভবশীল, এমন-কি এই সমস্ত নায়কেব ভাগ্য মহাপুরুষ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে চলেছে, তখন বিস্ময়েব উদ্রেক হয় বৈকি। নায়কের বিপদবরণ এবং অলৌকিক উপায়ে তা থেকে উদ্ধার একমাত্র মহাপুরুষেব সাহায্যেই ঘটেছে। এই ব্যাপাব দেখে পাঠক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায আপ্লুত হয়ে পডত। মহাপুরুষদেব অসামান্য অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে পাঠকদেব পূর্বসংস্কার নিশ্চিন্ত হত। মহাপুরুষবা ছিলেন সর্বত্রগামী, রাজা, মহাবাজা এবং দেশের পথ-প্রদর্শক। এঁদেব অতীত জীবন রহস্যাবৃত, সেই কারণে এঁদেব সম্বন্ধে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা বেশি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকাব কবতে হয় যে এই জাতীয় চবিত্রেব অবতাবণায় উপন্যাসে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। কোথাও ঘটনাব স্বাভাবিক পবিণতিতে বাধাস্বরূপ হয়ে, কোথাও তত্ত্বের জটিল এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে উপন্যাসকে তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। স্বর্ণকুমাবী দেবীর 'বিদ্রোহ' একটি ভালো উপন্যাস। কিন্তু হরিতাচার্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা, হিন্দুধর্মের মর্ম উদ্‌ঘাটন উপন্যাসেব পক্ষে একান্তই অসঙ্গত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র

১. চন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা

তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাসে এই ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। লেখকবৃন্দের আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এঁদের কারুরই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তি ছিল না। সুতরাং গুরুব পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে এঁবা প্রাযই বিপথগামী হযেছেন। আমরা বড়ো বডো বীবেব উৎসাহ এবং উদ্দীপনা, উত্তাপ এবং উত্তেজনায মুগ্ধ হই, কিন্তু যখন বুঝি যে এ-সকলেরই মূলে রয়েছে মহাপুরুষের শিষ্যত্বেব মহিমা তখন সবকিছুই যেন শূন্য বোধ হয়। মঙ্গলকাব্যেব নাযকেব পশ্চাতে যেমন দেবতা এঁদেবও পশ্চাতে তেমনি গুরুব অলৌকিক মহিমা। এই প্রেক্ষাপট উপন্যাসেব বর্ণনাকে উজ্জ্বল কবে নি ববং কায়াকে ছাযা রূপে প্রতিভাসিত কবেছে। লোকালয় থেকে দূবে ফলমূলাহাবী এই সাধুসন্ন্যাসীদেব যে বর্ণনা আমবা পাই তাতে প্রাচীন ভাবতের মুনি-ঋষিদেব কথা স্মবণ কবিযে দেয়। জ্যোতিষগণনাব আশ্চর্য ফল লক্ষ্য কবি শোভাসিংহেব মতো বীব, সমশেব গাজীব মতো যোদ্ধা, অমব সিংহের মতো বিদ্রোহী নায়কের উপব।

চমকপ্রদ ঘটনা কিংবা অঘটনঘটনপটিযসী নাবীব প্রহেলিকাময় কার্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিব মধ্যে প্রাযই লক্ষ্য কবা যায়। **প্রহেলিকাময়ী এই সমস্ত নারীচরিত্রের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।** মনে হয় **এই জাতীয় চরিত্রের উৎসস্থল রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণের জেলেখা। বঙ্কিচন্দ্রের বিমলাতে এর পূর্বাভাস।** জেলেখাব বাঙালি বীবেব প্রতি সহানুভূতি, প্রেম অবাস্তব ও বাস্তবতাব মাঝামাঝি। জেলেখাব পূর্ব পবিচয অজ্ঞাত। পাঠক তাব জন্যে বিশেষ কৌতূহলীও নয। কেবল নাবীশক্তিব অসামান্য কার্যেব দ্রষ্টা ও সাক্ষী হযেই তাব তৃপ্তি। এই সমস্ত নাবীবা কখনও পুরুষ বেশে, কখনও ছদ্মবেশে দেখা দেয়। দিনে ও বাত্রে এদের সমান গতি-বিধি। কখনও মিত্রশিবিবে কখনও শত্রুশিবিবে—সর্বত্র এদেব চলাচর্ল। নায়কেব প্রতি ভালোবাসা অথবা সহানুভূতি এদেব এই কার্যাবলীব মূল উৎস। আবার অনেক সমযে দেখা যায কোনো অচরিতার্থ প্রেমেব প্রতিহিংসা মেটাবাব জন্যে, কিংবা কোনো মহাপুরুষ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এবা উপন্যাসে বেশ বড়ো জায়গা জুড়ে বসেন। অনেক লেখকেব বর্ণনাব মধ্যে এমনও একটা আভাস থাকে যে এই সমস্ত নারী যেন নাযকেব নিয়ন্ত্রীশক্তি—ভাগ্যবিধাতা। **ভারতীয় বিশ্বাস অনুযায়ী নারীর দুই শক্তি—কল্যাণময়ী এবং ভয়ংকরী।** যেহেতু ঔপন্যাসিকবৃন্দ প্রায়ই উপন্যাসে ধর্মবোধ প্রকাশ করেছেন সেই হেতু এটা অবিশ্বাস্য নয যে নাযক নাযিকা অঙ্কনেও এঁবা কতকটা সেই আধ্যাত্মিক

বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। ফলে নারীর কল্যাণময়ী এবং 'ঘোরা' রূপ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। যে সমস্ত নারীদের কথা বলা হচ্ছে এরা সকলেই ভয়ংকরী মূর্তির আকার ধারণ করেছে। নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পরধারিণীর প্রতিভাস এদের চরিত্রে। কিন্তু তন্ত্রোক্ত মূর্তির যথার্থ স্থান তন্ত্রে— আখ্যায়িকায় তাদের প্রবেশ নিশ্চয়ই অন্যরূপে হওয়া প্রয়োজন। দেখা যাবে এই-সব চরিত্র অল্পবিস্তর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আচরণ করে, কিঞ্চিৎ নিউরোটিক, এরা ভানুমতী'র সগোত্র। এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিচয় নেই। স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এরা লেখকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রমাত্ররূপে পর্যবসিত। আগে বলেছি ভারতীয় দৃষ্টি অনুয়ায়ী এই-সব নারীচরিত্র পরিকল্পিত। এই-সব চরিত্রের অপর এবং মুখ্য কারণ রোমান্সরসের পরিবেশন। রোমান্স সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। যেমন আকস্মিকতার দ্যোতনা, চমকসৃষ্টি, অলৌকিক কিংবা অতিলৌকিক ঘটনার অবতারণা। স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না এমন ঘটনার মধ্যে বাস্তবতা নেই। পাঠকের বিস্ময়ও সেখানে। এই ধারণায় লেখকবৃন্দ এই সমস্ত নারীচরিত্র কল্পনা করেছেন। শক্তিতে সাহসে কৌশলে এরা অদ্বিতীয়। এদের অন্তরের কামনা অস্বাভাবিক, জিঘাংসা অতিলৌকিক। ফলে মানবচরিত্রের ধরাবাঁধা নিয়মে এদের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই-সব ভূমিকায় রোমান্সের দীপ্তিই মুখ্য বস্তু। উত্তেজনা বিস্তার, কোলাহলসৃষ্টি (যা লোকালয়ের নয়—দূরের) এইগুলিই লেখকদের অবলম্বন ছিল।

উপন্যাসে প্রেম অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলা **ঐতিহাসিক উপন্যাসেও প্রেমের উপাখ্যানের প্রাচুর্য**। রাজ-রাজড়ার প্রেমোপাখ্যানে রাজকীয় সমাবেশের মধ্যে যে কটি লক্ষণ দেখি তার মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই। অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার প্রেম হয়তো ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল। স্কটের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের আদর্শ তো ছিলই। রাজা বাদশা কোনো সাধারণ নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন কিংবা নারী যে বীরভোগ্যা এইটি প্রমাণ করার জন্যে রাজা বাদশা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'শাশ্বত ত্রয়ী'র (Eternal triangle) দ্বন্দ্বও অনেকগুলি উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। এই ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব স্বভাবতই বহিরঙ্গ। বাধাবিপত্তি বাইরে থেকেই এসেছে। প্রণয়ীর ক্রোধ, জিঘাংসা, ক্রূরতা উপন্যাসগুলিতে বিস্তৃত হয়েছে। ইতিহাসের তথ্য যাই হোক অনেক রাজ্যপতনের জন্যে লেখকেরা দায়ী করেছেন প্রেমের অস্বাভাবিক পরিণতিকে। যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শোভাসিংহ

সুপরিচিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁরও পতনেব কারণ বর্ধমানের রাজকুমারী। যথাস্থানে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি।

এখন, লেখকদেব **এই বিশেষ ধারণার কারণ কি? বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাস এই-সকল ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল।** সীতারাম বীর, যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। কিন্তু এই-সকল গুণই পদ্মপত্রে জলের মতো ক্ষণস্থায়ী হয়েছে সীতাবামেব প্রবল ভাবাবেগের কাছে। অপ্রাপণীয়া শ্রীকে করায়ত্ত করবার জন্যে সীতারাম রাজকার্য ভুলেছিলেন, যতবার শ্রী তাঁব আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ততবাব সীতারামেব তৃষ্ণা উদগ্র হয়েছে। একচক্ষু হবিণের মতো সীতারামেব লক্ষ্য কেবল স্ত্রীব উপব ন্যস্ত ছিল। সেজন্যে রাজ্যস্থাপনের মহতী আশা ধূলিসাৎ হযে গিয়েছে। মনে হয় সীতাবামের এই পতন বাঙালিকে খুব একটা নাড়া দিযেছিল। দেশোদ্ধাব ব্রতে, স্বদেশচর্চায় নাবীপ্রেমের স্থান গৌণ—এইটিই তখনকাব শিক্ষা। **যা গৌণ তাকে মুখ্যরূপে বিবেচনা করার জন্যেই সীতারামের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করেছিলেন।** সুতরাং এঁদেব উপন্যাসগুলিতে বাজ্যেব পতনের কারণ দেখি নারীপ্রেম। নিষ্কাম-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে যে-কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষাব ধ্বংস অনিবার্য। প্রেমের একটা ধ্রুব আদর্শ আমাদের লেখকদেব সামনে ছিল। তাব বিচ্যুতি যেখানে ঘটবে সেখানেই আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তেব উইল প্রভৃতি উপন্যাসেও একই ব্যাপার লক্ষ্য কবি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে কবতেন প্রেমেব দুর্নিবাব আকর্ষণে প্রণযীব চিত্ত 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু'। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে প্রেম-উপাখ্যানেবও এইটি ধুযা। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব কালাপাহাড়ের সর্বনাশা নীতিব মূলে নারীর প্রেম। স্বর্ণকুমাবী দেবীব 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে রাজার পাহাড়ীদেব আশ্রিত নারীর জন্যে লালসা বাজ্যপতনের কাবণ। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণা, অসীম, ধ্রুবা, ময়ূখ—এই সমস্ত উপন্যাসগুলিব মধ্যে প্রেমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রেম যে অন্ধ, সে যে মানুষকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখালদাসের বর্ণনায় তারই পরিচয়। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কাঞ্চনমালা'য় নারীর প্রেমের বিকৃত রূপ চিত্রিত করেছেন। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যাঁরা সে যুগে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদেব উপন্যাসের লক্ষণগুলি থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি প্রেমসর্বস্ব। এবং এই প্রেমের আবর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র বিঘূর্ণিত। ত্রিকোণ প্রেমের

আসক্তি যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে একটি নারী সহজ, সরল। অপর-জন জটিল, ক্রূর এবং স্বার্থপর। দুটি নারীর প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বমুখর চিত্র এবং ঈর্ষাক্ষুব্ধ মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিকবৃন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা-তিলোত্তমার প্রতিরূপও পাই অনেকগুলি উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে নয়, অনেক সময়েই ঐতিহাসিকতাকে অগ্রাহ্য করে এইসব প্রেমকাহিনী বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। এমন-কি রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণেও একই পন্থা অনুসৃত হতে দেখি। আসলে ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে সূত্ররূপে ধরে ঔপন্যাসিকেরা এই সমস্ত প্রেমকাহিনীকেই আশ্রয় করেছিলেন বেশি। এমন-কি সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা চিত্তবিনোদিনী, ঝান্সীর রানী, বিজয়, অমরসিংহ ইত্যাদি উপন্যাসে প্রেমকাহিনী বাদ যায় নি। প্রেমোপাখ্যানের অনুপ্রবেশে আপত্তি করবার কিছুই থাকত না যদি এই-সব কাহিনী ইতিহাসের জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করতে পারত, কিংবা ইতিহাসের ফাঁক পূরণে সাহায্য করত। দেখা যাবে ঔপন্যাসিকবৃন্দ সেদিক দিয়ে চিন্তাও করেন নি। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে রাখালদাসের উপন্যাসগুলি স্মরণ করতে পারি। তিনি ইতিহাসের ফাঁক পূরণে সাহায্য করতে পারে এমন প্রেমোপাখ্যানেরই সাহায্য নিয়েছেন। অন্ততঃ মূল তথ্যের বিরোধিতা না করে এমন প্রেমকাহিনীই সন্নিবেশ করেছেন। সকল ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা না চললেও কারও কারও গল্পরচনার কৌশল সম্বন্ধে Disrailiর এই মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।—

'Take a pair of pistols, a pack of cards, a cookery book and a set of new quadrilles, mix them up with half an intrigue and a whole marriage, and divide them into three equal parts.' ১

আসল কথা রোমান্স সৃষ্টি করাই এঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তুলনামূলক আলোচনার জন্যে নবীনচন্দ্র সেনের কথা তুলতে পারি। তিনি মহাকাব্য রচনা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর 'ত্রয়ী' কাব্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সে যুগে প্রশংসা পেয়েছিল। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নবীনচন্দ্রের কাব্য আসলে (Metrical Romance)। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র অনেকগুলি প্রেমোপাখ্যান সন্নিবেশ করেছেন। এই সমস্ত প্রেমোপাখ্যানের বর্ণনার তরী বেয়ে কবি তীরে পৌঁছেছেন। পাশ্চাত্য এক জাতীয় কাহিনী-কাব্যেও এই জাতীয় বস্তু উপেক্ষিত হয় নি। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের উদ্দেশ্যের (purpose) আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না করেও বলা চলতে পারে যে

The Young Duke

এঁরাও অনেক সময়ে মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে অবাস্তব প্রেমকাহিনী বর্ণনায় শক্তি নিয়োগ কবেছিলেন।[১] এমন-কি কঠোর শোনালেও এ কথা সত্য যে অনেক সময়ে এঁরা দিক্‌ভ্রষ্ট। নবীনচন্দ্রেব মতোই ঔপন্যাসিকবৃন্দ উপকাহিনী বর্ণনায় উল্লাস বোধ কবেছেন, আনন্দ পেয়েছেন এবং পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সাহিত্যের নানা বিভাগে এই ব্যাপার চলছিল। নাটকে, বর্ণনাত্মক ঐতিহাসিক কাব্যগুলিতেও এই রোমান্সসৃষ্টির প্রচেষ্টা। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুবের 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪) ; 'সরোজিনী বা চিতোব আক্রমণ' নাটক (১৮৭৫) 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮৭৯) 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২) ইত্যাদিতে ঐলবিলা-অম্বালিকা এবং পুরু-তক্ষশীল, সবোজিনী-বোযেনাবা এবং বিজয় সিংহ-বণবীব সিংহ, অশ্রুমতী-মলিনা এবং সেলিম-ফবিদ খাঁ-পৃথ্বীবাজ, শুভসিংহ-সত্যবতীব প্রেম-কাহিনী বেশ বড়ো অংশ জুড়েছে। সহজেই অনুমেয় জ্যোতিবিন্দ্রনাথ নাটকে বোমান্সের রস পবিবেশনে উদ্যোগী হযেছিলেন। তবে জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব নাটকে এই-সকল কাহিনীব সমাবেশ সত্ত্বেও কোথাও সাহিত্যেব ঔচিত্যেব সীমা লঙ্ঘন কবে নি। কিন্তু জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব মতো শক্তিশালী সকলে ছিলেন না। অক্ষম নাট্যকাবদেব হাতে পডে এই প্রেমকাহিনী বোমান্সের জলাভূমি সৃষ্টি কবেছে! ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই রোমান্সেব জলাভূমি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা না বললে অন্যায় হবে যে এই রোমান্স সর্বত্র উপন্যাসকে নষ্ট কবে নি। রমেশচন্দ্র, শচীশচন্দ্র, রাখালদাস ইত্যাদি লেখকেব হাতে বোমান্টিক উপন্যাস এক নতুন রূপ লাভ কবেছে। এঁদের উপন্যাসে ভাবালু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পবিচিত স্নিগ্ধ প্রেমের ছবি দুর্লভ নয়।

এখানে একটা প্রযোজনীয় প্রসঙ্গ বলে নিই। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ঘটনাসংস্থান অনেক ক্ষেত্রে বাংলাব বাইবে ঘটেছে। কিন্তু চবিত্রচিত্রণে অবাঙালি চবিত্র অনেক সময়েই বাংলাদেশের বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্রেব আয়েষার মধ্যেও অবাঙালিসুলভ আচরণ প্রত্যাশিত নয। ফলে প্রেমকাহিনীতেও এই বাঙালি জীবনের ছবি প্রত্যক্ষগোচর। বোমান্সেব অতি গাঢ প্রলেপ সত্ত্বেও এদের বাঙালিত্ব মুছে যায় নি। বাঙালি পাঠক এই সব প্রেমোপাখ্যানে ঘরের কথাকেই বড়ো কবে অনুভব কবেছে।

রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে স্বদেশচর্চাব পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। নারীগণের উৎসাহবাক্য যোদ্ধাদের উত্তেজিত করেছিল, প্রবল হতাশার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিল 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে

১. C. M. Bowra, *From Vergil to Milton.*

বাঁচিতে চায়' গানে। নবীনচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' নূতন করে বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন মীরমদন ও মোহনলালের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাকেই বিস্তৃত করেছেন। একে আরও এগিয়ে দিয়েছেন ভারতী-সাধনা পত্রিকার লেখকবৃন্দ। দেশমাতৃকার সেবায় তখন পর্যন্ত রাজনীতির কুটিল শর নিক্ষিপ্ত হয় নি। দেশ বলতে প্রধানত একটা Ideaকেই বিশেষ করে বোঝাত। এবং দেশসেবা ছিল জীবনের অন্যতম আচরণীয় আদর্শ। এই আদর্শের জন্যে মৃত্যুবরণ গৌরবের বিষয় ছিল। রাজপুত ইতিহাসে তার পরিচয় পেয়েছি। রাজপুত ইতিহাস যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের বেশি আকর্ষণ করেছিল তার মুখ্য কারণ এখানে। মহৎ ও উচ্চ আদর্শের জন্য বীরচরিত্র হয়ে উঠত অসাধারণ। তাঁদের আত্মোৎসর্গ আমাদের চিত্তকে মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। বীরত্ব, শৌর্য সাহসিকতার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা তা এই-সব চরিত্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হত। রোমান্সের পতাকাস্থানও এইখানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দমঠের 'স্বামী'-দের কথা স্মরণ করতে পারি। শ্রী চরিত্র হিসেবে এমন কিছু উঁচুদরের নয়, কিন্তু দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রুকে মারবার জন্যে শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি নিশ্চয়ই বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। এ জাতীয় চরিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলিতে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই। বলা বাহুল্য, এই সব চরিত্র ধীর এবং উদাত্ত বটে, কিন্তু ধীরতা এবং উদাত্ত মনোভাব কোথা থেকে এরা সংগ্রহ করেছিলেন তার কোনো পরিচয় উপন্যাসে নেই।[১] কিন্তু সে আলোচনা পরে। রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে বড়ো বড়ো বীরের বীরত্ব উন্মাদনায়, যুদ্ধের কোদণ্ডটঙ্কারে, অস্ত্রের শিহরণে। স্কট সম্বন্ধে T. F. Henderson বলেছেন,

> 'With him, romance was not primarily the romance of love, but the general romance of human life, of the world and its activities, and, more especially, of the warring, adventurous, and more or less strange and curiosity-provoking past.' ২

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেও এ মন্তব্য খাটে। Romance of love-এর প্রাচুর্য আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বেশি হলেও warring and adventurous দৃশ্য অথবা ঘটনাও যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে। যুদ্ধের

---

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠ্য, শ্রীসুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড; শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য।

২. *The Cambridge History of English Literature*, Vol. XII

উত্তাপ ও উত্তেজনা বাঙালির স্মৃতিকে নাড়া দিয়েছিল। এককালে অস্ত্রবিদ্যা ছেড়ে শাস্ত্রবিদ্যার প্রতি আত্যন্তিক মোহ বাঙালিকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ হীনতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিকে ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এর প্রমাণ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্য 'ভাবত উদ্ধারে' আছে।

বঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যান, কাঞ্চীকাবেবী ইত্যাদি গ্রন্থে যুদ্ধেব যে বর্ণনা দিযেছিলেন তাতে বাঙালি যুদ্ধোন্মাদনার যথার্থ স্বাদ পায় নি। এমন-কি কাঞ্চীকাবেরী কাব্যে (পুরুষোত্তম দেব কৃত—সপ্তদশ শতাব্দী) যুদ্ধের যে উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে তার স্পর্শও বঙ্গলালে নেই। শস্ত্রবিদ্যাব কথা বাঙালি ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং নতুন কবে যখন বীরত্বেব প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগল তখন তার বর্ণনা তো অতিশয়িত হবেই। উচ্ছ্বসিত হৃদযেব আবেগ প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধের দৃশ্যে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে অষ্টাদশ শতকেব বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত যেখানে যেখানে যুদ্ধেব বর্ণনা পেয়েছি সেখানে যুদ্ধের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে নি। ধর্মমঙ্গল কাব্য এদেব ব্যতিক্রম। ঘনবাম বলেছিলেন 'বাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ'। দেশচর্চার কথা এখানে বলছি না। রূপবাম, ঘনরাম, মানিকবাম ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদেব কাব্যে মালঝাঁপ, একাবলী ছন্দে যুদ্ধোন্মাদনা প্রকৃত উত্তাপ সৃষ্টি কবতে সমর্থ হযেছে। কিন্তু সে যুদ্ধ পল্লীর প্রতিবেশ অতিক্রম করে নাগরিক সাহিত্যে প্রবেশাধিকাব পায় নি। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, ঢাল মৃগেল মৃদঙ্গ বাজে' ছড়ায় একটা দোলা আছে। সে সুব মিঠে মেজাজের, ঘুমপাডানিযা গানের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধবর্ণনাও প্রায়শ এই জাতীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালিব স্মৃতি থেকে যুদ্ধেব উন্মাদনা প্রায় মুছে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সে স্মৃতি লুপ্ত।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা যখন যুদ্ধেব দৃশ্য বর্ণনা কবলেন তখন তাঁদেব সামনে ছিল টডেব বাজস্থান এবং স্কট উপন্যাস। স্কট যুদ্ধেব যে বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন তা কেবল অস্ত্রের বৈচিত্র্য বর্ণনাতেই নিঃশেষিত হয় নি (যদিও সে বর্ণনায়ও স্কটের নৈপুণ্য অসামান্য) কিংবা বীবত্বেব যথাযথ চিত্রণেও সে বর্ণনা শেষ হয় নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্কট বিজেতা ও বিজিতেব মানসিক উত্থানপতনকে যুদ্ধের দামামাধ্বনিব সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। এক পক্ষের জয়ের উল্লাস, কোলাহল, তীব্রতার পাশাপাশি বিরাজ কবে অপর পক্ষের হতাশা, নৈরাশ্য এবং কারুণ্য। পরাজয়ের অপমান যে দুরপনেয় কলঙ্ক বিজিত পক্ষকে তা বিদ্ধ করত। অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা কেবল সৈন্যসমাবেশ নয় কিংবা শিবিরের মিছিলই নয়, তার সঙ্গে মানব-মনের উৎকণ্ঠা ব্যগ্রতাও মিশে যেত। মানব-মনের

এই খাঁটি সুরটি স্কটের উপন্যাসে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। নাইটদেব যুদ্ধে, কিংবা নর্মান ও আংলোস্যাক্সন দ্বন্দ্বে রোয়েনা-বেবেকাব মানসিক বিচলন এ ক্ষেত্রে স্মবণ করতে পারি। আমাদের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা স্কটের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বিশেষত বমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, রাখালদাস এ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। বমেশচন্দ্রেব যুদ্ধবর্ণনায় মানব-মনের উত্তাপ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। বাখালদাস করুণা এবং ধর্মপাল উপন্যাসে এই খাঁটি সুবটি ধ্বনিত কবে তুলেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের ঐতিহাসিক পরিচয় কতগুলি শিলালেখ থেকে আহৃত।* কিন্তু পাষাণের কথাকে রাখালদাস প্রাণবন্ত করেছেন। হূনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধযাত্রাকে প্রকৃত জাতীয় যুদ্ধ (National war) হিসাবে গণ্য কবা যেতে পাবে। পবাজয়েব মুখেও স্কন্দগুপ্তেব দেশের জন্য আত্মবিসর্জন একটা গৌববেব সুবে নিঃশেষিত হযেছে। স্কন্দগুপ্তেব মহত্ব এবং মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে তাঁব মৃত্যুব মধ্য দিয়ে। বিদেশীব আক্রমণেব সম্মুখে স্কন্দগুপ্তের অকুতোভয়তা, নির্ভীকতা বাঙালিব রুলটানা জীবনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল নিশ্চযই। স্কটেব উপন্যাসেব মতো এই-সব উপন্যাসেও বাঙালি উদ্দীপ্ত হযেছে, অন্তবেব সমবতৃষ্ণা মিটিযেছে। বমেশচন্দ্রেব বর্ণনায রাজপুত জীবন-সন্ধ্যাব করুণ আলেখ্য বেদনাবিধুব, আবার মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে নবোদিত সূর্যের ন্যাযই দীপ্ত এবং উজ্জ্বল। শিবাজীব সংগ্রামে বাঙালি অতীতের ঐতিহ্যকে নূতন কবে অনুভব কবেছে। যথার্থ বোমান্সের দীপ্তি এবং গৌরব এই-সকল যুদ্ধ-বর্ণনায় পাই। যুদ্ধ বর্ণনায় রূপার্ট ব্রূক এবং উইলফ্রেড আওয়েনের চিন্তা পাশাপাশি এসে ভিড় কবেছে এই-সব উপন্যাসে। বায়রণের উচ্ছ্বাস এবং প্রাণোচ্ছলতাবও অভাব নেই কোথাও। বুঝতে পাবি ইন্দ্রনাথ সমসাময়িক বাঙালি জীবনের কাপুরুষতা দেখে যে খেদ প্রকাশ করেছিলেন সেই অভাবের পূবণ কবা হয়েছে এই-সকল ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

এ কথা বলি না যুদ্ধেব ক্ষয়ক্ষতি, লাভ অলাভ, জয় পবাজয় বর্ণনে লেখকবৃন্দ সর্বত্র সফল হযেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-বমেশচন্দ্রের অনুকবণে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল। বেশিব ভাগ উপন্যাসেই যে যুদ্ধ-দৃশ্য পাই তা পুথির পাতাব বর্ণনা। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব অনেক উপন্যাসেই ঘটেছে। যে স্মৃতি লুপ্ত, যার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই তাকে 'সত্য'-বস্তু রূপে প্রকাশ করতে গেলে ক্ষমতার প্রয়োজন। কেবল ক্ষমতাই নয়, কল্পনাব প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সকল ঔপন্যাসিকের কাছে এ দাবি কবা যায় না। বস্তুতঃ রামগতি ন্যায়রত্নের ইলছোবা উপন্যাসে যত্নর যুদ্ধ স্কটের হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হবিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁব উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধবর্ণনায় কোনো চমৎকাবিত্ব আনতে পাবেন নি। যদুনাথ ভট্টাচার্য তো কেবলমাত্র গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে এ-সকল বর্ণনা অতিকথন দোষে দুষ্ট, অনুকরণেব ব্যর্থতায পর্যবসিত। লেখকবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্রেব নাম পর্যন্ত জানতেন না। সুতরাং যুদ্ধের বাস্তবতার স্পর্শ সেখানেও পাই নি।

আগে বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র রূপতৃষ্ণাব পবিণাম তাঁব অনেকগুলি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। নাবীব রূপবর্ণনা বাংলাব কাব্য নাটক উপন্যাসেব অন্যতম বিষয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসও এব ব্যতিক্রম নয়। আয়েষা, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, শৈবলিনী, ভ্রমর, শ্রী, দলনীর চবিত্র প্রকাশেব পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এদেব রূপবর্ণনা কবতে ভোলেন নি। বিশিষ্ট নাযিকাব রূপবর্ণনাতে বঙ্কিমচন্দ্র চবিত্রেব অনুযাযী রূপবর্ণনা কবেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন পরিবেশে বিশিষ্ট। উপন্যাসে বঙ্কিম যে বীতি শুরু কবলেন তাবই জেব চলল বহুকাল ধবে। অবশ্য এ বিষযে বঙ্কিমকেই পুবোধারূপে ধবলে অন্যায হবে। যথার্থ বিচাবে বলতে হয সংস্কৃত কবিগণ নাযিকাব রূপবর্ণনায আত্যন্তিক উল্লাসবোধ কবতেন। কালিদাস ভবভূতিব মতো কবি ছত্রেব পব ছত্রে উপমাব পব উপমা সাজিযে নাযিকার দেহের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যরূপ আস্বাদন কবেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের এই বীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও সুলভ। রূপবর্ণনায কতকগুলি বাঁধাধবা কৌশল গৃহীত হল। উপমানেব সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাড়িয়ে কাব্যের পরিধিকে বিস্তৃত কববাব কোনোও প্রকাব উৎসাহ কবিবৃন্দ অনুভব কবেন নি। আমাদেব ঔপন্যাসিকদেব ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই সংস্কৃত সাহিত্যে পাবঙ্গম। অনেকে সংস্কৃত আখ্যায়িকার বীতিও অনুকবণ কবেছেন। ইলছোবা, বিজয় ইত্যাদিব কথা স্বতঃই মনে আসে। রূপবর্ণনায় এই বীতি গতানুগতিক, একঘেয়েমিব পর্যায়ে পড়ে। নায়িকাব রূপবৈভব অঙ্কনে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। ঔপন্যাসিকবা হয় তিল তিল সৌন্দর্য আহবণ করে তিলোত্তমাব কথা বলেছেন, নচেৎ কুশ্রীতাব চরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ কবেছেন। অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার এই সমস্ত নায়িকাদের মধ্যে যে বাস্তবাতিবিক্ত আর একটি মহত্ত্ব বয়েছে তাকেই প্রকাশ কবেছেন লেখকবৃন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী মহাশ্বেতা পত্রলেখার সৌন্দর্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, উর্বশীব অপার্থিব সৌন্দর্য পাঠককে আবিষ্ট করে। পরিচিত জগৎ থেকে পাঠক অন্য জগতে চলে যায়। এইভাবে

রোমান্সসৃষ্টির প্রয়াস সহজ ছিল। এবং এই বাঁধা সরণি ধরে ঔপন্যাসিকবৃন্দ এগিয়ে গিয়েছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে উপকথা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি বলে ধরে নিতে পারি। একেবারে বাস্তবসর্বস্ব অথবা কল্পনাসর্বস্ব আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বাস্তবতার কিছু অংশ এবং উপকথার কিছু অংশের সমবায়ে ঐতিহাসিক রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে। **এই রোমান্সরস এসেছে ঘটনাবলী বর্তমানকাল থেকে দূরবর্তীকালে স্থাপন করার জন্যে।** অতীতের স্বপ্নময় বাজ্যে পাঠক অবাধে বিচবণ করাব সুযোগ পায়। বর্তমান জগতের বাধানিষেধ, দৈনন্দিন জীবনেব শতধাবিচ্ছিন্নতায় পাঠক অস্বস্তিবোধ করে। পাঠক অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়। অতীত সম্বন্ধে পুথিপত্রেব এবং ঐতিহাসিক তথ্যেব বাইবে তাব অতিবিক্ত কোনো জ্ঞান নেই। বাংলা ঔপন্যাসিকদেব ক্ষেত্রে এ কথা বলতে পাবি পাঠকের চাইতে তাঁদেব জ্ঞানও খুব বেশী ছিল না। কারণ ইতিহাসচর্চার তখন উষাকাল। সুতবাং ইতিহাসেব বাজ্যে যখন ঔপন্যাসিকবা আলোক ফেললেন তখন কল্পনা ভিন্ন অন্য কোনো আশ্রয় তাঁদেব ছিল না। কল্পনা স্ফীত হতে স্ফীততর হয়েছে। ঔপন্যাসিকবৃন্দ অতীতের জডস্তূপে প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছেন কল্পনার দ্বাবা। কল্পনাসমৃদ্ধ এই-সব রচনা সর্বত্র ভাবসাম্য বাখতে পাবে নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূসংস্থানই বোমান্টিক। মধ্যযুগীয় আচাব বিচার, প্রথা কানুন, রাজরাজড়ার শোভাযাত্রা, বর্ণসমাবোহ অনেকগুলি উপন্যাসেই একটা স্বপ্নঘন পরিবেশেব সৃষ্টি কবেছে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে ধীর বিচার এবং সাবধানতা প্রয়োজন। স্কট এই রোমান্স সৃষ্টি কবেছেন তথ্য এবং কল্পনার সাহায্যে। পাছে গল্পটি কেবলমাত্র উপকথায় পবিণত হয় এজন্যে সে যুগের খুঁটিনাটি বস্তুকে তিনি অবহেলা কবেন নি। কিংবদন্তী গ্রহণ কবেছেন কিন্তু সে কিংবদন্তী ইতিহাসের কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিবোধিতা না করে সে দিকেও তিনি কড়া নজর রেখেছিলেন। তপাপি স্কট পরিত্রাণ পান নি। ঐতিহাসিকেব তিরস্কার তাঁব কপালে জুটেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য ববীন্দ্রনাথ সঠিক জবাব দিয়েছেন।[১] আমাদের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকবৃন্দ যেখানে সার্থক সেখানে স্কটের সমপর্যায়ে এসে পৌছেছেন। শালফুল, ইলছোবা, রণচণ্ডী, বিদ্রোহ উপন্যাসগুলির আয়তন খুব বড়ো নয়—শেষেরটি ছাড়া। এই-সব উপন্যাসে স্থানীয় কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে লেখকরা একটা ঐতিহাসিক ভাবাবহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।

কেবলমাত্র কতগুলি স্থাননামের পশ্চাতে যে অতীতের কলরব স্তব্ধ হয়ে আছে তাকেই উদ্ঘাটিত করেছেন এঁরা। অতীতের প্রতি আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। রবীন্দ্রনাথের গানে একদিকে পাই 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' অন্যদিকে কবিতাতে পাই 'কথা কও কথা কও হে অনাদি অতীত'। অনাগত ভবিষ্যৎ এবং বিগত অতীত উদ্‌বেজিত করে। এই উৎকণ্ঠা, আবেগ-চঞ্চলতার স্ফূর্তি ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখি। এদিক থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকতর শিল্পী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেব 'ডঙ্কানিশান' অসমাপ্ত হলেও বাখালদাসেব বচনার চাইতেও কৃতিত্বের দাবি করতে পাবে। বাখালদাস যে সময়ে তাঁর উপন্যাসগুলি বচনা কবেন সে সময়ে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু তথ্য আমাদেব হাতে এসে পৌঁছেছে। সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি তো ছিলই। তাঁর শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা, উপন্যাসের দিক থেকে বিশেষ কৃতিত্বেব দাবি করতে না পারলেও প্রাচীন দুর্গ, সৈন্যসমাবেশ, অস্ত্রশস্ত্রেব বর্ণনা, দুর্গাধিপতিদের বংশমর্যাদা, সাধাবণ নবনাবীর বিচিত্র সংলাপ—সব কিছু মিলে মিশে এক অপরূপ বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হযেছে। অতীত কেবল আব অতীত থাকে নি, নবরূপ প্রাপ্ত হযেছে। রোমান্স সম্বন্ধে যে বলা হযেছে Distance lends enchantment to the view এ কথা রাখালদাসের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে খাটে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অতীতেব প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বয়েছে। তাজমহলেব বিচিত্র সৌন্দর্য, পালযুগের গৌববময় ইতিহাস, বোটাস দুর্গের ঐশ্বর্য, গুপ্ত আমলেব কথা আমবা ইতিহাসে পেযেছি। এই তথ্য বিবৃতিতে আমাদের মন প্রসন্ন হতে চায় না। এব মধ্যে অনেক কিছুই আজ লুপ্ত হযে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যেব সামগ্রী প্রবন্ধে অশোকেব অনুশাসনগুলিব মূকবাণী উদ্ধাবের জন্যে উল্লাসবোধ করেছিলেন। অশোকেব অনুশাসনেব পশ্চাতে একটি মানব-মনের বিচিত্র ধারণা, ধ্যান ছিল। সেই মানুষটির অন্তবপরিচয় লাভে পাঠক উল্লসিত হয়ে ওঠে। অতীতেব লুপ্তবস্তু আর উদ্ধার হবে না, তাদের আর ফিবে পাওয়া যাবে না। এই বেদনা রোমান্সবস উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে।[১] ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেব কাছে ছোটো ছোটো তথ্যগুলি পরম

১. 'But most of all, the reason why we love the ruins of an abbey, and preserve the flags that are riddles with the bullets of Waterloo—the reason why we prize the books in the margins of which Coleridge himself scribbled pencil-notes of literary criticism, and keep a lock of Keats hair, is that those things are like stray flowers that cheat the scythe, or like the last stars that outdare the morning sun, they are the few things that are saved from ship-wreck. The work of a historian is to reconstruct the past out of the debris that is cast up by the sea from the wrecks of countless ages. H. Butterfield, *The Historical Novel.*

আদরের বস্তু। এই তথ্যকে অতিক্রম করে তিনি আরও গভীবে চলে যান। যেখানে পরিবর্ত্যমান মানবজীবনের চঞ্চল প্রতিবিম্ব লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি মানবজীবনের সেই রহস্যের জন্যে উৎকণ্ঠা অনুভব করেন। তিনি বেদনা কল্পনা দিয়ে রঙে রসে মানুষ গড়ে তোলেন। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করেন নি, অতীত সম্বন্ধে তাঁদের যে বিস্ময়বোধ জেগেছিল তাকেই প্রকাশ করেছেন।

৭

ঐতিহাসিক উপন্যাস বচয়িতাবা ইতিহাসেব ইঙ্গিতও উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। ইতিহাসেব উৎপত্তি জ্ঞানেব ক্ষেত্র থেকে। জ্ঞান আহবণ আমাদের জীবনের অন্যতম আচরণীয় বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান নীতিশিক্ষা ইত্যাদির জন্যে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে ইতিহাস পাঠেবও ব্যবস্থা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় আজীবন শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন। সুতরাং তিনি যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে স্পষ্টত উপদেষ্টাব ভূমিকা অবলম্বন কবেছেন।[১] উপন্যাসেব উৎপত্তি ভাবের ক্ষেত্র থেকে। স্বভাবতই উপন্যাসে উপদেশ নীতিব স্থান গৌণ। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূমিকায় বলেছেন গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়াই তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই ইতিহাস শিক্ষার স্বরূপটি কি। প্রথমত দেশের বড়ো বড়ো বীবচরিত্রের কাহিনী বর্ণনা করে পাঠকচিত্তকে উদ্‌বোধিত কবা। কাল্পনিক কাহিনীতে সে কাজ হয় না। শিবাজী, রাজপুতবৃন্দেব কাহিনী এ কারণে ঔপন্যাসিকবৃন্দ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপাব বঙ্কিম-রমেশেব মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। **দ্বিতীয়ত এই-সব ঐতিহাসিক উপন্যাসই ইতিহাসপাঠে আগ্রহ এনে দিয়েছিল।** ঐতিহাসিক Ranke বলেছিলেন যে তিনি স্কটের *Quentin Durward* পড়েই সত্যকাহিনী উদ্ধাবে ব্রতী হন। কিন্তু আমাদেব দেশের কথা স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাস যখন লেখা হতে লাগল তখনও সার্থক ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে নি। ইতিহাস চর্চাব তখন মাত্র সূত্রপাত, এ কথা আগে বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব ইতিহাস নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

---

১. 'The knowledge of past events is the sovereign corrective of human nature.' A. J. Toynbee 'Polybius of Megapolis', *Greek Historical Thought*

সুতরাং সাধারণ পাঠকের যখন ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয়েছে তখন তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে ঐতিহাসিক কাহিনী বচনার মধ্য দিয়ে এঁবা ইতিহাস পঠনপাঠনে তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে দেন। বিদেশীব রচিত ইতিহাস অনেক সময়েই প্রকৃত ইতিহাস হয না। তাঁদেব দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়। ঔপন্যাসিকবৃন্দ সম্ভাব্য সত্যটিকে প্রকাশ কবে ঐতিহাসিকেব মনে প্রেরণা জন্মাতে সাহায্য কবেছেন। আবাব এমনও দেখা গেছে পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে প্রকৃত সত্য নিরূপণে ঐতিহাসিক উপন্যাস সহায়তা কবেছে। যেমন হয়েছে ববীন্দ্রনাথেব বউঠাকুবানীব হাটে। **তৃতীয়ত এক ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্পষ্টত ইতিহাসের গতিচক্রের, নিয়মশৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।** ঐতিহাসিক সূত্র একটা নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মেব অধীনে অতীতের ঘটনা সংস্থাপিত। সুতবাং পববর্তীকালেব ঘটনাও সেই নিযমে চলবে এই ইঙ্গিত কোনো কোনো ঔপন্যাসিক করেছেন। পূর্ববর্তী ঘটনাবলীব ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনেব মধ্য দিযে ভবিষ্যতের ধারাটিকে সুনিয়ন্ত্রিত কবাব বাসনা অনেক লেখকেব মনে ছিল। এজন্যে তথ্য সংকলনে এঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেব আদিপর্বে কেউ কেউ অতিবিক্ত তথ্যপ্রীতি দেখিয়েছেন। এর কারণ এঁবা উপন্যাসেব নামে ইতিহাস রচনা করেছেন। যেমন করেছেন চণ্ডীচরণ সেন। চতুর্থত, আমাদের দেশের প্রাথমিক ইতিহাস গবেষণায় যে বস্তু আহৃত হয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য এবং তাও রাজবাজড়ার কাহিনী-ঘটিত। ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসেও সেই সমস্ত বিষয়ই পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের যে ইতিহাস তা নিশীথরাত্রিব দুঃস্বপ্নেব মতো। ঔপন্যাসিকবৃন্দ সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেজন্যে তাঁরা কল্পনাবলে অতীতেব দেশকালপাত্রকে জীবন্ত করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁবা যে সর্বত্র সার্থক হয়েছিলেন এ কথা বলি না। কিন্তু এই প্রচেষ্টাই 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত'কে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চণ্ডীচরণ সেনেব উপন্যাসগুলি এবং সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসসমূহ এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সার্থক প্রতিভাবান ঐতিহাসিক আসবার আগেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রেই এই-সব উপন্যাসগুলিকে দুটি দাবি মেটাতে হয়েছে। এক দিকে ইতিহাসের অন্য দিকে উপন্যাসের। যেখানে এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে সেখানেই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির আসল সার্থকতা। পঞ্চমত, **দেশচর্চার দিকটিকে**

ঔপন্যাসিকরা ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ দিই—

আজ বঙ্গে কি ঘোর দুরবস্থা উপস্থিত। দশম বর্ষীয়া বালিকা এখন পাশ্চাত্য ধরণে গঠিত ও ইংরেজি লিখন পঠনে যত্নবতী। বোধ হয় এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বঙ্গরমণী এক্ষণে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া আপন নির্ধন স্বামীর প্রতি কদাচিৎ মাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যুত স্বামী সেই প্রকার বিদুষী পবিণীতার পাণিগ্রহণে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন।—পাচক, পাচিকা, দাস, দাসী, বেহারা ভিন্ন পত্নীর একদণ্ড সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার উপায় নাই। সনাতন আর্যধর্মে ভক্তি ও বিশ্বাসহীনা, সেই বিলাস বিভ্রান্তা বৌ বাবুর গর্ভেব সন্তান, যখন ভাবী বঙ্গের আশা ও আশ্রয় স্বরূপ সংসারবক্ষে বিচরণ করিবে, তখন হা জগদীশ, এই সোণার বঙ্গের কি দশা হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

অধুনাতন বালিকা, বাল্যাবস্থা হইতে বিদ্যালয়ে গিয়া পিতামাতার কি উপকার সাধন করে, কিংবা পরিণত বয়সে স্বামীর গৃহে গমন করিয়া কি বিষময় ফল প্রসব করে, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই ভালরূপে অবগত আছেন। নিরপেক্ষ ভাবী দর্শনক্ষম পাঠক নিশ্চয় জানিবেন যে, তদপেক্ষা আমাদের পূর্বকালের বালিকাগণ যে বাব, ব্রত উদ্‌যাপন ও শিব পূজার দ্বারা বাল্যকাল অতিবাহিত করিত, তাহাতে শৈশবাবস্থা হইতে চিত্তক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হইত ও বযোবৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের ধর্মোন্নতি দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে থাকিত। ১

সুতরাং শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, ন্যায়নীতি, সতীত্বেব মহৎ আদর্শ সনাতন ভাবতীয ঐতিহ্যকে যথাযথ এবং সুচারুরূপে দেখতে চেযেছিলেন ঔপন্যাসিকবৃন্দ। দেশপ্রেমেব এই উচ্চ আদর্শ আজও আমাদেব সাড়া জাগাতে পাবে। ঔপন্যাসিক-দের ধারণার মধ্যে কিছু ভুলচুক থাকতে পারে, সনাতন প্রথাকে আঁকড়ে থাকবার একটা অনমনীয় মনোভাবও দেখা যেতে পাবে তথাপি দেশচর্চাব এই আন্তরিক সদিচ্ছা আমাদেব মুগ্ধ কবে। **ষষ্ঠত,** উনবিংশ শতাব্দীব প্রায় প্রত্যেক লেখকই সাহিত্যকর্মে তাঁদেব কর্মচিন্তাব ইঙ্গিতও দিয়ে গিযেছেন। (সমাজজীবন তখন বেনেসাঁসেব আলোকে উদ্‌ভাসিত। শিক্ষিত বাঙালি দেশেব লুপ্তস্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা কববাব তাগিদ অনুভব কবেছিলেন। ইতিহাস সে কাজ কবতে পাবে। অভাবে উপন্যাসগুলিই সে কাজ কবেছে।) **সপ্তমত, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভাবনার কথাটিও চিন্তা করেছিলেন।** ইতিহাস এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য কবেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাখীবন্ধন উৎসবেব জোয়ার সাহিত্যকর্মেও এসেছিল। হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত করে তুলেছিলেন স্বর্ণকুমাবী দেবী এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদেব কয়েকটি উপন্যাসে। কেবল তাই নয়, যেখানে ঘটনাটি প্রাচীন ভারতের, সেখানেও দেশের দুর্দিনে সংঘবদ্ধ শক্তির

১. চাঁদরাণী

প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে প্রকাশ করে লেখকরা সমসাময়িক দাবির পূরণ করেছিলেন। রাজপুত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পরিণাম যে ভয়াবহ এবং শোচনীয় তার উদাহরণ সংগ্রহ করে দিয়ে এঁরা দেশকর্মে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন।

৮

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না। এর কারণ কি? সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস বার হচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তি অপেক্ষা যুগের চিত্রই প্রাধান্য লাভ করছে। ব্যক্তির চাইতে সমাজ যখন বড়ো হয়ে উঠেছে তখন সমাজ এবং যুগের চিত্র প্রাধান্য লাভ করবে তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু ১৮৫৭-১৯৩০ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। সে যুগের ইতিহাস চর্চার মূল সুরও ছিল এইটি। কার্লাইলের বীরপূজার আদর্শ তখন স্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিই ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাসের বল্‌গা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে। বীরত্বের প্রতি আমাদের উৎকণ্ঠা ও উদ্‌বেগ সে যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বইগুলির নামেই তার প্রকাশ—রাজসিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, রানী ভবানী, সীতারাম, উদয়সিংহ, ইত্যাদি। সুতরাং বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা যদি সমাজচিত্র সম্পূর্ণ-রূপে না পাই তবে লেখকসাধারণের উপর দোষ চাপানো যায় না। মোটামুটি ভাবে সে যুগের পরিবেশ রচনা করে ঐতিহাসিক নায়কের উপরেই তাঁরা তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এইটি উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ আদর্শের পরিণামী ফল।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত

শশিচন্দ্র দত্ত ঃ

শশিচন্দ্রের রচনা অধিকাংশই ইতিহাস এবং ইতিহাসাশ্রিত গল্প কবিতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাব মধ্যে *Shunkur : A Tale of the Indian Mutiny of 1857* এক দিক থেকে স্মরণীয়। কেননা এ রচনা সবকারী মহলেও আলোড়ন এনেছিল। শশিচন্দ্র দত্তেব *The Times of Yore, or, Tales from Indian History* মোট ২৪টি ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন। এ গল্পগুলি টডেব বাজস্থান এবং অন্যান্য ইতিহাস বই থেকে সংকলিত হয়েছে। বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছিল উপন্যাস মালা (১৮৭৭) নামে। উপন্যাস মালার ভূমিকা থেকে জানতে পারি প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে তিনি *The Times of Yore* গ্রন্থটি বচনা কবেছিলেন।

তিনি গ্রন্থের আভাসটি পেযেছিলেন ইংরেজ কবি টমাস চ্যাটার্টন-(১৭৫২-১৭৭০)-এর *The Storie of William Canynge* কবিতার এই ছত্র থেকে।

Straight was I carried back to times of Yore
Whilst Canynge swathed yet in fleshy bed.

বলা বাহুল্য, শশিচন্দ্র চ্যাটার্টনের সঙ্গে একটা মানসিক ঐক্য অনুভব করেছিলেন। তিনি *The Times of Yore*-এ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ থেকে মোগল আমল পর্যন্ত ইতিহাসের জের টেনেছেন। বইটির ক্রোড়পত্রে আছে—***From the invasion of Alexander The Great, to the battle of Paniput.***

ইতিহাসচর্চার ফলে ইতিহাসেব যে সমস্ত ঘটনা শশিচন্দ্রের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক মনে হয়েছে এবং যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কিছু পরিমাণে গল্পের আকারে বিবৃত হয়েছে সেগুলিকেই তিনি তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এগুলি নেহাৎই গল্পখোর পাঠকের মুখ চেয়ে লেখা। শশিচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে পনেরোটি কবিতা লিখেছিলেন *Indian Ballads* নামে। বাংলা গাথা-কবিতার ইতিহাসে এই ইংরেজি 'Ballad'গুলির মূল্য স্বীকার করতে হয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র[১] ভূমিকায় বলেছেন, 'গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।'

'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র কাহিনী দুইটি। 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। দুইটি কাহিনীরই জড কণ্টাবেব *Romance of History—India.* "ইংরাজিতে 'রোমান্স অব হিস্টবি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাবই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেবও কিযদংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।" কণ্টারেব বইটি নিছক বোমান্স। ভূদেবের কাহিনীতে কল্পনা আছে, নীতিকথাও অবহেলিত নয়।

'সফল স্বপ্ন' গল্পটিব উৎস কণ্টাবের *The Traveller's Dream.* এটি একটি তুচ্ছ রচনা। এব সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছুই নেই। ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বৈচিত্র্যও নেই।

সফল স্বপ্নেব ক্রটিবিচ্যুতি কিন্তু অঙ্গুবীয বিনিমযে লক্ষিত হয না। অঙ্গুবীয বিনিময় আকাবে ছোটো তথাপি উপন্যাসেব পূর্ণতা আছে। ভূদেব বলেছেন তিনি এই কাহিনীটিও বোমান্স অব হিস্টবি—ইণ্ডিযা থেকে নিযেছেন। কিছু কিছু বিষয়ে ভূদেব কণ্টাবের কাছে ঋণী। কণ্টাবেব গল্পটিব নাম *The Mahratta chief.* সফল স্বপ্নে যেমন ইতিবৃত্তেব ঋণ ভাবস্বরূপ, অঙ্গুবীয বিনিমযে তেমনি এ ঋণ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিতে রূপান্তবিত। অঙ্গুরীয় বিনিমযের বিশদ আলোচনাব পূবে এব কাহিনীব পবিচয় নেওযা যাক।

মাবাঠা বীব শিবজী পার্বত্যপ্রদেশে ধীবে ধীবে বলে বীর্যে একচ্ছত্র হয়ে উঠেন। পার্শ্ববর্তী বাজ্য জয় কবে তিনি এমন একদল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গডে তোলেন যার তুলনা সেকালে মেলে না।

আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন কববাব চেষ্টা কবে ব্যর্থকাম হন। শিবজী কৌশলে আওবঙ্গজেব কন্যা বোশিনাবাকে বন্দী কবে নিজের শিবিবে নিয়ে আসেন। উপন্যাসটির আরম্ভ এখান থেকে। স্বভাবতই শিবজী কিংবা তাঁর

---

১ রচনাকাল ১৭৭৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পাঞ্জলিতে ভূদেব লিখেছেন 'প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাংলাভাষায় লিখিয়াছিলাম।' পুষ্পাঞ্জলির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

সৈন্যবাহিনীর উপরে রোশিনারার বিরাগ আশা করা যায়। রোশিনারা শিবজীর দুর্গে এসে প্রথমে অবজ্ঞা অবহেলায় হিন্দুরাজার ঔদ্ধত্যের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শিবজীর সৈন্যের ব্যবহারে, দুর্গের সেবিকার শিষ্টাচারে রোশিনারা বিস্মিত হলেন। দুর্গের সৈন্যদের আশ্চর্য ব্যবহারে রোশিনারার পূর্ব ধারণা যখন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে, তখন তিনি দুর্গস্বামীর প্রতি আর অহেতুক বিরাগ পোষণ করলেন না। শিবজী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুর্গে ফিরে এলেন। শিবজীর ব্যবহারে বন্দিনী রোশিনারা মুগ্ধ হলেন। শিবজী বললেন তিনি বিবাহ করবার জন্যেই বাদশাহ-পুত্রীকে দুর্গে এনেছেন। গর্বিতা রাজ-নন্দিনী শিবজীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মোগলের সঙ্গে মারাঠার যুদ্ধ আসন্ন এটা সহজেই বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে শিবজীর এক সৈনিক রোশিনারার প্রতি আসক্তি অনুভব করলে। শিবজী সৈনিকের এই আচরণে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবজী তাকে মৃত ভেবে দুর্গ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে শিবজীও অক্ষত ছিলেন না। রোশিনারা কৃতজ্ঞতা-বশতই শিবজীর শুশ্রূষায় আপনাকে নিযোজিত করলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ধীরে ধীরে প্রেমে রূপান্তরিত হল। শিবজীর আচরণে বাদশাহজাদীর নির্মোক খসে পড়ল। বাদশাহপুত্রী প্রতিহিংসা বিস্মৃত হয়ে আপন হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

অপর দিকে শিবজী কর্তৃক আহত সেনাপতি মোগল শিবিরে গিয়ে জ্বলন্ত ভাষায় তাদের উত্তেজিত করল। সেনাপতির দুর্গের পথঘাট জানা। তার সহায়তায় মোগল সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গ অধিকার করলে। শিবজী পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। রোশিনারা দিল্লীতে প্রেরিত হল। মোগল সৈন্যদের ধারণা ছিল শিবজী মৃত। কিন্তু শিবজী পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে চাতুর্যের দ্বারা মোগলদের পরাজিত করে দুর্গ দখল করে নিলেন। ভীষণ যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মোগলদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। বিধর্মীর হাতে লাঞ্ছিত সেনাপতি সকল দোষ স্বীকার করলে। তার দুরবস্থা দেখে শিবজী বললেন, 'হায়! ভারতভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে।' পাপাত্মা হল মোগল সৈন্য। ভূদেবের দৃষ্টিতে শিবজী ভবানীর বরপুত্র। এই ভবানীই পরবর্তীকালে ভারতমাতা পরিকল্পনার বীজ। সেনাপতি বললে স্বপ্নে দেবী ভবানীর আদেশ ছিল এই রকম—

'হে নরাধম। তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মি শক্রর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।'

এমন সময় শিবজীব গুরু বামদাস স্বামী এসে শিবজীকে আশীর্বাদ করলেন। মোগল সৈন্য কর্তৃক সেনাপতির অপমানে শিবজীব সমরানল পুনবায় উদ্দীপিত হল। বামদাস স্বামীব ইচ্ছায় শিবজী যুদ্ধেব উদ্যোগ আয়োজন কবলেন। বামদাস স্বামী কেবল ধর্মশিক্ষাই দেন না, শিবজীব সকল কর্মের সহায়কও তিনি।

বামদাস আহত সেনাপতিকে নিয়ে গেলেন। শিবজীব সুশিক্ষিত সৈন্যদল মোগলদেব বিরুদ্ধে দাঁড়াল। মোগল সৈন্য শিবজীব অপূর্ব বণসজ্জা দেখে চমৎকৃত হল। রামদাস স্বামীব শিক্ষায় অপমানিত সৈনিক যুদ্ধেব নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। একবার যে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছিল তাবই ঋণ শোধ করবাব জন্যে মাবাঠা সেনাপতি আমবণ যুদ্ধ কবলে। তাব সাহস, বীর্য, শক্তি দেখে শিবজী বিস্মিত হলেন। মাবাঠা বীব দেশেব জন্যে, নিজ জাতির জন্যে মৃত্যু ববণ কবতে কুণ্ঠিত হল না। শিবজী সেনাপতিব জন্যে সমবেদনা অনুভব করলে রামদাস স্বামী বললেন, 'মহাবাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্ববণ কবো—সেনানী তাঁহার জীবন-ঋণ পরিশোধ করিলেন।'

শিবজী জীবদ্দশায় এবং মোগল সৈন্য তৎকর্তৃক পরাজিত এই সংবাদে আওরঙ্গজেব জয়সিংহকে শিবজী দমনে পাঠালেন। শিবজী এবার অন্য কৌশল অবলম্বন কবলেন। তাঁর মধ্যে কেবল রাজ্যজয়েব আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল না। মাবাঠা এবং হিন্দুবা যে মোগলদের থেকে শক্তিতে, সামর্থ্যে কোনো অংশে ন্যূন নয় সে কথা প্রমাণ করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জয়সিংহের কাছে তিনি অকপটে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। জয়সিংহ শিবজীর আবেগময় ভাষণে মুগ্ধ হলেন, তাঁবও রাজপুতগবিমা জাগ্রত হল। তিনি শিবজীকে সাহায্যেব প্রতিশ্রুতি দিলেন। জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি অনুযায়ী শিবজী মোগল সৈন্য নিয়ে মোগলশক্র বিজয়পুরেব বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ কবে মোগল দরবারে উপস্থিত হলেন। শিবজীর অন্তরে বীরত্বের স্পৃহা ছিল, পুরুষত্বই তাঁর একমাত্র কাম্য। তিনি মনে করেছিলেন তিনি আওরঙ্গজেবের কাছে পুবস্কৃত হবেন। দিল্লীর দরবারে গেলে রোশিনারা-প্রাপ্তি সহজ হতে পারে এইটিও শিবজী ভেবেছিলেন।

এদিকে রোশিনারা দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হয়ে শাজাহানের সেবাতে মন দিলেন। কোমলহৃদয় বালিকা শাজাহানের কাছে আপন মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বৃদ্ধ শাজাহান পৌত্রীর এই প্রেমে আন্তরিক খুশি হলেন। পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের জীবনের ব্যর্থ পবিণতিতে বৃদ্ধ শাজাহানের মন ভেঙে গিয়েছিল। নিজে যা পান নি অন্যেব জীবনে তা লভ্য হোক এই ভেবে তিনি প্রীত হলেন। বৃদ্ধেব নিকট দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রীতি এক স্বর্গীয় আনন্দের আধার বলে মনে হল। বোশিনারার প্রেম শাজাহানের উৎসাহে গাঢ় হল। কিন্তু বাদশাহপুত্রীর প্রেম অভিশপ্ত, কেননা বাদশাহনন্দিনী প্রেম জানে না।

শিবজী দিল্লীতে এলে রোশিনাবার আশার সঞ্চার হল। অপ্রাপণীয়কে পাওয়া আব অসম্ভব মনে হল না। কিন্তু আওরঙ্গজেব ক্রূব, খল, চতুর। শিবজীর যথার্থ সম্মান মোগল দববারে হল না। শিবজী অপমানিত বোধ করলেন। ধীর বিচক্ষণ শিবজী আপন সৈন্যদের বিদায় দিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে নিভৃতে বাস কবতে লাগলেন। রোশিনারা হতাশা, ব্যর্থতা, দৈন্য নিয়ে শাজাহানের পক্ষপুটে আশ্রয় পাবাব চেষ্টা করলেন।

এদিকে শিবজী একদিন ছদ্মবেশী রামদাস স্বামীকে দেখতে পেলেন। বামদাস স্বামীব সহায়তায় পলায়নের সব ব্যবস্থা ঠিক হল। আওরঙ্গজেবও শিবজীকে যাতে জয়সিংহ আসবাব পূর্বে পর্যুদস্ত করতে পারেন তার দিকে মনোযোগ দিলেন। পুত্র মহম্মদেব নিকট চিঠি লিখে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতক সেনামণ্ডলীর নাম জানতে চাইলেন। জয়সিংহকে বিষপানে হত্যা করলেন। সুতরাং শিবজী জয়সিংহের কোনো সহায়তা পাবে না মনে করে আওরঙ্গজেব নিশ্চিন্ত হলেন। এদিকে শিবজী পলায়নের পূর্বে এক বারবণিতাকে আওরঙ্গজেবের জন্মদিনে দিল্লীর হারেমে পাঠালেন এই সংবাদ দিয়ে যে যদি বোশিনারা ইচ্ছা করেন তবে তিনি শিবজীর সঙ্গে পলায়ন করতে পাবেন। শিবজীর আন্তরিকতায় বোশিনারার একান্ত আত্মসমর্পণেচ্ছু হৃদয় ভেঙে পড়ল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আওরঙ্গজেবের সাবধানবাণী ছায়ার মতো অনুসরণ করল। বাদশাহজাদী এবারে কঠিন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। শিবজী প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে রোশিনারা আপন অঙ্গুরীয় শিবজীকে দেবার জন্য বারবণিতাকে দিলেন। রোশিনারার যে শিবজী-অন্ত প্রাণ, শিবজীই যে তার একমাত্র প্রেমাস্পদ, একথা পত্রে জানালেন। শিবজী সেই দিন পালিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাববণিতা শিবজীকে রোশিনারার মনোভাব বললে। রামদাস স্বামী সব [illegible]

করলেন এবং শিবজীকে আপন কার্যসাধনে উৎসাহিত করতে লাগলেন। শিবজীও রোশিনারার প্রেমে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু এ মিলনে কণ্টক। একদিকে রমণীর প্রেম অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরন্ত ইচ্ছা। এই সঙ্কটের কোনো সমাধান না করেই ভূদেব কাহিনী শেষ করেছেন।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' মারাঠা বীরকে কাহিনী হিসেবে অবলম্বন করে ভূদেব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। মারাঠাজাতির অভ্যুত্থানের সময়ে রাজপুত জাতির বীর্য মোগলদরবারের আনুগত্যস্বীকারে রুদ্ধস্রোত। সুতরাং যদি নবভারতবর্ষ স্থাপন করতে হয় তবে মারাঠারাই তা পারবে। হয়তো এই কারণেই ভূদেব মারাঠা ইতিহাসকে অবলম্বন করেছিলেন। এ ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' শিবজীর বংশধরকেই তিনি আদর্শ নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। মারাঠা বীরের আদর্শ ভূদেবকে আরও এক কারণে আকৃষ্ট করে থাকতে পারে। হিন্দু জাতির ধর্মীয় প্রবণতাও মারাঠা জাতির মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল। এই কারণেও তিনি মারাঠাদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করে থাকতে পারেন। কিন্তু শিবজীর আদর্শ পরবর্তীকালে সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। শিবজীর পুত্র পৌত্র মারাঠা ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে নি। ভূদেব যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বাধীনতা শিবজীর উক্তিতে রয়েছে। গ্রন্থমধ্যে শিবজীর চরিত্রটির ওপরই নানা দিক দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থের নাম অঙ্গুরীয় বিনিময়। কিন্তু এই 'বিনিময়' ভূদেবের উপন্যাসে সামান্য অংশ জুড়েছে। প্রধান হয়েছে শিবজীর আদর্শ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রণ-কৌশল ও নীতির বর্ণনা। সব মিলে শিবজী আদর্শবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছেন। জয়সিংহের নিকট শিবজীর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জয়সিংহের নিকট শিবজীর বক্তব্য কেবল চাতুর্যের নিদর্শন নয় বরং শিবজীর জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রকাশ। যে স্বাধীনতার স্পৃহা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী উজিয়ে উনিশ শতকে পৌঁছেছিল ভূদেব তাকেই শিবজীর জবানিতে ব্যক্ত করেছেন।—

'যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমাকর্তৃক হ্রস্বতেজা হয়েন, উভয়েরই আওরঙ্গজেব মঙ্গলাবহ।'

এই জাতীয় ধর্ম রক্ষা করবার জন্যেই এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যেই শিবজীর আজীবন কর্মসাধনা। সুতরাং শিবজী ভূদেবের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার

প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই অধ্যায়েই ভূদেব আদর্শ রাজশক্তির মৌলিক গুণাবলীর কথা বলেছেন—

'রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজাব প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু বাজাবা তাঁহার সমযে রাজকার্যে বুদ্ধি নিযোজন করিযা সুশাসন বিধি সমস্ত নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।'

শিবজীব এই উক্তিব সঙ্গে 'স্বপ্নলব্ধ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে'ব আশ্চর্য মিল দেখা যায়—

'আকবব সাহাই বুঝিযাছিলেন, কেমন কবিযা অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদেশটিকে একচ্ছত্র কবিযা রাখিতে হয। ধর্মবিদ্বেষ কখনই তাঁহাব অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে একধর্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি ঐ পথে না চলিবেন তিনিই ভাবতবর্ষের সিংহাসন হইতে স্খলিতপদ হইবেন।'

এই উক্তি রামচন্দ্রের, অঙ্গুবীয় বিনিময়ে যার বীজ 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তাই মহীরুহে পবিণত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যা অস্ফুট 'স্বপ্নলব্ধ ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে' তাই ফুটন্ত, ফলন্ত।

'অঙ্গুবীয বিনিময়ে'ব অপর এক মূল্যেব কথা উল্লেখ করছি। আগে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গালগল্প পেয়েছি সেখানে রোমান্স, কিংবা যুদ্ধবর্ণনা ছাডা আব কিছুই ছিল না। ইতিহাসেব ক্ষীণ পদধ্বনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয যে কাহিনীটি ইতিবৃত্তমূলক। ভূদেবের অঙ্গুবীয় বিনিময়ে রোমান্স অংশ ততটা প্রাধান্য পায় নি সত্য কিন্তু সমস্ত জুড়ে একটি ঐতিহাসিক আবহ রয়েছে। শিবজীব পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায়, মাবাঠাদেব সাহসিকতায়, যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনায়, বাজ-অন্তঃপুবেব চকিত উদ্‌ঘাটনে, শাজাহানের করুণ জীবনী প্রকাশে, বাদশাহজাদীর ট্রাজিক অবস্থায়, আওরঙ্গজেবের শঠতা ক্রূবতার বর্ণনাতে ভূদেব ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি অক্ষুন্ন বাখতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ তথ্য কোথাও আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয নি। সর্বত্রই কাহিনীব গতি সাবলীল। যা ঘটে নি অথচ সম্ভাবিত ছিল সেই সত্য উদ্‌ঘাটনে ভূদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাস কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে—আব বোমান্স ইতিহাসেব চারদিকে একটা সরু পাড বুনে দিয়ে নবতব বৈচিত্র্যেব সূচনা করেছে।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে কণ্টারের 'দি মার্হাট্টা চীফ'-এর অনেক অংশই বাদ গিয়েছে। কণ্টার শিবজী-রোশিনারার বিবাহ ঘটিয়েছেন এবং শিবজীর পুত্রের

সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে চমৎকারিত্ব আনবার চেষ্টা করেছেন। ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল শিবজীর দেশহিতৈষণার দিকটিকে তুলে ধরা। সে বিষয়ে তিনি সার্থকও হয়েছেন। শিবজীর সঙ্গে রোশিনারার বিবাহ ঘটানো ভূদেবের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তবে কণ্টাবের গল্পটি নিছক রোমান্স। ভূদেব এই রোমান্সের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের সংমিশ্রণে নূতনত্ব এনেছেন।

অঙ্গুরীয় বিনিময় আরও এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এ বই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ক্ষীণ প্রভাব ফেলেছিল। ভূদেবের রামদাস স্বামীর অনুসরণে দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী কল্পিত। রোশিনারার সঙ্গে আয়েষার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'অঙ্গুরীয়' উভয় উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান। অবশ্য এর জড় পৌঁছায় সংস্কৃত সাহিত্যে।

ভূদেবের সময়ে ডফের বই ছাড়া মারাঠাদের কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ছিল না। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের চোখে শিবজী একজন দস্যুরূপে চিত্রিত। বাঙালির পক্ষে তখন সুদূর মারাঠা অঞ্চলের ইতিহাস জানবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ শিবজীর উত্থান এতই অতর্কিত এবং আকস্মিক যে তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা করা প্রচুর গবেষণাসাপেক্ষ ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

'সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।'

ভূদেবের কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই বাংলাদেশে মিথ্যাময়ী ইতিহাসের মুখর ভাষণ থেকে শিবজীকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরও কল্পনায় ছিল রবীন্দ্রদৃষ্টি—

'তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
"এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।" '

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বই রমেশচন্দ্র দত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। জয়সিংহ-শিবজী দৃশ্যকে প্রায় পুরোপুরিভাবে রমেশচন্দ্র অনুকরণ করেছেন তাঁর 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' গ্রন্থে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। সম্প্রতি বাংলা উপন্যাসের জন্মসাল নিয়ে কিঞ্চিৎ বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে।[১] ইতিপূর্বে জানা ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এখন মিসেস ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণা' প্যারীচাঁদের স্থান নিতে চাইছে। এ বাদবিতণ্ডায় প্রবেশ না করেও এ কথা বলা যেতে পারে যে 'ফুলমণি ও করুণা' অথবা 'আলালের ঘরে দুলাল' এ-দুটি গ্রন্থ কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের দাবি করতে পারে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লেখকের মতে নিশ্চয়ই উপন্যাস কিন্তু এ গল্পটিকে অনেক সমালোচকই বড়ো গল্পের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্য-গুলি তাতে অনুপস্থিত। উপন্যাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞাও আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নি। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাসের যে বিচিত্র রূপ দেখা দিয়েছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের অনেক রূপকর্মকেই সংজ্ঞার বন্ধনে বাঁধা সম্ভব নয়। এতে এক দিক থেকে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে। লেখকদের স্বাধীনতা বিচিত্রপথগামী হবার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং উক্ত বাদবিতণ্ডায় প্রবেশ না করে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। পূর্বে যে তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি সেগুলির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এদের সাহিত্য-মূল্যও আছে। এমন-কি সামাজিক মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। তথাপি সাহিত্যবিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই উপন্যাসের ফলন্ত রূপটি গড়ে উঠেছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা উপন্যাসের মাইলস্টোন। এ কথা আমরা সকলেই জানি 'দুর্গেশনন্দিনী'র নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি 'দুর্গেশনন্দিনী'কে কখনও উপেক্ষা করে নি। 'দুর্গেশনন্দিনী' বার হবার পর এ কথা অবিদিত রইল না যে ইউরোপীয় সাহিত্যের আর একটি রূপকর্ম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপ্ত হল। উনবিংশ শতকে ইউরোপ থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। উপন্যাস তার মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রই সাহিত্যের এই শাখাটিকে ফুটন্ত ফলন্ত করে তোলবার জন্য নিজ প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেন, বহু প্রতিভাবানকে আহ্বান জানালেন

১. শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'

উপন্যাসের প্রাঙ্গণে। তাব ফল যে কী অসামান্য হযেছিল সে কথা সাহিত্যেব ইতিহাস অনুধাবন কবলে বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র মোট চৌদ্দটি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা কবেছিলেন। তার মধ্যে 'যুগলাঙ্গুবীয়', 'বাধারানী' বড়ো গল্প। বাকি বাবোটি উপন্যাসেব মধ্যে নয়টি উপন্যাসেই তিনি ইতিহাসকথার অবতাবণা কবেছেন। 'যুগলাঙ্গুবীয়'তে ইতিহাস নেই বটে কিন্তু স্থান কাল পাত্র সুদূব অতীতেব। ইতিবৃত্তেব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগ্রহ প্রমাণ কবে যে তিনি অতীতেব বিস্মৃত অধ্যাযকে পুনরুজ্জীবিত কবার প্রয়াসী ছিলেন। অতীত সম্বন্ধে তাঁব আকর্ষণ ছিল প্রবল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রেব সময়ে যথার্থ ইতিহাস ছিল না। যথার্থ ঐতিহাসিক গবেষণাব সূত্রপাতও মুখ্যত তাঁব প্রচেষ্টাতেই হয। স্কুলে এবং কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়তে হযেছিল তা 'মুষ্টিভিক্ষা'ও নয। ইতিহাস পাঠে তাঁব আগ্রহ ছিল, অথচ ভাবতবর্ষেব ইতিহাস গ্রন্থ তিনি পান নি। ইউবোপেব ইতিহাস পড়ে তাঁব বাংলাব ইতিহাসেব জন্যে ক্ষোভ হত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন,

'At college Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian '১

বঙ্কিমচন্দ্রেব পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই। এই সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থ কী ছিল তা আর আজ জানবাব উপায নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযই এই-সব গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত কবে গেছেন।

'কাব্যের চেযেও ইতিহাসেই তাঁহাব বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সেব মেডিচিদের কথা কহিতেন। রিনাইসেন্স (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আযত্ত করিযাছিলেন এবং সেই পথ ধরিযা বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিযা যান।'২

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ভাবতবর্ষেব ইতিহাস লেখবাব আশা ত্যাগ করেন নি। ইতিহাস চর্চাব সূত্রপাতও কবেছিলেন বঙ্গদর্শনেব পাতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আশা ফলবতী হয় নি।৩ তাঁব জন্যে দুঃখ কবি না। দেশে তিনি বাঙালি চিত্ত-গহনে যে অনুরণন তুলেছিলেন তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। ইতিহাসচর্চা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে নি। কিন্তু বাংলাব ইতিহাসের খসড়া রচনা করবার

---

১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-জীবনী'

২. হরপ্রসাদ-রচনাবলী

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস—সাহিত্য সাধক-চরিতমালা ২২

পূর্বে তিনি উপন্যাসে সে বস্তু দিতে আরম্ভ করেছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই তার শুভ সূচনা।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রায়শই ইতিহাস এবং উপন্যাসের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান হয় নি। কেউ তথ্যকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। কেউ তথ্যকেই সর্বস্ব করেছেন। **বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত রোমান্স-রচয়িতা।** তিনি ইতিহাসকে সেই কাজেই ব্যবহার করেছেন বেশি। কিন্তু তথ্যের আতিশয্য তাঁর উপন্যাসে জোরডা হয়ে লেগে থাকে নি। পৌরাণিক ঋষি যেমন মন্দাকিনীধারা এক নিমেষে পান করে নিয়ে পরে তাকে ভোগবতী ধারারূপে বইয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও জহ্নু মুনির মতো ইতিহাসধারাকে আপনার বশে এনে তাকে উপন্যাসের খাতে প্রবাহিত করেছেন। **বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ইতিবৃত্তকে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। একে একে সেগুলির উল্লেখ করছি।**

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গল্প রচনা করতে চেয়েছেন। অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসে ভাষাগত শৈথিল্য আছে। তথাপি শৈলেশ্বরের মন্দির বর্ণনায়, দুর্গের রহস্যঘনিমায়, নায়িকার রূপমহিমায়, কতলু খাঁকে নর্তকীর ছদ্মবেশে বিমলা কর্তৃক হত্যার দৃশ্যে, নদীর ধারে ওসমান-জগৎসিংহের যুদ্ধ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি দীপ্তি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে বাংলা রচনায় আমরা দেখতে পাই নি। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বহু-কথিত এই উক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিশীথের যে রহস্যময় পরিবেশের অবতারণা করেছেন তাও প্রশংসার যোগ্য। উপক্রমে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের স্বপ্নময় বর্ণনার সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করেছি। **দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণনাময় দৃশ্যগুলির সেই সার্থকতা। ইতিহাস এখানে সমতলের রুক্ষতা নিয়ে উপস্থিত হয় নি, পর্বতশীর্ষের দীপ্ত মহিমায় ইতিবৃত্ত যথার্থ মর্যাদায় স্থাপিত।** রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি এই নবোদিত সাহিত্য-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত। দুর্গেশনন্দিনীতে তার প্রথম প্রকাশ এবং বিস্ময়কর বিস্তার। **ইতিবৃত্তকে এখানে তিনি কোন প্রয়োজনে**

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত

উপস্থাপন করেন নি। কেবলমাত্র গল্পরস পরিবেশন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল।

'কপালকুণ্ডলা'র ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীটিব একক মর্যাদা বঙ্কিমচন্দ্র দিতে চান নি। কপালকুণ্ডলাব ভূমিকাই ঐ উপন্যাসেব মুখ্য বিষয়। **কপালকুণ্ডলাকে মুকুলিত বিকশিত করার জন্যে ইতিহাস কাহিনীর সার্থকতা।** এই জাতীয় আর একটি ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী আছে 'চন্দ্রশেখরে', অবশ্য ইতিহাস-কাহিনীটির স্বতন্ত্র মর্যাদা কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দলনী বেগমেব কাহিনীটিব আদ্যন্ত বিকাশ দেখিয়েছেন। কপালকুণ্ডলায মুখ্য কাহিনীব প্রয়োজনে মতিবিবির বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজকেব দিনে এই গৌণ চরিত্রেব ভূমিকা সমালোচকের কঠিন মন্তব্যের কাবণ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উপকাহিনী সম্বন্ধে এত কঠোর হবাব প্রযোজন দেখা দেয নি। তিনি মতিবিবির আদ্যন্ত পরিচয উপন্যাসে বর্ণনা কবতে দ্বিধা কবেন নি। বিশেষত নবকুমাবেব সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল বলেও পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা-মতিবিবিব পবিচয় সবিস্তাবে বলেছেন। এ কথা ভুললে চলবে না বঙ্কিমচন্দ্র চবিত্রবিশ্লেষণে যেমন দক্ষতা দেখিযেছেন (যেমন 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তেব উইল', 'বজনী') তেমনি নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাহিনী গ্রন্থনে। এ-যুগে উপন্যাসে কাহিনীব মূল্য ততটা নয যতটা মূল্য মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাতে। বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীসূত্রবচনে গুরুত্ব আরোপ কবেছেন বেশি। সর্বদা সার্থক হয়েছেন এমন কথা বলি না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি অমনস্ক ছিলেন না এ কথা জোর করেই বলা যায়। দলনী বেগম এবং শৈবলিনী স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'চন্দ্রশেখবে' বঙ্কিমচন্দ্রের দলনী বেগমের প্রতি সমবেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনী প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীব কথাস্রোত মাঝে মাঝে রুদ্ধ করে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দলনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। দলনী বেগম গীতিকবিতার অখণ্ড ভাবের প্রবাহ। বঙ্কিমের কবিজনোচিত অভীপ্সা দলনী চরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সার্থকতা পেয়েছে।

'মৃণালিনী'তে ইতিহাসের ভূমিকা আব গৌণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন এই উপন্যাসে। প্রথম যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের দ্বিবিধ দাযিত্ব পালন কবতে হয়েছিল। **এক দিকে ইতিহাস অবলম্বনে রসসৃষ্টি, অন্য দিকে ইতিহাসের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটন। শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগানোও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য ছিল।** মৃণালিনীব তথ্যবিবলতা পীড়াদায়ক। কিন্তু এই বিরল তথ্য থেকে যে সত্যটি মৃণালিনীতে নির্ণীত হয় তা হল দেশপ্রেমিকের

জাতির কলঙ্কমোচনের প্রগাঢ় প্রয়াস। বাংলার প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিম-চন্দ্র আমাদের সংশয় জাগিয়েছেন। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত অনুসরণ করেই সত্যপরিচয় উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন।[১] এইখানেই মৃণালিনীর অন্যতম সার্থকতা।

'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' এবং 'সীতারাম' উপাখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র কাছের ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। এ যুগ সম্বন্ধে লোকমুখে যে গল্পগুলি চলছিল সেগুলি নিছক আর গল্প নয়। সে গল্পের মধ্যে সত্য নিশ্চয়ই ছিল। ইংরেজ শাসনযন্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত। সে শাসনের সুফল তিনি দেখেছেন। নবাবী আমলের অত্যাচার নিপীড়নের কথা সর্বজনবিদিত। **বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় সেইজন্যে রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ দেখি। এই ইতিহাস ঘরোয়া পরিবেশের নয়।** আনন্দমঠ দেবী চৌধুরানী সীতারামের বিবরণে যে উচ্চাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপিত তা বাঙালির নিস্তরঙ্গ জীবনে অসম্ভাবিত ছিল। জীবনে যা পাই নি অথচ যার প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে জেগেছে তাই উপন্যাসে লাভ করে বাঙালি ধন্য হয়েছে। **এই সব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশচর্চার কথা বলেছেন। দেশচর্চার কথা পরিস্ফুট করতে হলে যে পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশের জন্যে ঐতিহাসিক পটভূমির অবতারণা।** এ কথা মনে রাখতে হবে তখনও অনুশীলন-যুগান্তর পার্টির বৃহত্তর ভূমিকার কথা কেউ ভাবতে পারে নি। কংগ্রেসের সবে মাত্র শুরু। **বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের কথা শুনিয়েছেন।** বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই সমিধ সংগ্রহ করে পরবর্তীকালের যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারা গিয়েছিল। আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র **ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচর্চাকে সুস্পষ্ট আকার দেবার জন্য একটি পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সে সুযোগ দিলে। ইতিহাসের সার্থকতা সেইখানে। প্রসঙ্গত বলে রাখি শৈবলিনীর প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলে চিহ্নিত করতে পারতেন। কিন্তু বঙ্কিমের সমসাময়িক যুগে শৈবলিনীর আচরণ প্রত্যাশিত ছিল না। সুতরাং শৈবলিনীর প্রেম বর্ণনার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল ইতিহাসের।** কোনো কোনো

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ ১৩২২

সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জ ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব করে। H. Butterfield নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন সে সমালোচনা যথার্থ নয়। অনেক সময়েই লেখক ইতিবৃত্তে এমন সব ব্যক্তির এবং এমন সব ঘটনার সাক্ষাৎ পান যা ঔপন্যাসিকের একটি ideaকে প্রমূর্ত করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করে। ঔপন্যাসিক যেন একটি তৈরি-গল্পের মধ্যে রঙবিপুব কাজ করে দেন। 'সীতারাম' এই শ্রেণীর উপন্যাস। গীতার নিষ্কাম ধর্ম এবং স্বদেশচর্চার মহান্ বাণীটি তিনি সীতারামের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একটা ideaর ইতিহাসে সমর্থন মিলে যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করলেন। সীতারামের ইতিহাস নির্বাচন আরও এক দিক দিয়ে সার্থকতায় মণ্ডিত। ম্যাককালাম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে শেক্সপীয়র ইতিহাসের সেই সমস্ত বিষয়ই নির্বাচন করেছিলেন যেগুলি জাতির প্রিয় ঘটনা এবং চরিত্র। তদানীন্তন পাঠক-দর্শক নাটকের সূক্ষ্ম কলাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখে নি। ইতিহাস নাটকের পাত্রে বিধৃত হয়ে সেই প্রাচীন প্রিয় গল্পগুলিকেই নতুন করে পাঠক-দর্শককে শুনিয়েছে। পাঠক-দর্শক নির্বিচারে তা গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য দেখিয়েছেন। মৃণালিনীতেও তা পারতেন। কিন্তু তথ্যের বিরলতার জন্য সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান থেকে গেছে। সীতারামের তথ্য ছিল প্রচুর। সেগুলিকেই বঙ্কিম নিজের মতো করে সাজিয়ে উপন্যাসাকারে পরিবেশন করেছেন। অবশ্য এ কথাও ভুললে চলবে না যে সীতারামের শিল্পমূল্য কোনো অংশে কম নয়।

উপন্যাসে ইতিহাসের যোগাযোগ ঘটা সত্ত্বেও মৃণালিনীর তৃতীয় সংস্করণের (১৮৭৪) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর টাইটেল পেজে লেখা ছিল 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস', মৃণালিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত টাইটেল পেজে লেখা ছিল 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ভূমিকায় 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তালিকা থেকে খারিজ করেছেন। আর 'মৃণালিনী'র তৃতীয় সংস্করণ থেকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' পরিচয়টি লুপ্ত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাখ্যান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রাথমিক ধারণাকে পরিবর্তিত করেছিলেন।

রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাব কথা পেলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব আটখানি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেব মধ্যে একমাত্র রাজসিংহ ছাড়া বাকি সাতখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। দেবী চৌধুবানীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'

আগে বলেছেন—

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে' কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব।'

এ থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রেব অনেক উপন্যাস আকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে হলেও প্রকৃতিতে সেগুলি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় সে কথা লেখক বলতে চেয়েছেন। সীতাবাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১] এই সমস্ত উক্তি থেকে বুঝতে পাবি বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে কঠোর নিয়মকানুন আরোপ কবতে চেয়েছিলেন। **এ কথা ঠিক তিনি ইতিহাসকে গ্রহণ করলেও সব উপন্যাসেই ইতিহাসকে সর্বস্ব করতে চান নি। কিংবা ইতিহাসের মাহাত্ম্যও প্রচার করতে উৎসাহী হন নি।** কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীব ঘটনাসংস্থান সবই ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে এই উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা থেকে বঞ্চিত করলেন তা বলা দুরূহ। আযেষা-তিলোত্তমা অনৈতিহাসিক। গ্রন্থটিব নাম দুর্গেশ-নন্দিনী। তিলোত্তমা গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অনৈতিহাসিক হওযাব জন্যেই কি বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে সম্মত ছিলেন না? ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহাসিক চবিত্রেব প্রবেশ কি একেবাবেই সম্ভব নয়? রাজসিংহে মবাবক-দবিযা অনৈতিহাসিক চবিত্রের প্রবেশ ঘটা তা হলে সম্ভব নয়। আমাদেব মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহাসিক চরিত্রেব প্রবেশে আপত্তি কবেন নি। তাঁব মতে সেই উপন্যাসই ঐতিহাসিক যে উপন্যাসে 'ঐতিহাসিক বস'ই প্রধান। **ইতিহাসের কোনো একটি বৃহত্তর বা স্মরণীয় ঘটনাকে পরিস্ফুট করার জন্য যদি সমস্ত ভূমিকাগুলি একযোগে দায়িত্ব পালন করে তবেই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হবে।** দুর্গেশনন্দিনীতে

১. উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন—সীতারাম, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হয় নি, কিংবা যুদ্ধ বর্ণনাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্যও দেন নি। সে যুগের কোনো ঐতিহাসিক সত্যও ঐ গ্রন্থে নির্ধারিত হয় নি। সুতরাং **বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দুর্গেশনন্দিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।** মৃণালিনী যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হবার প্রধান বাধা তথ্যের অভাব। এখানেও প্রধান ঘটনা পশুপতি-মনোরমা এবং হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমকাহিনী। মনোরমার দ্বৈত ব্যক্তিত্বের উপরও বঙ্কিমচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন। স্থান কাল এবং পরিবেশটিও তথ্যের অভাবে অত্যন্ত ফিকে। এই কারণে মৃণালিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে নি। কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠে ইতিহাসের প্রয়োজনীতা অন্য কারণে। তার কারণ আগে বলেছি। চন্দ্রশেখরে ইতিহাস-কাহিনীটির গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু ইতিহাস-কাহিনীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিতে চান নি। চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনীটিকে স্পষ্ট, আবর্তসঙ্কুল এবং পরিণামরমণীয় করে তোলবার জন্যই অপর কাহিনীর সার্থকতা। এই কারণেই এইটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীতে বিবেচনা করেন নি। সীতারাম উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতে বলেছেন সীতারামের ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখেছি সীতারামে ঐতিহাসিকতা অনেকখানিই যথাযথ। তবে শ্রী-জয়ন্তীর মিলিত শক্তির জন্যে সীতারামের উত্থান এবং পতন অনৈতিহাসিক। সেই কারণে সীতারামকেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চান নি। (একমাত্র রাজসিংহেই বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলি ইতিহাসের স্রোতকেই বিস্তৃত করেছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ও হল রাজসিংহ-আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবকেই পরিস্ফুট করেছেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নিদর্শন বলেছেন।)

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে আমরা আটখানি উপন্যাসের মধ্যে সাতখানি উপন্যাসই কেন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তার আলোচনা করলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণে' আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় যে সমস্ত ঐতিহাসিক ভূমিকা লিখেছেন সেখানে কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতকে গ্রাহ্য করেন নি। তিনি ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করে দেখিয়েছেন যে কোথাও কোথাও তথ্যগত ভুল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যুগপরিবেশটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। কখনও ঘটনার যথাযথ বর্ণনায়, কখনও চরিত্রের যাথার্থ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পাত্রপাত্রী কিংবা স্থানকাল ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই এইগুলিকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে দ্বিধা করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এবং আচার্য যদুনাথ সরকারের এই ভিন্ন মতের কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত। আচার্য সরকার সীতারাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভূমিকায় 'টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট' থেকে অভিমত তুলে নিজের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোনো সংজ্ঞা দেন নি বটে। তবে তিনি যে কঠোর নিয়মের অনুশাসন দিয়েছেন সেরকম সংজ্ঞাও অলভ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম এবং রাজসিংহ যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেননা এখানে **স্পেস, টাইম, কন্‌টেক্‌সট ঠিক আছে। মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এই-সব উপন্যাসে স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা যুগচিহ্নিত।** কিন্তু মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী এবং কপালকুণ্ডলা **ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস।** এগুলিতে ইতিহাস এসেছে কোনো একটি idea বা কোনো সাধারণ ঘটনাকে আরও বিকশিত আরও মুকুলিত করে তোলবার জন্য। ইতিহাসের এখানে **স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই।** সেজন্যে এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব না। কিন্তু ইতিহাসের কিছু দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গীকার করেছেন বলে এগুলিকে **ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলতে চাই।** **রাজসিংহে ইতিহাসই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।** রাজসিংহ এবং আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ-কাহিনীটিই উপন্যাসের মূল আকর্ষণ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যানুগত্যও ছিল অপরিসীম। কেবল যেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা ঘটেছে সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যের ফাঁক-পূরণের জন্য কিঞ্চিৎ নূতন উপাদান যোগ করেছেন। প্রথম চারখানিকে (যে চারখানির কথা আমরা বলেছি) ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে দ্বিধার কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধা ছিল কেননা তিনি কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী। কিন্তু আগের আলোচনায় দেখিয়েছি প্রথম চারখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন ইতিহাসেরই স্বার্থে। শেষোক্ত চারখানি উপন্যাসে মূল কাহিনীকে ইতিহাস সাহায্য করেছে মাত্র। এর মধ্যে চন্দ্রশেখর আবার মিশ্র ধরনের। এই উপন্যাসটিকে ইতিহাসাশ্রিতই বলা উচিত। উপন্যাসটির গঠন কিঞ্চিৎ শিথিল। দলনীর অত্যধিক প্রাধান্যও দুর্লক্ষ্য নয়। আসল কথা উপন্যাসের যেমন নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা আজও পর্যন্ত নিরূপিত হয় নি সেইরকম ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা হয় নি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এবং আচার্য যদুনাথ সরকারের সমালোচনা দুটিই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ-যোগ্য সন্দেহ নেই। **ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। কারণ সীতারামের** প্রথম কিয়দংশ

নরনারীর প্রেমদ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতি—ঐতিহাসিক আলোচনা গৌণ। **ডক্টর সুকুমার সেন** মহাশয় একমাত্র রাজসিংহকেই **খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। কেননা তাতে স্পেস্, টাইম, কন্‌টেক্‌সট** *ঠিক* **আছে।** আমাদের সিদ্ধান্ত কি তাও বলেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুদ্ধবর্ণনার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেব ইতিহাসাশ্রিত এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস উভয় রচনাতেই যুদ্ধবর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধবর্ণনাতে বঙ্কিমচন্দ্র একই ভাবেব পুনবাবর্তন করেন নি। যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আমাদেব ঐতিহাসিকবা বিশেষ আলোচনা কবেন নি। সে যুগে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহাব সম্বন্ধেও এতকাল আমাদেব ধাবণা সীমাবদ্ধ ছিল।[১] বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস বচনা করেন তখন যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা আবও সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং তাঁকে কল্পনাবলে সেযুগেব যুদ্ধপবিকল্পনা করতে হয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনী থেকে বাজসিংহ পর্যন্ত যতগুলি যুদ্ধবর্ণনা পাই তাব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পবিকল্পনাব বৈচিত্র্য এবং গভীবতা দেখি। দুর্গেশনন্দিনীতে পাঠানদেব বীবেন্দ্রসিংহেব দুর্গেব আক্রমণ কতকটা ফিকে। পাঠান সৈন্য কর্তৃক অতর্কিতে দুর্গে প্রবেশ এবং বিমলাব দুর্গে বন্দী হওয়া এবং পবে বিমলাব পাঠান সৈন্যকে নিয়ে কিঞ্চিৎ আদিবসেব অভিনয় যুদ্ধের ভযাবহতা সম্বন্ধে কোনো বাস্তব ধাবণা দেয় না। জগৎসিংহেব সঙ্গে ওসমানেব দ্বৈত সমব ইংরেজি উপন্যাসেব আদর্শে পবিকল্পিত। মৃণালিনীতে যুদ্ধবর্ণনা নিশীথ বাত্রিব দুঃস্বপ্নেব মতো। বখতিযাব খিলিজি অনাযাসে লক্ষ্মণসেনেব বাজপ্রাসাদ দখল কবে নিলে। তবে যুদ্ধেব একটা প্রকৃত পটভূমিকা প্রস্তুত কবে বঙ্কিমচন্দ্র আসন্ন সমবেব প্রত্যাশাকে পাঠকচিত্তে দৃঢ় করে দিযেছেন। চন্দ্রশেখবে মীরকাশিমেব সঙ্গে ইংবেজেব যুদ্ধ কিংবা প্রতাপেব সঙ্গে ইংবেজ সৈন্যেব যুদ্ধ আমাদেব তেমন উৎকণ্ঠাব আবেগে উদ্‌বেলিত কবে না। **মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের সমর নেহাৎ ইতিহাসের বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী। ঔপন্যাসিকের বর্ণানুলেপ সেখানে পাই না। প্রতাপের যুদ্ধবর্ণনায় প্রকৃত বীরত্বের আভাস আছে। কিন্তু প্রতাপের যুদ্ধ আত্মবিসর্জনের জন্য। যুদ্ধবর্ণনা অপেক্ষা আত্মত্যাগের মহৎ ভূমিকাটির উপরই বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছেন বেশি। আনন্দমঠ-সীতারামের যুদ্ধবর্ণনা প্রকৃত দেশনিষ্ঠার মহান্ আদর্শের দ্বারা উদ্‌বোধিত।** ভবানন্দ, ধীরানন্দ, সত্যানন্দ যে-কৌশলে

---

১. সম্প্রতি প্রকাশিত যদুনাথ সরকারেব *Military History of India* **গ্রন্থ এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করেছে।**

নবাব এবং ইংরেজ সৈন্যের গতিবোধ করেছে তাতে কবে যুদ্ধপ্রণালীব বাস্তবতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ধাবণা করে নিতে পাবি। আনন্দমঠ-সীতাবামের যুদ্ধবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির বীরত্ব-আকাঙ্ক্ষাকে পবিস্ফুট করেছেন। **সমস্ত সংগ্রামের পশ্চাতে আদর্শবাদের এমনই একটা সৌন্দর্য বিস্তার করে যা একাধারে ভীম ও কান্ত, কঠোর ও পৌরুষদীপ্ত। রাজসিংহে এই যুদ্ধবর্ণনা আদর্শবাদের দ্বারা বিজড়িত হয়েও স্বতন্ত্র।** এখানে বাহুবল প্রতিষ্ঠা কবাই বঙ্কিমচন্দ্রেব মুখ্য অভিপ্রায ছিল। বাংলাব ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র বীবত্ব-সংগ্রামেব তেমন কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পান নি। তথাপি কল্পনা-প্রবণতাব অসাধাবণ বিকাশ ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধবর্ণনায উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। বাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে সাহায্য পেযেছেন। টডের গ্রন্থে তাব ভূবি পবিমাণ বিববণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধেব কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবলেন বাজসিংহ উপন্যাসে। ফলে বাজসিংহ উপন্যাসেই বৃহৎ মোগল সৈন্যেব ব্যূহ প্রবেশ থেকে বাজপুত সৈন্যেব গোপন প্রদেশ থেকে অতর্কিত আক্রমণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনায় প্রকৃত যুদ্ধেব যুক্তি কূটনীতি ষডযন্ত্র সবই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। **আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার মিলনে রাজসিংহ উপন্যাসের যুদ্ধবর্ণনা অপরূপ দীপ্তি লাভ করেছে।** বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে 'স্বাধীনতা-হীনতায়' বাঙালি মর্মপীড়া অনুভব কবেছিল। অথচ বাঙালি বীবেব সন্ধান তখনও ইতিহাসে মেলে নি। দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতাবাম পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি বীবের কথা নানাভাবে বলেছেন। কিন্তু যথার্থ বীবত্বেব আভাস দিলেও তিনি সার্থক বীবচবিত্র ফুটিযে তুলতে না পেবে অতৃপ্ত ছিলেন। বীবেন্দ্রসিংহ-হেমচন্দ্র-প্রতাপ-সত্যানন্দ-ভবানন্দ-সীতাবাম এই-সব চবিত্রেব ব্যর্থতাব কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। এই-সব পবিকল্পনা থেকে এ কথাই মনে হয যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব ইতিহাসে যা খুঁজেছিলেন তা পান নি। অতএব বাংলাব বাইরের বাজপুত জাতিব ইতিহাস সংগ্রহ কবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব অগস্ত্যতৃষ্ণা মেটালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুবানীতে নবাবী আমলেব শেষ এবং ইংবেজ আগমনেব প্রথম পর্ব উপস্থিত কবা হয়েছে। **আমাদের মনে হয় এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আর একটি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নবাবী আমলের যে সময়কে তিনি বেছে নিলেন সে সময়টি বিশৃঙ্খলার যুগ।** ভারতচন্দ্র বলেছিলেন 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'? সমস্ত বাংলাদেশ

তখন দগ্ধ। এই বিশৃঙ্খলা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানীতে বিশেষ করে প্রকাশ করেছেন। নবাবী আমল যে আর চলবে না, সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন আনন্দমঠে। সুতরাং **old order changeth yielding place to new।** বাংলাদেশের যে অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন সে কথা উপন্যাস আলোচনায় বলেছি। দেবী চৌধুরানীতে বলেছেন 'তখন ইংরাজদের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন'। এই বে-আইনী অবস্থার অবসান কিভাবে ঘটেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় এই উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাবে। আচার্য যদুনাথ সরকার পলাশীর যুদ্ধবর্ণনার পর ইংরেজের আবির্ভাবকে যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন[১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই নানাভাবে আভাসিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেখা যায়। এ বস্তুটি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। কেউ বা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী কেউ বা রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন বলে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। এ কথা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রাজশক্তির অনাচার, অত্যাচার, কূটনীতি, শোষণের কথাই নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যে মুসলমান ইতিহাস আমাদের জানা ছিল তা বঙ্কিম-চন্দ্রের বর্ণনা থেকে আরও বেশি মসীলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে প্রায়শই অনাচ্ছন্ন ছিল তার প্রমাণ আয়েষা, ওসমান, নূরজাহান, মৃণালিনীর পাঠান সৈনিক, মীরকাশিম, দলনী বেগম, সীতারামের ফকির, মবারক-জেবউন্নিসা-দরিয়া চরিত্রগুলি। আমরা প্রত্যেকটি উপন্যাসের উৎস নির্ণয় করে দেখিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে যা পেয়েছিলেন তাকেই উপন্যাসে যথাযথ বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মুসলমানদের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন হতেন তবে মুসলমান চরিত্র তাঁর উপন্যাসে এত উজ্জ্বল, এত বাস্তব হত না। আর হিন্দু চরিত্রের মধ্যেও পশুপতির চিত্র আঁকতে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। গঙ্গারামকে পেতাম না যদি না বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ শিল্পী হতেন। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসত্তাই জয়ী হয়েছে। আর শিল্পী হচ্ছেন দলগত বিচারের ঊর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই উদারতা ছিল।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত কতগুলি **কৌশলের** পরিচয় দিই। **বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কতগুলি চরিত্রের পরিচয় অনেক সময়েই**

---

১. দ্রষ্টব্য J. N. Sarkar (ed.), *History of Bengal, Vol. II* (Dacca University)

অজ্ঞাত থাকে, পরে ঘটনার টানাপোড়নে তাদের পরিচয় উদঘাটিত হয়। বিমলা, মনোবমা, মতিবিবি এই-জাতীয় চবিত্র। আবার **সাময়িকভাবে নায়ক-নায়িকার পরিচয় গোপন তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।** ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি, রূপসী নামে শৈবলিনী, নবীনানন্দ স্বামী নামে শান্তি, দেবী চৌধুরানী নামে প্রফুল্ল, অজ্ঞাত পরিচয়ে সীতারাম, দরিয়ার মোগল শিবিরে নর্তকী-রূপ এই ভাবের পরিচয় বহন করে। স্কটের উপন্যাসেও এই রীতি অনুসৃত। বঙ্কিমচন্দ্র কি স্কটের কাছ থেকে এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন ?

ব্যর্থতাজনিত উন্মত্ততা কয়েকটি চরিত্রে দেখি। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, চন্দ্রশেখবে শৈবলিনী, বাজসিংহে দরিয়া এই-জাতীয় ভূমিকা। বিষবৃক্ষেব হীবাও তাই।

বঙ্কিম-উপন্যাসে **দৈবগণনায় গভীর আস্থা লক্ষণীয়।** মবারক-দরিযাব জীবন-বিচ্ছেদ, বীরেন্দ্রসিংহের করুণ পরিণতি, পশুপতি-মনোবমাব স্বামীস্ত্রীব মিলনে বাধা, সীতারামের আত্মন্ত জীবনে শ্রীব প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে **পরিচারিকা পর্যায়ের কতগুলি চরিত্র** মনোরম। উপন্যাসেব ঘটনাব অগ্রগতিতে এদেব কাবও কাবও পবোক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য কবা যায়। দুর্গেশনন্দিনীতে আশমানী, কপালকুণ্ডলায পেষমন্, মৃণালিনীতে গিরিজাযা, চন্দ্রশেখবে কুলসম, বাজসিংহে দেবী এবং নির্মলকুমারী এই-জাতীয় চবিত্র।

নিশীথরাত্রি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রহস্যময়তার দ্যোতনা দিতে প্রায়ই উপস্থিত। দুর্গেশনন্দিনীব আবম্ভই নিশীথে, কপালকুণ্ডলায় ডাকাতি এবং মতিবিবিব সঙ্গে নবকুমারেব প্রথম সাক্ষাৎ নিশীথে, (কপালকুণ্ডলায় দিনেব কথা বিশেষ কিছু নেই) কাপালিকের সাধনাও নিশীথে। বস্তুত কপালকুণ্ডলায প্রকৃতিব অন্যান্য শক্তিগুলিব সঙ্গে বাত্রিকেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। মৃণালিনীতেও পশুপতির রাত্রিকালে ষড়যন্ত্র, চন্দ্রশেখরে রাত্রিকালে কুলসম-দলনীব গুবগ্ণর্খাব গৃহে গমন এবং পবে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় লাভ, শৈবলিনীব বাত্রিকালে বিহ্বল অবস্থা এবং দুঃস্বপ্ন দেখা, সীতাবামে নিশীথে সীতারামেব দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধ, রাত্রিকালে শ্রীব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব, রাজসিংহে নিশীথে জেবউন্নিসা-মবারকেব সাক্ষাৎকার লক্ষণীয়। এ ছাডা আরও বাত্রিব বর্ণনা আছে। আমরা কয়েকটি মাত্র উদ্ধার করলুম।

অভিরাম স্বামী, চন্দ্রশেখরের গুরু, আনন্দমঠে চিকিৎসক, দেবী চৌধুরানীতে ভবানী পাঠক, সীতারামে ফকির এই-জাতীয় চরিত্র। রাজসিংহে সন্ন্যাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই না। রাজসিংহে সে প্রয়োজনও ছিল না। কেননা রাজসিংহ সংযমী পুরুষ, আদর্শ নায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে **বিরোধ এসেছে প্রধানত নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করে।** নায়ক-চরিত্রের পতনের কারণও প্রধানত এই। ওসমান, নরকুমার, হেমচন্দ্র, প্রতাপ, জীবানন্দ, সীতারাম এর উদাহরণ। আনন্দমঠের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন বাঙালি স্ত্রী অনেক সময়েই উন্নতির সহায়ক হয় না সে কথাই যেন অনেকগুলি উপন্যাসে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপকতা কম। নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় তিনি সূক্ষ্ম দিগ্‌দর্শন করেছেন। কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্রতা তাঁর উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প।[১] একটি কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা অনেক সময়েই সাংসারিক জীব হয়ে উঠতে পারে নি।[২] প্রেম-সর্বস্ব চরিত্রগুলির একটি মাত্র দিকের প্রতিই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেজন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে কাছের মনে হয় না। তারা যে জগতে বাস করে, কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাই তাদের স্পর্শ করতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ত্রুটিবিচ্যুতি একেবারে নেই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু আদিকর্মিদের বিচার ছিদ্রান্বেষণে হয় না, তার সৃষ্টির মনোহারিত্বই আমাদের বিচার্য।

এবারে উপন্যাসগুলির পরিচয় দিই।

দুর্গেশনন্দিনী

১৮৬৩-৬৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় সরকারী কাজ করছিলেন তখন 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। খুলনায় আসবার আগে নেগুয়ায় (মেদিনীপুর) তিনি কিছুদিন ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলটি নানা কারণে ঐতিহাসিকদের কৌতূহল জুগিয়ে আসছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইবণী দুর্গে'র কথা আমরা সকলেই জানি। উড়িষ্যার সঙ্গে এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। যতদূর বুঝতে পারি মেদিনীপুরে থাকার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যায় পাঠানদের ইতিবৃত্ত জানতে পারেন। এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের নানা দুর্গের নানা

১. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড
২. শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।

কিংবদন্তীও নিশ্চয়ই তিনি শুনেছিলেন। খুলনায় এসে মেদিনীপুরের এই স্মৃতিই বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনী বচনা কবতে কতকটা প্রেরণা দিয়েছিল এ অনুমান অসঙ্গত নয়। ইতিপূর্বে *Rajmohan's Wife*, *Indian Field* কাগজে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ বাখেন। বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দুর্গেশনন্দিনী রচনা কবার মূলে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বস্মৃতি বোমন্থন। দুর্গেশনন্দিনী বোমান্স। তখন স্কট বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছেন। শিক্ষিত বাঙালির কাছে যে কয়েকজন বিদেশী লেখক আদবণীয় হযেছিলেন তাব মধ্যে স্কট অন্যতম। বহু-আলোচিত এবং বহু-কথিত দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে স্কটেব 'আইভ্যান হো'ব কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করবার পূর্বে আইভ্যান হো পড়েন নি বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব উক্তিব প্রতিবাদ না কবেও এই কথা বলা যায় যে আইভ্যান হো এবং দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে অনেক। এ সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ বিস্ময়েব উদ্রেক কবে।

আইভ্যান হোব ছাযা দুর্গেশনন্দিনীতে আছে। সদৃশ বিষয়গুলি নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই প্রথমে এই সাদৃশ্যেব কথা স্মবণ কবিযে দেন।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী লেখবাব প্রত্যক্ষ প্রেবণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁরই এক আত্মীযেব নিকটে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী বচনার পশ্চাতে যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য—

'আমাদের খুল্লপিতামহ একশত আট বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।...তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত, উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের কথা।... তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিযাছেন, যদিও ঐ ঘটনা আকবব শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি লোকমুখে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদাদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎ সিং তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়সক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।'[১]

১. বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

চব্বিশ বৎসব বয়সে সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে গ্রন্থ রচনা করলেন প্রকাশমাত্রই তা বাঙালির হৃদয মন লুঠ কবে নিল। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর ইতিহাস মুখ্যত পেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডাব ডাও সাহেবের বচিত ইতিহাস থেকে। সে ইতিহাস তখনকার দিনেব প্রচলিত ইতিহাসেব মতোই। নানা গালগল্প ও কিংবদন্তীব সাহায্যে ডাও সাহেব ইতিবৃত্ত বচনা কবেছিলেন। উপন্যাসেব পক্ষে ইতিহাস খুবই কাজে লেগেছিল। এ ছাড়া সেকালে পবিচিত স্টুয়ার্টেব *History of Bengal* বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রেবণাস্বরূপ হয়েছিল।

ইতিহাসেব সামান্য তথ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার দ্বাবা উপন্যাসের পাত্রে বিস্তৃত করলেন। দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থেব আভ্যন্তবীণ সাক্ষ্যে এ কথা বলতে পাবি বাংলা-দেশেব পুবাকীর্তিব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। **দেশচর্চার সুপরিচিতি বাণীটি এই উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে,** যদিও তা ক্ষীণ। পূর্বে যে অনুমান করেছি তার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রেব নিম্নোক্ত মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। গড মান্দাবণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'গড মান্দারণে কযেকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড মান্দাবণ হইযা থাকিবে। নগরমধ্যে দামোদর নদী প্রবাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইযাছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইযাছিল, তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড ছিল. এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায নদীব বক্রগতি আরম্ভ হইযাছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিযা বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশির: পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তবনির্মিত. দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন, দুর্গেব নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে. অট্টালিকা কালের স্পর্শে ধূলিরাশি হইযা গিযাছে।'১

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে এ কথা বুঝতে পাবি যে গড মান্দাবণেব প্রত্যক্ষ অথবা পবোক্ষ বিবরণ তিনি সংগ্রহ কবেছিলেন। আব একটু খেদ অথবা আক্ষেপও ধ্বনিত হয়েছে। এই আক্ষেপটুকু মূল্যবান্। অতীতেব প্রতি আমাদেব যে আগ্রহ থাকে এবং মৃত অতীতকে জানবাব জন্যে যে অদম্য কৌতূহল জাগ্রত হয় তাই থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়।

'মান্দারণ এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল।'২

এই সৌষ্ঠবশালী নগব এবং তার অধিকাবীকে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে স্পষ্ট করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'অট্টালিকা কালেব কবাল স্পর্শে ধূলিবাশি হইযা গিয়াছে'

১. দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
২. প্রথম সংস্করণে এই অংশ ছিল না। কিন্তু এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

—বলা বাহুল্য, কালের করাল স্পর্শ থেকে ধূলিরাশির মূক বেদনাকে বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে বাঙ্ময় করেছেন। এইখানেই বঙ্কিমের কল্পনাপ্রবণতার মূল্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের কথা অবতারণা করেছেন। তা স্টুয়ার্টের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ মাত্র। কেবল জগৎসিংহকে সেনাপতিত্বে বরণ (৪র্থ পরিচ্ছেদ, নবীন সেনাপতি) অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। জগৎসিংহ এই গ্রন্থের নায়ক। সুতরাং সমবোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই তাকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে বীর সৈনিকরূপে চিত্রিত করেছেন। অসহায় স্ত্রীলোককে নিরাপদে রাখবার জন্যে **ইংলণ্ডের নাইটরা যে ভাবে** খ্রীষ্টানদের আশ্রয় দান করতেন এখানেও সেই রূপই পাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদটি রোমান্সের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মানসিংহের পুত্র রাজপুত জাতির নানা গুণে ভূষিত হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। সমস্ত মোগল সেনাপতিরা যখন পঞ্চদশসহস্র কিংবা দশসহস্র সেনার কমে বাংলা দেশে পাঠান আক্রমণে অগ্রসর হতে চায় নি তখন **জগৎসিংহ মাত্র পঞ্চসহস্র সেনা নিয়ে অভিযানে অগ্রসর হলেন**। রাজপুত বীরের এই গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত টডের রাজস্থান থেকে পেয়েছিলেন। টড বহু রাজপুত বীরের বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে প্রয়োজনীয় এই অংশটি রচনা করতে বীরপ্রসবিনী রাজস্থানের কথা স্মরণ করেছেন।

পাঠানদের মধ্যে ওসমান এবং কতলু খাঁই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওসমান বিমলার বিপদে সাহায্য করেছিল। সে সাহায্যের কারণ বুঝতে পারি। মাহরু (বিমলা) ওসমানকে একবার দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। **উপকারীর প্রতি ওসমানের কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক**। নিজের প্রাণকে পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত করে সে বিমলার কর্তব্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু জগৎসিংহকে সে আশ্রয় দিয়েছিল কেন? আয়েষার প্রতি প্রেমই এই কাজের জন্যে দায়ী এমন মনে করি না। বস্তুত ওসমান একজন বীর সৈনিক। তার এই আচরণের সঙ্গত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। শত্রুকে আতিথ্যদান করা ওসমানের চরিত্রে মহত্ত্ব এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু বিজেতার বিজিতের প্রতি এই আচরণ উপন্যাসের দিক থেকে কতটা কার্যকারণসম্মত, বঙ্কিমচন্দ্র তার জবাব দেন নি। মনে হয় পাঠানজাতির যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন তাই বঙ্কিমকে ওসমানচরিত্র এইভাবে পরিকল্পিত করতে সাহায্য করেছিল। যেজন্যে পাঠানের পক্ষে এ-জাতীয় আচরণ স্বাভাবিক এ কথা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা সবিস্তারে বলেন নি। পাঠান জাতি সম্বন্ধে সেকালে যে তথ্য

বঙ্কিমের জানা ছিল তা উদ্ধার করছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে 'আফ্‌গান বা পাঠান জাতি' প্রবন্ধে এই তথ্যগুলি আছে,

'পাঠানদিগের প্রধান ধর্ম অতিথিসপর্যা; তৎসাধনে তাহারা সর্বদা অনুরক্ত থাকে, সম্ভ্রম অনিষ্ট ঘটিলেও কোনক্রমে তৎকর্মে বিরত হয় না।...তাহাদিগেরও প্রধান পৌরুষ অতিথিসেবা।'১

জগৎসিংহ কত্‌লু খাঁর অতিথি। আয়েষা এবং ওসমানের আহত জগৎসিংহের প্রতি আচরণ তাদের জাতির ঐতিহ্য অনুযায়ীই হয়েছে বলে মনে করি। পাঠান জাতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীনতাস্পৃহার কথা বলেছেন তাও ইতিহাস-সম্মত। বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে—

'পরন্তু ইহারা স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর নহে, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগ এতজ্জাতীয়দিগের প্রধান ধর্ম।'২

পাঠানজাতির স্বাধীনতাস্পৃহা যেমন ছিল তেমনি তাদের চরিত্রের আর-একটি বিশেষত্বের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়।—

'আমরা সকলেই তুল্য এবং তুল্যতা রক্ষার্থে সর্বদা কলহ, ও শত্রুভয় ও পরস্পর রক্তমোক্ষণ করিয়াও সুতৃপ্ত আছি, কিন্তু কদাপি পরাধীনতা সহ্য করিতে পারি না। অপিতু পরাধীনতার শৃঙ্খল পুষ্পহারের তুল্য লঘু হইলেও কি তাহা ভদ্রলোকের গ্রাহ্য?'৩

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের স্বাধীনতার স্পৃহার কথা যেমন বলেছেন তেমনি এই কলহপ্রবণতাকে প্রকারান্তরে নিন্দা করেছেন। ওসমান জগৎসিংহের কাছে যে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল তা নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত পাঠান জাতির 'রক্ত মোক্ষণে সুতৃপ্ত মনোভাব'টি বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানের চরিত্রে আরোপ করেন নি। তাতে করে চরিত্রটির মহত্ত্ব বেড়েছে। দ্বিতীয় আর একটি কারণ উল্লেখ করতে পারি এবং সেইটিই মুখ্য। ওসমান জগৎসিংহকে বলেছে—

'ইতিপূর্বেও ত আক্‌বর সাহা উৎকল জয় করিয়াছেন, কিন্তু কত দিন তাঁথাকার করগ্রাহী ছিলেন? এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন, আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না, একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না, ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি?'৪

বঙ্কিমচন্দ্র আত্মকলহে ভারতবাসীর জীর্ণ ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখেছিলেন। কলহে দিনের পর দিন ভারতবর্ষের সুখশান্তি অন্তর্হিত হচ্ছিল। হিন্দু আমলেরও সেই ইতিহাস। রাজপুত জাতির জীবনসন্ধ্যার কারণও তাই। সুতরাং ওসমান

১. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২ পর্ব শকাব্দ ১৭৭৫, ১৮ খণ্ড

২. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৭৭৪ বৈশাখ, ৮ম সংখ্যা

৩. ঐ

৪. দুর্গেশনন্দিনী, ২য় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ

জয়সিংহের কাছে যে প্রস্তাব করেছিল তাতে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিচক্ষণতার অপরূপ চিত্র পাই। পাঠান এবং মোগল দ্বন্দ্বে সাধারণ প্রজাসাধারণের বিনষ্টি, দেশের ক্ষতি। অতএব পরস্পরের সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতবর্ষের যথার্থ শুভ। বিবাদ বিসম্বাদ যে জাতিকে অধঃপতিত করে তা মৃণালিনীতে সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতেই এই মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্যটিকে প্রকাশ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে কেবল পাঠান রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের চিত্র আঁকেন নি, প্রসঙ্গত বাঙালির বাহুবল প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির হীনমন্যতায়, নিশ্চেষ্টতায় মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন। তারই ফলে গড় মান্দারণের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করলেন। দুর্গস্বামীর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেন বীরেন্দ্রসিংহ।

'পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে' ওসমানের এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের। একালের বাঙালিকে বঙ্কিম সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন। আবার অন্য দিকে বাঙালিও একদা যে সাহস শক্তির অধিকারী ছিল সে-বস্তুও বীরেন্দ্রসিংহ চরিত্রে সুস্পষ্ট। অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষ নিতে বলেছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মানসিংহ সম্বন্ধে বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা প্রসন্ন ছিলেন না। একমাত্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর কমলাদেবী উপন্যাসে মানসিংহের প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে বীরেন্দ্রসিংহের জবানিতে সে কথা বলেছেন। মানসিংহ আকবরের দাস। সুতরাং যে রাজপুত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করে তাকে বীরেন্দ্রসিংহ সমর্থন করতে পারেন নি। তবে সূক্ষ্ম বিচারে মানসিংহের প্রতি বীরেন্দ্রের আচরণের একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা যেতে পারে। বীরেন্দ্র এবং বিমলা যখন মানসিংহের অন্তঃপুরে আলাপে ব্যস্ত তখন মানসিংহই সেখানে বাধাস্বরূপ হয়েছিলেন। অবশ্য মানসিংহ এমন কোনো অসঙ্গত আচরণ করেন নি যার দ্বারা বীরেন্দ্র ক্রোধান্বিত হতে পারেন। তথাপি বীরেন্দ্রের মতবাদের সঙ্গে মানসিংহের মতবাদের পার্থক্য ছিল। কত্‌লু খাঁর নির্মম বিচারে বীরেন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড হল। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যটি অঙ্কন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার অসাধারণ বিকাশ দেখিয়েছেন। এক দিকে বীরেন্দ্রের মৃত্যুভয়হীন সাহসিকতা অন্য দিকে যবনস্পৃষ্ট কন্যার মুখদর্শন না করার সংকল্প তাঁকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দান করেছে। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যটি মহৎ গৌরবে ভূষিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই মৃত্যু দেশের, জাতির ও ধর্মের জন্যে মৃত্যু। দুর্গস্বামীর আত্মশ্লাঘা-বোধ এবং বংশগৌরব-সচেতনতা স্কটের উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিমলার আবির্ভাবটি চকিত এবং চমকপ্রদ। তার প্রত্যুৎপন্নমতি, দুঃসাহসিকতা এবং আলিবাবা গল্পের মর্জিনাসুলভ আচরণ গল্পখোর পাঠকের তৃপ্তিবিধান করেছে।

জগৎসিংহ যে-ভাবে পাঠান-শিবিরে বন্দী হয়েছিলেন তাও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার মৌলিকতার দাবি রাখে। স্টুয়ার্ট লিখেছেন, পাঠানরা জগৎসিংহকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বন্দী করে (Surprised his camp, took him prisoner)। বঙ্কিমচন্দ্র আকস্মিকতার ব্যাপারটি রেখেছেন, কিন্তু বিমলার অনবধানতার সুযোগটি উপন্যাসে বিস্তৃত করে ইতিহাসের পঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এক দিকে জগৎসিংহের প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ অন্য দিকে বিমলার ত্রস্ত মনোভাব এই দুইই জগৎসিংহের বিপদ ডেকে এনেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যকে অবিকৃত রেখেও বঙ্কিমচন্দ্র গল্পরসের জোগান দিতে পেরেছিলেন। **দুর্গেশনন্দিনীতে চরিত্রকল্পনা রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত।** ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যে রোমান্স-রস পরিবেশন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন-কি 'সফল স্বপ্নে'র আরম্ভটিও দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম পরিচ্ছেদে কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। রোশিনারার প্রভাব রয়েছে আয়েষা চরিত্রে। জগৎসিংহ শিবজীর অনুরূপ। রামদাস স্বামী অভিরাম স্বামীর রূপ নিয়েছে। রামদাস স্বামী নিছক সন্ন্যাসী পুরুষ। অভিরাম স্বামীর শশিশেখর ভট্টচার্য রূপটিতে মানবিকতার স্পর্শ রয়েছে। রোশিনারার প্রেম ব্যর্থ, আয়েষার প্রেমও ব্যর্থ।

তিলোত্তমা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। গ্রন্থে তার আবির্ভাব কয়েকবার মাত্র। প্রায় প্রত্যেক বারই তাকে ভীতচকিত অসহায় রূপেই দেখি। নবনারীর সহানুভূতিকে সে এক মুহূর্তেই জয় করে নেয়। তিলোত্তমা চরিত্রের সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়েছেন তার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে। তিলোত্তমার জন্যেই জগৎসিংহের বিপদ এসেছিল। বাল্যকালে মাতৃহারা, পিতার স্নেহ থেকে বহুকাল বঞ্চিত। এই নারীর অপার্থিব সৌন্দর্য আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আয়েষাও রোমান্সরাজ্যের। কিন্তু সে একটু প্রগল্‌ভা। আর একটু তৎপর। আয়েষার রূপ ইউরোপীয় উপন্যাসের নারীচরিত্রের অনুরূপ। বিবিধার্থ সংগ্রহে আফ্‌গান রমণীদের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উক্ত প্রবন্ধে আছে পাঠান নারীর স্বাধীন এবং গোপন প্রণয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। পাঠান নারীসমাজ সম্বন্ধে

উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও আছে সেই প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা মনে রেখেছিলেন। কিন্তু আয়েষার মধ্যে পাঠান বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নারীব চিবন্তন আদর্শই প্রবল হয়েছে। বাঙালি চরিত্রবৈশিষ্ট্যও সে একেবারে বর্জন করে নি। এতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ ব্যাপার চলে এসেছে অনেক কাল। পাঠক আয়েষাকে দেশজ করে পেয়েছিল বলেই দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

জগৎসিংহ এবং ওসমানের ভূমিকায় নাইটদের অনুস্মৃতি আছে। জগৎসিংহ এবং ওসমানেব দ্বৈতযুদ্ধে, প্রেমের বর্ণনায়, নারীর পবিত্রতা বক্ষায় এবং সাহসিকতায় এই দুটি চবিত্র পাশ্চাত্য উপন্যাসেব চরিত্রগুলির সমতুল্য। জগৎসিংহ একবগুা। তার ভূমিকাও কাহিনীব দিক থেকে সঙ্কুচিত, তথাপি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, জগৎসিংহ চরিত্রে বঙ্কিম যে গুণগুলি আবোপ করেছেন সেগুলি তাঁব ইতিহাস পড়ে পাওয়া। আব এ কথা ভুললে চলবে না যে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রথম বাংলা উপন্যাস। সুতরাং প্রথম রচনার উচ্ছ্বাস এতে আছে। দুর্গেশনন্দিনী দোষত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু এই উপন্যাসেই বঙ্কিমেব প্রতিভার স্বাক্ষব আছে। বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসগুলিব অপরূপ চবিত্রচিত্রণেব আভাস পাই এই উপন্যাসে। তিলোত্তমা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগৎসিংহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। তাব ব্যাকুলতা এবং প্রেমের তীব্রতা সহজেই অনুমেয। কিন্তু দুর্বল ঔপন্যাসিকেব হাতে পড়লে এই দৃশ্যটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পাঠকেব দ্বিধাকম্পিত মনোভাবকে বঙ্কিম তীব্রভাবে আঘাত কবেছেন, জগৎসিংহ কর্তৃক তিলোত্তমার অবমাননার দ্বাবা। কিন্তু এইটিই স্বাভাবিক। জগৎসিংহ চবিত্রেব দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে এই দৃশ্যটিতে। তিলোত্তমাব চবিত্রেও কোনো কলঙ্ক স্পর্শ কবে নি। বাজপুত জাতিব চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই দৃশ্যে প্রকাশিত। জগৎসিংহেব চবিত্রে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র ঘাতপ্রতিঘাতময় চবিত্র আঁকতেও চান নি। কিন্তু জগৎসিংহ চবিত্র পববর্তীকালে অনেক ঔপন্যাসিককে মুগ্ধ কবেছিল। **ঐতিহাসিক উপন্যাসের type চরিত্রের সূত্র জগৎসিংহ ভূমিকায়।**

জগৎসিংহের মতো ওসমান চরিত্রটি নির্দ্বন্দ্ব নয়। ওসমান পাঠান, প্রেমের ঈর্ষাকুটিল মনোভাব তাব মধ্যে দেখা যায়। আয়েষাব কাছে প্রেম নিবেদন কবে এবং আয়েষা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও আয়েষাব জগৎসিংহেব প্রতি প্রেম নিবেদন ওসমানকে উদ্‌বেজিত করেছিল। ওসমানেব আচবণের মধ্যে মানবোচিত ভূমিকা সুস্পষ্ট। ওসমান চরিত্রটি বঙ্কিম সশ্রদ্ধ সহানুভূতি

দিয়ে অঙ্কন করেছেন। জগৎসিংহ এবং ওসমানের সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিতে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে। মানসিংহের পুত্র প্রধান সেনাপতি, সে যথার্থ বীর। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে বলেছেন পাঠানকুলতিলক। জগৎসিংহ নবীন যুবক, বাহুবলই তার ঐশ্বর্যের চূড়া। ওসমান বীর এবং সাহসী তদুপরি অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ়। প্রকৃত সেনাপতির মধ্যে যে ধীরতা লক্ষিত হয় ওসমানের সংলাপে তাই পাই। লেখক দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ওসমানের সেই ধীর বিচারশক্তির নিদর্শন দিয়েছেন। ওসমান মোরাবকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে **যে প্রেমের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন তা বাস্তব-অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়।** এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেছেন স্কট 'Fatherly way'তে প্রেমচিত্র অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমের প্রেমদৃশ্য বর্ণনায়ও এই অভিভাবকোচিত মনোভাবের পরিচয় পাই।

বিমলা বঙ্কিমের অভিনব সৃষ্টি। বিমলাকে প্রচলিত কোনো সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না। তিলোত্তমা এবং জগৎসিংহের বিবাহের প্রস্তাবে সে যে দুঃসাহসিক মন্তব্য[১] করেছিল তা তার চরিত্রের অনুযায়ী। অভিরাম স্বামী বিমলাকে পাপীয়সী বলে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু বিমলা স্বাধীন প্রেমের জয়ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। বিমলা যে দুঃসাহসিক কাজ করেছে তার মধ্যে রোমান্সের কৌতূহল, আকস্মিকতা এবং রহস্য প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে। স্বামীহত্যার প্রতিশোধ সে যে-ভাবে নিয়েছে তাতে করে সাময়িকভাবে তার উন্মাদিনী রূপকে পাঠক সমর্থন করে। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার চরিত্রের গৌরব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয়বার বিমলার শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে। বিমলা প্রথমেই জগৎসিংহকে অভিবাদন করলে না। শৈলেশ্বরের বিগ্রহকে প্রণাম করে জগৎসিংহকে অভিবাদন করলে। বিমলা চরিত্রের এই আভিজাত্য আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ চলে গেলে নির্জন প্রান্তরে বিমলার আশঙ্কা স্ত্রীজনসুলভ। প্রগল্‌ভা সাহসিকা বিমলার এই দুর্বলতা তার মানুষী রূপটিকে চিনিয়ে দেয়। অন্যান্য বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিমলার প্রভাব গুরুতর।

দ্বিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার স্বপ্নবৃত্তান্তটি লক্ষণীয়।

১. দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নবৃত্তান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করবার একটা কৌশল হিসেবে স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। দুর্গেশনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত তিলোত্তমার স্বপ্ন দেখার পরে বলা। এই উপস্থাপন কৌশলটি অনেক সমালোচকের প্রশংসা পেয়েছে।[১] **দুর্গেশনন্দিনীর সূচনা রোমাণ্টিক।** ঝড, নৈশ অন্ধকার, পথেব দুর্গমতা, অপরিচিত স্থানেব ভীতি, নির্জনতা সব মিলে রহস্য এবং কৌতূহলের সৃষ্টি করে। সূচনা অংশটির কাব্যসৌন্দর্য বাঙালিব হৃদয় জয় কবেছিল। একজন অশ্বাবোহীব এই বকম নির্জন প্রান্তবে যাত্রাব দৃশ্য বঙ্কিম-পববর্তী যুগে অনেক ঔপন্যাসিক বর্ণনা কবেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বহস্যঘনিমা চিত্রিত করতে এই উপায়টি ঔপন্যাসিকদেব খুবই প্রিয় ছিল। নায়িকার রূপবর্ণনায়, অপার্থিব সৌন্দর্যের অবতাবণায়, বীরোচিত কার্যাবলীতে, দুর্গেব বর্ণনায়, বিমলাব দুঃসাহসিকতায়, ওসমান জগৎসিংহেব দ্বৈতযুদ্ধে, তিলোত্তমার নিশীথে পাঠান শিবিবে জগৎসিংহেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব দৃশ্যে বোমান্সের বস উচ্ছ্বসিত হযে উঠেছে।

বিমলাব পবিচয় বঙ্কিমচন্দ্র সূচনাতে উদ্‌ঘাটন কবেন নি। বলা বাহুল্য, গল্পবসের দিক থেকে এইটিব উপযোগিতা। বিমলাব সম্বন্ধে পাঠকেব কৌতূহল বাড়তে থাকে। সে কৌতূহল যখন তীব্র হতে তীব্রতব হযে ওঠে তখনই অকস্মাৎ কোনো একটি চবম মুহূর্তে লেখক পাঠকেব প্রত্যাশাকে তৃপ্ত কবেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাস রচনা কববাব এই কৌশলটিও সকলেই গ্রহণ কবেছিলেন। নায়ক-নায়িকাব পবিচযকে অজ্ঞাত বেখে গল্পবসেব জোগান দেওয়াব বীতি আমাদেব ঔপন্যাসিকদেব আব-একটি সুলভ এবং পবিচিত কৌশল ছিল।

জ্যোতিষগণনা সম্বন্ধে বঙ্কিমেব বিশ্বাস ছিল অপবিসীম। **এই জ্যোতিষ-গণনাকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন।** এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসেব একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যেব সূত্রপাত। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, বীবেন্দ্রসিংহ ইত্যাদি ধবা পড়েছিল মোগল সেনাব হাতেই। যে মোগল সেনাব হাত থেকে বক্ষা পাবাব জন্য অভিবাম স্বামী বীবেন্দ্রকে মোগলেব পক্ষ অবলম্বন কবতে বলেছিলেন সেই মোগলই তাদেব বন্দী কবল। এই জ্যোতিষগণনাই পববর্তী বচনায় কত সূক্ষ্মভাবে এবং কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার কবেছেন তাব প্রমাণ সীতাবাম উপন্যাস। শ্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবে। সেজন্যে সে সীতারামকে ছেড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাব ভ্রাতা

১. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

গঙ্গারামের প্রাণসংহার করেছিল। ট্রাজেডির পরিণতিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জ্যোতিষগণনার এই ব্যবহার বঙ্কিম-উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এবং আশমানির চিত্র হাস্যরস জোগান দেবার জন্যে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেন নি। অন্তত দুর্গেশনন্দিনীতে রবীন্দ্রনাথ-কথিত নির্মল বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সে কথা জানতেন। সেজন্যে পরবর্তী সংস্করণে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশগুলি বর্জন করেছিলেন।

বঙ্কিমের জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীর তেরোটি সংস্করণ বার হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ সৌভাগ্য সে যুগে খুব কম ঔপন্যাসিকের ভাগ্যেই জুটেছে। ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের এই উপন্যাসই বাংলা রোমান্সের দ্বার খুলে দিল। এই উপন্যাসটিরই অনুকরণ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি।

কপালকুণ্ডলা

দুর্গেশনন্দিনী বার হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই হয়েছিল। তবে এটা বোঝা গেল বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে রোমান্স সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় ইতিহাসের বর্ণাঢ্য চিত্রগুলি আরও উজ্জ্বল, আরও চমকপ্রদ।

উপন্যাসটি বার হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম সংস্করণ থেকে পরে একটি পরিচ্ছেদ (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে) পরিত্যক্ত হয়। কপাল-কুণ্ডলার পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদটি উপন্যাসটির ব্যাখ্যামূলক অংশ। কপালকুণ্ডলা লেখবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের নাটক বেশি পড়তেন। কপালকুণ্ডলায় তার ছায়াপাত। কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় মিরাণ্ডার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। মিরাণ্ডা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাই শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা প্রবন্ধে।[১] শকুন্তলার আরণ্যক জীবনের সরল সৌন্দর্য কপালকুণ্ডলায় সঞ্চারিত। কপালকুণ্ডলার গঠনশিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের কাছেই বেশি ঋণী। **কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের সন্দেহ ওথেলোর ঈর্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।** ব্র্যাবেনশিওর অভিশাপ নিয়েই ওথেলো জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে কাপালিকের ক্রোধকে অদৃশ্য রেখেছেন

কিন্তু পটভূমি হিসেবে এর অলক্ষ্য প্রভাব দেখা যায়। **ইয়াগো ওথেলোর মনে ক্যাশিও এবং দেসদিমোনার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়েছিল।** ওথেলোব ঈর্ষা তারই ফল। **কাপালিক নবকুমারকে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথা বলার দৃশ্য দর্শন করালেন।** নবকুমারের সংশয়েব ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলার সংযত উত্তর দেসদিমোনার মৃত্যুকালীন উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং উপন্যাসটির পটভূমি এবং ভাবকল্পনার উৎসে আছে টেম্পেস্ট এবং শকুন্তলা। কিন্তু গঠনশিল্পে বেশি প্রভাব দেখি ওথেলো নাটকের। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন কবেছেন যাব ফলে এই প্রভাব জোবডা হয়ে লেগে থাকে নি।

কপালকুণ্ডলা বচনার মূলে আরও কিছু প্রেবণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াতে থাকবাব সময় এক কাপালিকেব সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়েরা বলেছেন এই কাপালিকেব প্রত্যক্ষ প্রভাব কপালকুণ্ডলার কাপালিক ভূমিকায় আছে।[১] কাপালিক কর্তৃক যদি কোনোও স্ত্রীলোক ষোলো বৎসব সমাজেব বাইরে বনমধ্যে প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হয়ে সমাজেব সংস্পর্শে আসে তবে তাব বন্যপ্রকৃতিব পরিবর্তন সম্ভব কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নটি নিয়ে ভেবেছেন এবং অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের এবং নাট্যকাব দীনবন্ধুব কাছে এর সদুত্তরও প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁদের উত্তব বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি।[২] মতিবিবির কাহিনীও বঙ্কিমচন্দ্রেব খুল্লপিতামহেব মুখে শোনা কোন গৃহস্থেব কুলত্যাগিনী বধূব ছাযায পরিকল্পিত।[৩] হুগলি কলেজে পডাব সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র একদিন নিবিড কুয়াশার মধ্যে পডেছিলেন এবং মাঝিদের দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল। তাই যেন প্রকারান্তবে কপালকুণ্ডলাব সূচনায় দেখা দিযেছে।[৪]

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেব ঐতিহাসিক ঘটনাকাল আকবরেব বাজ্যাবসানেব ও জাহাঙ্গীবেব সিংহাসনাবোহণেব সময়। এই সময়কাব বাংলাদেশেব ঐতিহাসিক পটভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র যা দিযেছেন তা মোটামুটি তথ্যনিষ্ঠ। কপাল-কুণ্ডলা উপন্যাসেব একটা লক্ষণীয় দিক আছে। সেইটি হচ্ছে দস্যুদেব অত্যাচাবেব সংবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবিকে দস্যুহস্তে ফেলেছেন, কপালকুণ্ডলা খ্রীষ্টিয়ান দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়ে পরিত্যক্তা। এমন কি মতিবিবি বিবাহের পব পাঠান

১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বঙ্কিম জীবনী

২. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

৩. ঐ

৪. ঐ

কর্তৃক বন্দী। কাহিনীটির আরম্ভ হচ্ছে পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার-কাহিনী দিয়ে। দস্যুদের এই অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনীগুলি কপালকুণ্ডলায় একটা ভীতিবিহ্বল পবিবেশের সৃষ্টি করে। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সৌন্দর্য-বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ বলেছেন যে এব সৌন্দর্য ভীমকান্ত রূপের সঙ্গে তুলনীয়। এক দিকে কাপালিকের ভয়ংকর মূর্তি অন্য দিকে কপালকুণ্ডলাব অপার্থিব সৌন্দর্য, এক দিকে সমুদ্রেব অতলস্পর্শ গভীরতা অন্য দিকে তরঙ্গের গর্জন এই উভয় রূপই পাঠককে মুগ্ধ কবে। আমাদের মনে হয় দস্যুদলের উপদ্রবের সূচনা কবে বাঙ্কমচন্দ্র প্রথমেই পাঠককে ক্রূর অদৃষ্টেব অতর্কিত আঘাতের জন্যে প্রস্তুত কবে তুলেছেন।

কপালকুণ্ডলাব ঐতিহাসিক অংশ তুলনায় বিস্তৃত বটে কিন্তু তা উপন্যাসে প্রাধান্য পায় নি। কপালকুণ্ডলা ঐতিহাসিক উপাখ্যানও নয়। মূল ঐতিহাসিক অংশের বিচারেব আগে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তগ্রামেব যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কথা বলি। সপ্তগ্রামেব প্রাচীন গৌবব তখন লুপ্তপ্রায়। সেখানকাব অধিবাসী-দেরও সেই অবস্থা। সপ্তগ্রামে নবকুমাবেব বাসস্থান নির্বাচন কবে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের মোহময় রূপটিকে যেমন স্পষ্ট কবেছেন তেমনি একটা অতৃপ্তিজনিত খেদও ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। নবকুমাবেব সুকুমার চবিত্রেব-যে মহত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র সূচনায় বলেছেন তাব প্রতি পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পবেব জন্য কাষ্ঠ আহবণ কবা যে চরিত্রেব সহজাত বৈশিষ্ট্য তাব প্রতি আমাদের সম-বেদনা স্বাভাবিক। কিন্তু নবকুমাবের দৃষ্টি আবিল হযেছিল। সে গৌবব শেষ পর্যন্ত সে হারিয়েছিল। উপন্যাসে নবকুমাবের এই পবিবর্তনে বিষণ্ণতা বিস্তৃত হয়েছে। পবিবেশেব সঙ্গে চবিত্রটিব অন্তবঙ্গ যোগ এইখানে।[১] সপ্তগ্রামের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা স্টুয়ার্ট রেনেলের বই থেকে *History of Bengal*-এ যেটুকু উদ্ধাব কবেছেন তা থেকেই নেওযা। অংশটি উদ্ধাব কবছি—

'Saatgong or Sattagong now an inconsiderable village, on a small creek of the Hoogly river, about four miles to the northwest of Hoogly, was, in 1556, and probably the European merchants had their factories At that time Saatgong river was capable of bearing small vessels, and I suspect that its then course, after passing Saatgong, was by way of Adaumpore, Omptah and Tamlook.'

---

১. কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইযা পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের এক নির্জন উপনাগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন 'এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত', তাও স্টুয়ার্ট ২৭১ পৃষ্ঠার পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন।

(কপালকুণ্ডলার ঐতিহাসিক অংশের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেকখানি স্থান নিয়েছেন।) এমন-কি গ্রন্থের বেশির ভাগ পরিচ্ছেদ মতিবিবির কাহিনীতে পূর্ণ। এতটা স্থান জুড়ে থাকা সত্ত্বেও মতিবিবির কাহিনী কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রধান কথা নয়। তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক বিবরণ কি কারণে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কপালকুণ্ডলার কাহিনী স্বল্পপরিসর। কপালকুণ্ডলার জীবনের যে অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র বেছে নিয়েছেন, তাতে পটভূমির বিস্তার আশা করা যায় না। কাহিনীকে বিস্তৃত করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি যোজনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত নরনারীর সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রবাহে ইতিহাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ে কি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটায় কপালকুণ্ডলায় তাও স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের নিয়তি নির্ধারণে বাইরের পরিবেশ অনেকখানি দায়ী হয়। ইতিহাস সেরকম একটি বাইরের বস্তু এই উপন্যাসে। যে মতিবিবিকে নবকুমার বিস্মৃত হয়েছিল ইতিহাসের ঘটনাবর্ত সেই মতিবিবিকেই নবকুমারের সান্নিধ্যে এনে দিলে। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার পরিণতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করি।

'অদৃষ্টের তাৎপর্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অনিবার্য ফল, মনুষ্যচরিত্র অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য ফল, মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।'[১]

উক্ত মানসিক ফলগুলির কথা মোটামুটি বুঝতে পারি। উপন্যাসটিতে ইতিহাস হচ্ছে ভৌতিক নিয়ম। বঙ্কিমচন্দ্র J. S. Mill-এরও একটি অংশ তুলেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র ঐ মিলের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে।[২]

'Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Oedipus holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our

১. কপালকুণ্ডলা, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে। (প্রথম সংস্করণ) পরিত্যক্ত
২. ঐ

wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us of our individual character.'

মিল কথিত joint influence ইতিকথা অবতারণার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। 'কখন কখন যে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্যসকল এরূপ দুর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক কবি তাহার নিবাবণে অসমর্থ হয়'। পদ্মাবতীর অতর্কিত আবির্ভাব কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলতে সহায়তা কবেছিল।

কিন্তু কপালকুণ্ডলার ইতিকথাব অন্য একটি সার্থকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার নৈপুণ্য তাতেই বেশি প্রকাশ পেযেছে। দুর্গেশনন্দিনীব ইতিহাস বাইরেব প্রতিনিধিস্বরূপ (Agent)। কিন্তু কপালকুণ্ডলায় ট্রাজেডিকে আবও গভীব, আরও সুদূরপ্রসাবী, এক কথায় গৌবব সমুন্নত করাব জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কপালকুণ্ডলাব চরিত্রের মাধুর্য কেবলমাত্র তার অসামান্য রূপবৈভবের মধ্যে নেই। তাব আচার-আচরণে এমনই একটা শক্তি ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে যা মানবিক নয়। একটি ক্ষুদ্র প্রাণের জন্য কাপালিকেব ঈর্ষা এবং মতিবিবির চক্রান্তকে প্রথম দৃষ্টিতে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডির জন্যে ইতিহাসের কোলাহলকে সপ্তগ্রামেব জনবিরলতায় এনেছেন এই কাবণে যে কপাল কুণ্ডলার অন্তরঙ্গ ধৈর্য এবং দৃঢ়তা মনুষ্যসম্ভব নয়, এইটে দেখবার জন্যে। মতিবিবি জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নূরজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী, দিল্লীর ওমরাহবৃন্দ তার বশে। সেও শেষ পর্যন্ত সে ঐশ্বর্যসুখ পরিত্যাগ করে কপালকুণ্ডলার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ঐশ্বর্য যার করায়ত্ত, মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত সামগ্রী যখন তার কাছে, তখন সে স্বামীর সন্ধানে সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ঘটনা যদি কেবলমাত্র কোনো গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর ঈর্ষা হত তা হলে কপালকুণ্ডলার মহত্ত্ব পেতাম কি ? সকলের অগোচরে যে শক্তির অধিকারী করে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার তিলোত্তমা মূর্তি গড়ে তুলেছেন তার পরিণাম-রমণীয়তা দেখাতে গেলে রাজকীয় সমারোহের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

'রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে, তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না, কেহ মেঘ মনে করে না শেষে অকস্মাৎ একেবারে

পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এতদিন তিল তিল করিয়া তাহার বাষ্পিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।'১

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার গৌরবোজ্জ্বল রূপকে এভাবে মেঘাবৃত করতে চেয়েছেন। নানাস্থান থেকে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছিল। সুদূর দিল্লীর অন্দর-মহলও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলার ক্ষুদ্র প্রান্তকে ব্যাপকতর ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপবে স্থাপিত করেছেন। রোমান্সের রহস্যমহিমার মধ্যে যে দুরবগাহ অতলস্পর্শ থাকে কপালকুণ্ডলায় তাই ব্যঞ্জিত। কপালকুণ্ডলায় নূবজাহানেব যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা কল্পনাপ্রসূত হলেও ইতিহাসেব সত্যকে লঙ্ঘন করে নি। বরং ইতিহাসের সম্ভাবনাকে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বিস্তৃত কবেছেন। মতিবিবি এবং নূরজাহানের সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা নিপুণ। সেলিমের প্রতি মেহেরুন্নিসাব আসক্তি থাকলেও স্বামীকে পবিত্যাগ করতে সে বাজী হয নি। অবিশ্বাসিনী নারীর পরিণাম ভয়াবহ এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসে সুন্দবভাবে পবিস্ফুট হয়েছে। কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি তাদেব নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট ছিল না। এই অসন্তোষই উপন্যাসে ঘটনার জটিল জাল বচনা কবেছে। এমন-কি শ্যামাসুন্দরীর কৌতূহল উপযুক্ত সময়ে সংযমিত হতে পাবে নি। গ্রন্থমধ্যে একমাত্র নূরজাহানই স্থিরবুদ্ধির পবিচয় দিয়েছিল। সেদিক থেকে এই নারী পরবর্তীকালে যে বিচক্ষণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পবিচয দিযেছিল তাব ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দিয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার বিচাব এইখানেই শেষ কবি।

মৃণালিনী

দুর্গেশনন্দিনী লেখার পরে বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন নি। সেজন্যে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করার পরও কিছুকাল ফেলে রেখেছিলেন। মধুসূদনের মতো তিনিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যাকরণশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা দুর্গেশনন্দিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। উৎসাহিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী ছাপান। প্রথম রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও উপন্যাসটি সাদরে বাঙালি পাঠকসমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের ভূমিকা একেবারেই

১. কপালকুণ্ডলা, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে, প্রথম সংস্করণ, পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত

গৌণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজি উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত। সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

'প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভেন্‌হো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন পড়িতাম।'[১]

মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে (পরে পরিত্যক্ত) স্কটের ব্রাইড অফ লেমরমুরের ঋণ বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক **দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের যে-কথা অস্ফুটভাবে ঘোষণা করেছিলেন মৃণালিনী উপন্যাসে তা আর একটু স্ফুট হল।** দুর্গেশনন্দিনীতে বাঙালির হীনমন্যতাব প্রতি বঙ্কিমের কটাক্ষ আছে। মৃণালিনীতে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলে গিয়েছে। এক অপরিসীম বেদনা নিয়ে তিনি মৃণালিনী লিখেছিলেন। উপন্যাসটিকে সকল সমালোচকই বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট রচনা বলেন নি। সে কথা অস্বীকাব কবা যায় না। ইতিহাসেব তথ্য-বিবলতা বঙ্কিমেব কাছে দুস্তর বাধা হয়েছিল। সে বাধা অপসারণ করতে তখন পর্যন্ত কোনো সার্থক ঐতিহাসিকেব আবির্ভাব ঘটে নি। সে কাজ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিয়েছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার শুভসূচনাব দ্বাবা। মৃণালিনীব মর্মবেদনা বঙ্গদর্শন প্রচাবের মূলে কথঞ্চিৎ সক্রিয় ছিল এ কথা জোব করে বলতে পাবি।

মৃণালিনী বাব হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। মিন্‌হাজউদ্দিনেব সপ্তদশ অশ্বাবোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বাঙালি জাতিকে সঙ্কুচিত করেছিল। এই ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হতে পারেন নি। অথচ ইতিহাসেব ব্যত্যয কবা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতবাং তিনি কল্পনার আশ্রয নিলেন। পশুপতির ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত কাহিনী উপন্যাসে জুড়ে দিযে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসেব একটা অসম্পাদিত সমস্যার সমাধান দেবাব চেষ্টা করেছিলেন। মৃণালিনীব প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পবিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্কবণে পবিত্যক্ত হযেছে।[২] এই পবিত্যক্ত অংশে বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়াব খিলিজীর ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। কুতুবউদ্দিনেব কাছে শৌর্যবীর্যেব পরিচয় দিয়ে বখ্‌তিয়াব মগধ জয় কবাব পর আহ্লাদ উৎসবে গজযুদ্ধেব পরীক্ষা দিয়েছিলেন। স্টুয়াটেব ***History of of Bengal***-এ সে বর্ণনা আছে। বঙ্কিম তার অনুসরণ করেছেন। বখ্‌তিয়ারের

১, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী

২. দ্রষ্টব্য মৃণালিনী, প্রথম সংস্করণ

চেহারার বর্ণনাও স্টুয়ার্ট অনুযায়ী। পার্থক্যও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়াবের বীরত্ব হেমচন্দ্রের উপর আরোপ করেছেন। হেমচন্দ্র অলক্ষ্যে থেকে তীর ছুঁড়ে হস্তীবধ করেছিল সেরকম কথা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।[১] এমন-কি হস্তীকে নিহত করার পর বখ্‌তিয়ার যে উপহার পান তা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের বিতরণ করেন— স্টুয়ার্টের ইতিহাসে তাই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল হেমচন্দ্রের বীরত্ব প্রদর্শন করা।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে আর একটি বিষয় সুকৌশলে উত্থাপিত কবেছেন। তখন বাংলাব অবাজকতার যুগ। হিন্দুগৌববের অধঃপতনেব সময় পুবোহিত-তন্ত্রেব প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়। আত্মবলে অবিশ্বাস তখন বাঙালিব বৈশিষ্ট্য। জয়দেবেব কাব্যে আছে—

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি কববালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত-কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।

বলা বাহুল্য, ম্লেচ্ছ বলতে সেকালে যবনদেরই সম্ভবত বুঝিয়েছিল। দামোদরের পুরাণ উল্লেখ করে যবনদেব আগমনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন সম্ভবত জয়দেবের সাক্ষ্যেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতি স্বরচিত ছড়া-পুথিতে লেখায় জাল করার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা যেমন আধুনিক তেমনি চমকপ্রদ। কার্য-উদ্ধারের জন্যে পশুপতির এ জাতীয় কৌশল অবলম্বন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বহুকাল পরে 'জালালি কলিমা'য় যা লেখা হয়েছিল বঙ্কিমের বর্ণনায় যেন তারই আভাস পাই।[২]

পশুপতিকে মহম্মদ আলি যে অবস্থাতে পালাতে সাহায্য করেছিল তার সঙ্গে এই বর্ণনার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনাকে অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়াতেই কল্পনা করেছেন। শাস্ত্রে গভীর বিশ্বাস এবং পারিষদবৃন্দের তুর্কী আক্রমণের ভয়ে আগে থেকেই পলায়ন মনোভাব মিন্‌হাজের বর্ণনার অনুসারী। কিন্তু মিন্‌হাজের বর্ণনা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সন্দেহ প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের মননে ধরা পড়ে। এইখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব। বঙ্কিমের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

---

১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী
২. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড

'ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।'১

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংশয় পররবর্তীকালে আরও দৃঢ় হয়। এখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক স্থান উদ্ধার করি।

'সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন।'২

অন্যত্র বলেছেন,

'সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্‌ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্‌হাজ্‌ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর।·········বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই।·········সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।'৩

সুতরাং উপন্যাসের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে। উপন্যাস রচনা করার সময়ে ইংরেজকৃত ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও তথ্যের অভাবে তাঁদের ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মিন্‌হাজকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয় তাঁর দূরদর্শিতার ফল। বঙ্গবিজয় কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।৪ পরে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে মিন্‌হাজউদ্দীনের ইতিহাসে আস্থা স্থাপন করেন নি। লক্ষ্মণসেনের নানা গৌরবসূচক কার্যাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী কোনো সেনরাজার আমলে সম্ভবত বঙ্গবিজয় করেন। রাখালদাসের উক্তি স্মর্তব্য।

---

১. মৃণালিনী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ
২. বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন
৩. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭
৪. লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক, প্রবাসী, মাঘ ১৩১৫

'মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢে সেন-রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইযাছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিযা যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিযা সেন-রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের সময় কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড বা রাঢ লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।...তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না।'১

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Bengal, Vol. I*-এ মিন্‌হাজ-উদ্দীনের বর্ণনার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও মিন্‌হাজের বর্ণনায় কতগুলি গোলযোগ আছে বলেছেন। সে-সব সমস্যার সমাধানও করা যায় না। তিনি বলেন,

'The story of the unopposed entry of Muhammad and his eighteen followers into the city raises grave doubts about the truth of the details of the campaign. At a time when Nadiya was apprehending an attack from the Turks, it is difficult to believe that the royal officers would remain ignorant of the movements of Muhammad even when he had crossed the frontiers of the Sena Kingdom, and would readily admit a band of foreigners without any question.'২

সুতরাং আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে এবং পরবর্তীকালের প্রবন্ধগুলিতে মিন্‌হাজের বর্ণনা সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তা সত্য। এই প্রসঙ্গে এইটিও লক্ষণীয় যে মিন্‌হাজের বক্তব্যকে পুরোপুরি উড়িয়েও দেওয়া যায় না। সত্য-মিথ্যার মিশেল থেকে সত্য উদ্ধারে ব্রতী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কল্পনার আশ্রয় নিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি একেবারে অলৌকিক কিংবা নিরালম্ব কিনা তাই আমাদের বিবেচ্য।৩

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সুতরাং বঙ্গবিজয় ঘটনার অনুরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সন্ধান করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাবলীর সঙ্গে বঙ্গবিজয় কাহিনীর সাদৃশ্য টেনেছেন। তিনি যেমন সপ্তদশ (মিন্‌হাজউদ্দীনের উল্লিখিত অষ্টাদশ অশ্বারোহী) অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী বিশ্বাস করেন

---

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ

২. R. C. Majumdar (edited), *History of Bengal, Vol. I*

৩. বঙ্কিমচন্দ্র বখ্তিয়ারের বিংশতি সহস্র সৈন্য নগরের প্রান্তে ছিল একথা বলেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতকে লঙ্ঘন করেছেন।

নি তেমনি বিশ্বাস করেন নি পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয় কাহিনী। সেকথা পববর্তীকালে বলেছেন,

'বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। ...নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছেন। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত।'[১]

সুতবাং যে কৌশলে এবং যে হীন ষড়যন্ত্রের সাহায্যে পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজেরা জিতে সেবকম কারণেই বখ্‌তিয়ার বঙ্গবিজয় কবেছিলেন, এই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা। ফলে পশুপতিব ভূমিকার অবতাবণা। পশুপতির ষড়যন্ত্রের জন্যেই বখ্‌তিয়াব অতিসহজে বঙ্গবিজয় করতে সমর্থ হয়েছিল। মৃণালিনী উপন্যাসের এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

'বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না, চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।'[২]

যে যুগে তথ্যবিরলতা কোনোও একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে আসার পরিপন্থী, এবং যে সমস্যার সমাধান অদ্যাবধি হয় নি সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মনন একটি কার্যকারণসূত্রে বিধৃত সমাধান দিয়েছে। এ ঐতিহাসিক বোধের পরিচায়ক। মৃণালিনীর পরিকল্পনায় এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বড়ো সাফল্য বলে মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধ রাজাব যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনার অনুযায়ী। কিন্তু এখনকার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে লক্ষ্মণসেন বিদ্যোৎসাহী এবং রণজয়ী পুরুষ ছিলেন। পশুপতি চরিত্রেব সঙ্গে কিন্তু মিরজাফরের তুলনা করা যায় না। পশুপতির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল। রাজনীতিতে সে দক্ষ। মনোরমার প্রতি তার প্রেমও নিরাবিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তার পতনের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতির এই ষড়যন্ত্রকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কৌশলে তিনি পশুপতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

'একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাসূতার মালা তাহাব গলদেশে পরাইতেছিল। মালা পরাইতে মালা খুলিয়া গেল।'

পশুপতির সঙ্গে কৃষ্ণমার্জারের তুলনা টানা হয়েছে। বঙ্কিম বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত দণ্ড দিয়েছেন। যুদ্ধ জয়ের পর বখ্‌তিয়ার পশুপতির প্রতি যে আচরণ

১. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭
২. মৃণালিনী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

করেছিলেন তাতেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখানো হয়েছে। মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্রের ভূমিকা কতকটা অবাস্তব কতকটা রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র আদর্শ বীর। মাধবাচার্যেব যোগ্য শিষ্য সে। কিন্তু সব বৈশিষ্ট্য তার আচরণে কদাচিৎ দৃষ্ট। তাব শৌর্যবীর্যের এই চকিত স্ফুবণ আমাদেব অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। মাধবাচার্য মৃণালিনীর আকর্ষণ থেকে হেমচন্দ্রকে দূবে রাখতেই ব্যস্ত। বখ্‌তিয়াব খিলিজীব আক্রমণের পূর্বেও হেমচন্দ্রেব নিশ্চেষ্টতা আশ্চর্যজনক। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন মাধবাচার্যের গণনাকেই সার্থক করে তুলতে চান। পশ্চিমদেশীয় বণিক বলতে বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংরেজদেরই বুঝিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। অথচ মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকেই বুঝেছিলেন। সুতবাং এই ভ্রান্তির উদাহরণস্বরূপ হেমচন্দ্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। হেমচন্দ্রের ভূমিকায় পৌরুষ, একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা সব থাকা সত্ত্বেও তার সব উদ্যোগ এবং চেষ্টা ফিকে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপবে যে গুরুভার ন্যস্ত কবেছেন সেই ভার বহনে সে অক্ষম।

গ্রন্থেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র মনোরমা। মনোরমার চবিত্রে দ্বৈধতা আশ্চর্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। অদৃষ্টের চক্রে সে বিবাহিত হয়েও স্বামী-সহবাসে বঞ্চিত। তার জন্যে তাব একটা মর্মপীডা ছিল। নারীর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে সে নিরুদ্ধ কবতে পারে নি। অথচ পশুপতির আচরণের প্রতি সমর্থনও নেই। পশুপতিকে সে ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করে কাশীতে বাস করবাব পরামর্শ দিয়েছিল। মনোরমার জীবনে যে অভাববোধ তাকে পূর্ণতা দিতে পশুপতি অক্ষম। মনোরমা সেজন্যে হেমচন্দ্রের কাছে ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্কের জন্যে লালায়িত। কিন্তু পশুপতির আকর্ষণও সে ত্যাগ করতে পারে না। মনোবমার ভূমিকায় বালিকাসুলভ চাপল্য ও প্রৌঢ় মনোভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের বিশ্লেষণী রীতির আশ্রয় না নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমার দ্বৈতবৃত্তির সার্থক রূপায়ণ করেছেন।

গিরিজায়ার চরিত্রে বিমলার ছায়া আছে। আবার দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তাব ব্যবহাব আশমানী ও গজপতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৃণালিনী উপন্যাসটির উৎকর্ষ ঘটেছে পশুপতির মাতৃমূর্তির কাছে প্রার্থনা-দৃশ্যে, ধাতুমূর্তির বিসর্জন পরিচ্ছেদে। মাতৃকামূর্তিকে আশ্রয় করে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করা বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য। পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে মাতার আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল। দেশের রাজলক্ষ্মী যখন বিদায় হন তখন মূর্তিও বিসর্জিত হয়। ধাতুর মূর্তি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন

তাতে বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের দ্যোতনা পরিস্ফুট হয়েছে।[১] মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার বীজটি বপন করেন। লক্ষ্মণসেনকে তিনি বলেছেন রাজকুলকলঙ্ক :

'সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।'

বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি লক্ষণীয় :

'সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত এই উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা এবং শুভবুদ্ধিই মৃণালিনীকে জনপ্রিয় করেছিল।

মৃণালিনী রচনার সমসাময়িক কালে শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে স্বাজাত্যবোধ দেখা দিচ্ছিল।[২] ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে চৈত্র-সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হয়। ১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ায় সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই মেলাতেই 'গাও ভারতের জয়' গানটি গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এসবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও মনে হয় এই জোয়ারে তিনি আনুকুল্য করেছিলেন। তা না হলে শিবনাথ শাস্ত্রী এমন কথা লিখবেন কেন?—

'কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রনাথ সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের (১৮৬০-১৮৭০) মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাসনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।'[৩]

অনুমান করি বঙ্কিমের মৃণালিনী জাতীয় তৃষ্ণায় কথঞ্চিৎ বারিসিঞ্চন করেছিল।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক এমন কতগুলি ঘটনা নির্বাচন করেন যেগুলি জাতির চিত্ত সহজেই জয় করে নিতে পারে। রচনার দোষত্রুটি বিষয়ের গুরুত্বে পাঠকের কাছে আর ধরা পড়ে না। MaCculum শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ঘটনানির্বাচনের এই কুশলতার দিকটি উল্লেখ করেছেন। মৃণালিনী উপন্যাস হিসেবে দোষত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিজয় ঘটনা নির্বাচন

১. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
২. জাতীয় ঐক্য, এবং স্বদেশচর্চার বীজটি অঙ্কুরিত করেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু।
৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ

করে বাঙালির মনোমন জয় করে নিয়েছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি জাতিকে পীড়িত করেছিল। বাঙালির সে কলঙ্ক অপনোদন করার জন্য একটা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেন। উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট না হয়েও বাজারমূল্যে মৃণালিনী বঙ্কিমের অন্য কোনো উপন্যাসের চাইতে খাটো ছিল না। মাধবাচার্যের নানাস্থানে ভ্রমণ এবং সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থার কথা বঙ্কিম বিস্তৃত করেন নি। এই পরিকল্পনাটিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে কল্পনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

চন্দ্রশেখর

'চন্দ্রশেখর' ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে বার হয়। অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিকেও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নানা পরিবর্তন সাধন করেন। প্রতি সংস্করণে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন তো ছিলই।

চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন

'চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'উল মুতাখেরীণ' মতাক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ আছে, ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।'

বঙ্কিমচন্দ্র যে এই গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তা রামদাস সেনের গ্রন্থাগারের সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের রহস্য-ঘনিমাকেই উন্মোচিত করেছেন। প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রশেখরের ঘটনার কাল মীরকাশিমের নবাবী আমল। মীরজাফরের পর মীরকাশিম নবাব হলে বাংলাদেশের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের যে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনীকে তারই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। মীরকাশিম সিরাজদ্দৌলা কিংবা মীরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজের সৈন্যসজ্জা ইংরেজের অনুকরণে করেছিলেন। গোলাম হোসেনের বিবরণ থেকে জানতে পারি মীরকাশিমও বিশ্বাসঘাতক দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা

বিশ্বাসঘাতকদের বশে রাখতে পেরেছিল। দেশে তখন সুশাসকের অভাব দেখা দিয়েছে। দেশে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে মীরকাশিম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

মীবকাশিম ইংবেজদেব সঙ্গে বিবাদ করতে চাইতেন না। উপন্যাসে মীবকাশিমেব চরিত্রের রাজনীতিঘটিত অপবাপর দিকগুলি বিশেষ পরিস্ফুট নয়। দলনী বেগমেব সঙ্গে তার প্রেমের স্বরূপটিই বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত করেছেন। মীরকাশিমেব সঙ্গে কাটোযাব যুদ্ধ, উধুযানালার যুদ্ধ, ইংরেজের নৌকা আটক, আমিয়েটেব দৌত্য সবই সয়ের মতাক্ষবীণে পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তেব কাছাকাছি ছিলেন। কাশিম আলি খাঁব শেষ পরিণতি যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন তা মর্মস্পর্শী।

'নবাব কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরাব হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুষ্কার্য করিয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্যন্ত যান নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন বাঙ্গলার শেষ যবন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।'[১]

গোলাম হোসেন মীরকাশিমের এই ফকিরি গ্রহণের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মীবকাশিম নবাবী নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাস্রোতের বিপুল আবর্তে তাঁর সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যে মীরকাশিম বার বার বলেছিলেন, 'আমি সিবাজদ্দৌলা নহি' সেই মীরকাশিমের এইরকম শোচনীয় পরিণতি ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির ইঙ্গিত দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের কূটনৈতিক বিচক্ষণতার কথাও গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গুরগণ খাঁর সহায়তায় তিনি নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই দুরভিসন্ধি বঙ্কিমচন্দ্র গোপন রাখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তা সয়ের মতাক্ষরীণের অনুযায়ী। মীরকাশিমের এই আর্মাণীয় সেনাপতির প্রতিটি কার্যকে গোলাম হোসেন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

---

১. চন্দ্রশেখর, প্রথম সংস্করণ, পরিশিষ্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যান্বেষণে নানা বিদেশী বণিক এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল। এরা রাজানুগ্রহও লাভ করত। গুরগণ খাঁ এইরকম একজন স্বার্থান্বেষী বণিক। সে ছিল বস্ত্রবিক্রেতা। গজে মেপে কাপড় বিক্রি করত। গোলাম হোসেনের সঙ্গে গুরগণ খাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল বলেই তিনি গুরগণকে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করেছেন। এ কথাও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'মীরকাশিম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গুরগণ খাঁ উচ্চাভিলাষী ছিল। সে মীরকাশিমকে প্ররোচিত করেছিল নেপাল আক্রমণের জন্যে। শোনা গিয়েছিল নেপালে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং স্বর্ণপ্রীতিই গুরগণকে আকর্ষণ করেছিল নেপালের দিকে। গুরগণ নিজের কার্যাবলীর দ্বারা এতই ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে মীরকাশিম গুরগণের দাস হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের চরিত্রে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসসম্মত। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের রাজনীতির একটি সজীব চিত্রের অবতারণা করেছেন। জগৎশেঠদের সঙ্গে তার গুপ্ত মন্ত্রণা সে যুগের কুটিল রাজনীতিকে উদ্ঘাটিত করেছে। জগৎশেঠদের হাতে রাখতে না পারলে সে সময়ে কোনো নবাবই সিংহাসনকে সুরক্ষিত মনে করতেন না। গুরগণ মীরকাশিমের সঙ্গে জগৎশেঠদের মনোমালিন্যের সুযোগে নিজের ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পরে নবাব এবং অনুচরবৃন্দ সকলেই দেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপন আপন স্বার্থ বেশী দেখেছিল। গুরগণের জগৎশেঠের সঙ্গে মন্ত্রণা তার উদাহরণ।

মীরকাশিম-দলনীবেগম আখ্যায়িকায় গুরগণের প্রয়োজন খুব বেশি নয়। সে কেবলমাত্র দলনীর ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রথম গ্রন্থিটি রচনা করেছে। ভ্রাতা এবং ভগ্নীর মধ্যে স্নেহের সম্পর্কটি বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন নি। বস্তুত সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থে গুরগণকে এইরকমই দেখানো হয়েছে। কিন্তু নিশীথে ভগ্নীকে চরম বিপদে ফেলে গুরগণের আত্মতুষ্টি মনোভাবকে অঙ্কিত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে প্রায় ভিলেন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। এই ঘটনাটি ইতিহাস-সম্মত নয়।

মহম্মদ তকি খাঁর ভূমিকা নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট তকি খাঁ ইতিহাসসম্মত নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থে যেমন নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট সিরাজকে সমর্থন করেন নি তেমনি তকির চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর ভাষা কিঞ্চিৎ কঠোর। দলনীর প্রতি তকি খাঁর আসক্তি, সৈনিকোচিত কাজে তার অবহেলা

ঐতিহাসিক সত্যেব বিপবীত। সয়ের মতাক্ষরীণে মহম্মদ তকির চবিত্রের এক উজ্জ্বল বর্ণ আলিম্পন ঘটেছে। তকিব সাহস, তার বীর্য সে যুগে বিরলদৃষ্ট ঘটনা।[১] অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট তকি খাঁর সঙ্গে ঐতিহাসিক তকি খাঁব নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এ কথা মানতে ইচ্ছা হয় না। যদি তাই হবে তবে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা স্বচ্ছন্দে উল্লেখ কবতে পারতেন। তিনি যখন ঐতিহাসিক চবিত্র গ্রন্থে স্থান দিচ্ছেন তখন তথ্যের প্রতি যথাসম্ভব অনুগত তাঁকে হতে হবে। বিশেষত তকি খাঁ নামে যখন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ বর্তমান ছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র তকির নামের আশ্রয় না নিলেও পারতেন। আসলে গল্প-কাহিনীকে সবস কববাব জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। গ্রন্থে আলি ইব্রাহিম খাঁ কিংবা মীবকাশিমের অন্যান্য অনুচবেব তথ্য অবিকৃত রেখেও তকির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কেন এই দুবপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত করলেন তাব কারণ বোধ কবি এইখানে।

দলনীবেগম বঙ্কিমচন্দ্রেব অপরূপ সৃষ্টি। দলনীব পবিচয ইতিহাসে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কল্পনা আযেষা সৃষ্টি কবেছিল তাই আব একপদ অগ্রসর হয়ে দলনীব ভূমিকা চিত্রিত করলে। কুলসমের জবানিতে জানতে পারি দলনীব পূর্ব নাম দৌলতউন্নেসা এবং গুরগণের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে সে বাংলা দেশে এসে পৌছেছিল। ভ্রাতা এবং ভগ্নীতে পরামর্শ কবে ঠিক হয়েছিল ভ্রাতাব কাজে ভগ্নী সহায়তা কববে। প্রথম দাসীরূপে নবাবের অন্দরমহলে প্রবেশ কবে সে মীরকাশিমেব প্রিয়তমারূপে পবিগণিত হল। সয়ের মতাক্ষরীণে মীরকাশিমের ভার্যা রূপে মীরজাফবের কন্যার কথাই উল্লিখিত। কি ভাবে কি উপায়ে দলনী মীরকাশিমের প্রিয়তমারূপে চিত্তজয় করেছিল তার কোনো বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। প্রথম দৃশ্যে দলনীর চিন্তার মধ্যে দেখতে পাই তাব আন্তবিকতা এবং প্রেমের গভীরতা, মীবকাশিমের জন্যে নারীর স্বভাবসিদ্ধ উদ্‌বেগ। সে উদ্বেগ নিয়ে সে মীরকাশিমকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। রাজনীতির কুটিল নীতিতে দলনীর প্রবেশের সূচনা হল মীরকাশিমের বাধায়। তাব পর দলনীর অধৈর্য এমনই একটা আকার লাভ করল যা তাকে বিপুল ঘটনাস্রোতে বার বার ফেলে দিতে লাগল। অসহায় দলনী যতবারই চেষ্টা করেছে ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে ততই গ্রন্থি দৃঢ় হয়েছে, নূতন গ্রন্থি রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার অভিঘাতে নরনারী

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য ***Sier-ul-Muteqherin***এর ৫৭-৫৯, ৩৮৯, ৪০১, ৪২১-৪২২, ৪৩২, ৪৮৪-৪৮৫ প. দ্রষ্টব্য

এপার থেকে ওপারে আন্দোলিত হতে হতে পরিণতির পথে এগিয়ে যায়। ঘটনার গতি যে কত দুর্বার এবং তা যে কত বিচিত্রপথে উৎসারিত হয় দলনীর পরিণতি তার সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাসের রথচক্রে পিষ্ট মানবাত্মার ক্রন্দন দলনীর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্র-গুলির উপর ইতিবৃত্তের ঘটনারাজির প্রভাব যদি প্রাণবন্ত করে দেখানো যায় তবে তা ঐতিহাসিক রস পরিস্ফুটনে সাহায্য করে। কেবল কতগুলি তথ্য নয়, ইতিহাস যে মানবজীবনের নিয়ন্তা তাও দেখানো প্রয়োজন। দলনীচিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিল্পসার্থকতা লক্ষণীয়।

প্রতাপ ঐতিহাসিক পুরুষ নয়। প্রতাপের অসমসাহসিকতা, ডাকাতি-বিদ্যায় চাতুর্য প্রদর্শন গ্রন্থে উল্লিখিত।[১] তাব জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র কৈফিয়ত দিয়েছেন। সে যুগে বহু জমিদার ডাকাতিবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল, অনেক জমিদার ডাকাতদেব আশ্রয় দিত। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রতাপের ভূমিকায় সেই যুগ-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রেব ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে ইংরেজ প্রতিনিধি কয়েকজন আছে। এরা হল লবেন্স ফস্টব, আমিয়েট গলস্টন, এনিস ইত্যাদি। তার মধ্যে ফস্টরের বিবরণ কিঞ্চিৎ অধিক। রেশম কুঠিব কুঠিয়াল দলের দৌরাত্ম্য ইতিহাসসম্মত ঘটনা। যে সব ইংবেজ সেযুগে ভাগ্যান্বেষণে বাংলা দেশে এসেছিল তাদের বাঙালির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে অপহরণ করবার পূর্বে ফস্টরের চিন্তার মধ্যে দিয়ে সে সকল কথা বলেছেন। স্বদেশেব মায়া কাটিয়ে যারা এ দেশে এসেছিল তারা বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবন পূর্ণ করতে গিয়ে নানা ক্ষুদ্রতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে নি। ফস্টরের লালসাব লোলতার যে পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন তাতে অতিরঞ্জন নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটি মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র লালসার পঙ্কে নিমজ্জিত হয় নি। রাজনীতিক পটভূমির দ্রুত পরিবর্তনেব যুগে আমিয়েটের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, অপূর্ব সৎসাহস, গলস্টনের নির্ভীক মনোভাব যদি না থাকত তবে বাংলা তথা ভারতের রাজ্য তাদের অধিকারে আসত না। জাতির সম্মান রক্ষার জন্যে তারা যে-কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে দ্বিধা করত না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের সে পরিচয়ও উপন্যাসে পরিস্ফুট করেছেন। বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষের লক্ষ্যও এইখানে।

১. চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখব উপন্যাসে ঘটনার সমাবেশ কবেছেন অত্যন্ত বেশি। কাহিনীকে এগিয়ে নিযে যাবাব জন্যে এরকম সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। এই-সকল ঘটনাসমাবেশেব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এমন কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্ত প্রকাশ কবেছেন যা ইতিহাসেব দিগন্তকে এক মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত কবে দেয। শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

''চন্দ্রশেখরে' জনসন ও গলষ্টন প্রতাপের গৃহদ্বারের রুদ্ধ কপাটে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই পদাঘাতই ভারতে প্রথম যুগের ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগর্বিত আত্মাভিমানের যেন মূর্ত বিকাশ—এই এক পদাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুস্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্যটি আমাদের নিকট প্রকাশ করে।'১

এইবকম আব একটি চকিত-দীপ্তি চন্দ্রশেখব উপন্যাসে লক্ষ্য কবি। ফস্টবেব প্রবোচনায় শৈবলিনী যখন অপহৃত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখবেব অপবিসীম শূন্যতাব পবিচয দিযেছেন এইভাবে,

'(চন্দ্রশেখর) সাযাহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইযা, তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি, ন্যায, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন, কল্পসূত্র, আরণ্যক উপনিষদ, একে একে সকলেই অগ্নিস্পৃষ্ট হইযা জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।'২

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে যে শূন্যতাব সৃষ্টি হযেছিল, দ্বিজত্ব যে তখন বিপদগ্রস্ত, বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথাই এখানে বলেছেন। এক দিকে 'গঙ্গাম্বুসঞ্চাবী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংবেজেব লাল নিশানেব ঔদ্ধত্য অন্য দিকে দেশবাসীব বহুযুগসঞ্চিত বিশ্বাসেব অবক্রমণ এই দুইটি বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হযেছে এই বর্ণনায।

চন্দ্রশেখব উপন্যাসে মীবকাশিম-দলনী আখ্যাযিকাব সঙ্গে প্রতাপ-চন্দ্রশেখব-শৈবলিনী কাহিনী শিথিলবিন্যস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যেন পাশাপাশি দুটি কাহিনীকে সমান বেগে চালিযেছেন। উভয কাহিনীব সাধাবণ প্রেক্ষাপটটি তৎকালীন বাষ্ট্রীয় বিপর্যয়। এ ছাড়া কাহিনী দুটিব মধ্যে অন্তবঙ্গ যোগ আবিষ্কার কবা কষ্টসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কাহিনী দুটির একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। কুলসমের সঙ্গে পরামর্শ কবে দলনী গুবগণেব কাছে পত্র দিয়েছিল। এই

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
২. চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড

পত্রই দলনীকে রাজাবরোধ থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

'এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।'১

দুজনের অদৃষ্টকে একসূত্রে গাঁথবার সবচাইতে বড়ো ঘটনা ঘটেছিল যখন ইংরেজরা শৈবলিনী ভ্রমে দলনী এবং কুলসমকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। এই ভুলটি না ঘটলে দলনীর অদৃষ্ট হয়তো অন্যরূপ হত। বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিপ্রায় থেকে বুঝতে পারি একটি মাত্র ঐতিহাসিক পরিবেশে দুটি নারীর জীবনে যে ভাগ্য-বিপর্যয় হয়েছিল তাকেই তিনি স্পষ্ট করেছেন উপন্যাসে। কিন্তু দলনীর কাহিনীর সঙ্গে শৈবলিনীর কাহিনীর সাদৃশ্য অথবা বৈপরীত্য কিছু নেই। আবার দলনীর কাহিনী উপন্যাসে জায়গাও নিয়েছে বেশি। তবে একটি প্রশ্ন মনে আসে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কাহিনীকে প্রধান করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনী না অনৈতিহাসিক কাহিনীটি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কাহিনীটিই যে প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি বঙ্গ-দর্শনে বার হবার সময়ে খণ্ডবিভাগ ছিল না। গ্রন্থাকারে বার হবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটির খণ্ডবিধান করেন। প্রত্যেক খণ্ডের শিরোনামও তিনি দেন। এই শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারি শৈবলিনী ভূমিকার আদ্যন্ত বিকাশ দেখানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। পাপীয়সী (প্রথম খণ্ড), পাপ (দ্বিতীয় খণ্ড, পুণ্যের স্পর্শ (তৃতীয় খণ্ড) এগুলি সবই শৈবলিনী চরিত্র কিংবা শৈবলিনী কাহিনীকে উদ্দেশ্য করে কথিত। এই-সব খণ্ড দলনী-বর্জিত। সুতরাং কাহিনীর সূত্র শৈবলিনীকে অবলম্বন করেই বয়ন করা হয়েছে। নচেৎ পুণ্যের স্পর্শ দলনীও পেত। দলনীর সঙ্গে শৈবলিনীর অপর তফাৎ হচ্ছে এই যে দলনীর মতো শৈবলিনী ঘটনার স্রোতে ভেসে যায় নি। তার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল তা অনুকূল বায়ুপ্রবাহে বৃহদাকার ধারণ করলে। শৈবলিনী ইতিহাসের ঘটনায় নিজ রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। যদি অনুকূল ঘটনাস্রোত না থাকত তবে শৈবলিনীর পরিণতি কি হত তা বলা যায় না। ইতিহাসের সার্থকতা বোধ করি এইখানে। এইখানে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে শৈবলিনীর প্রেমের তুলনা করা যেতে পারে। কুন্দনন্দিনীর ভীরুপ্রেমের ক্রমবিকাশ বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে দেখিয়েছেন। কিন্তু শৈবলিনীর প্রেমের বিকাশ (আট বছরের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি) প্রথম

১. চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

খণ্ডেই এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে একটা অসাধারণত্বের ছাপ আছে। রাজনৈতিক ঘটনার উত্থানপতনের মধ্যে শৈবলিনী স্বচ্ছন্দ বোধ করেছে। লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন, সুন্দরীর চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা সত্ত্বেও শৈবলিনীর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। রূপসীর ছদ্মাবরণ, মীরকাশিমের কাছে আত্মপরিচয়, গলস্টন-জনসনকে ফাঁকি দেওয়ার মধ্যে শৈবলিনী ভূমিকার দৃঢ়তা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর প্রেমকে এক অসামান্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর কোনো নায়িকাই এতটা তেজোদীপ্ত নয়। এই উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রণয়ের দ্বন্দ্ব ইতিহাসের আকাশে বাতাসে অপরূপ বর্ণ-সমারোহ সৃষ্টি করেছে। পাপীয়সীর প্রেম বর্ণনায় ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে এইভাবে সাহায্য করেছে।

সুতরাং প্রধান কাহিনীর সূত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে আপন উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন। আমরা দেখছি (দ্রষ্টব্য, উপক্রম) ইতিহাস অনেক সময় কাহিনীর গ্রন্থিবন্ধনে এবং গ্রন্থিমোচনে সহায়তা করে। লেখকের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য বাধা না হয়ে বরং অনুকূল উপায়রূপে দেখা দেয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাস তার প্রমাণ।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল রোমান্সপ্রবণ। ঐতিহাসিক রোমান্স-রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। ইতিপূর্বে বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিরা উপন্যাস রচনা করে তিনি ইতিহাসের জগৎ থেকে দূরে ছিলেন।

'বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিরা লিখিয়া তাঁহার রোমান্স প্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের কামনা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন।'[১]

চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য সর্বৈব সত্য।

১. বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, সম্পাদকের ভূমিকা

আনন্দমঠ

'আনন্দমঠ' ১২৮৭ সালের চৈত্রমাস থেকে বঙ্গদর্শনে বাব হতে থাকে। ১২৮৯ সালে চৈত্র মাসে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থাকাবে প্রকাশের সময় কিছু কিছু পরিবতন সাধিত হল। প্রথম চারটি সংস্করণে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম। পরে ঐতিহাসিক বিবরণ যথাযথ বাখবাব জন্য উত্তরবঙ্গ নির্বাচন কবা হয়। আবও একটি পবিবর্তন লক্ষণীয়। বঙ্গদর্শনে উপক্রমণিকায় ছিল,

প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"
"আর কি আছে? আর কি দিব।"
তখন উত্তর হইল, 'তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবাব সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবর্তন করলেন তা এই,

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"
প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ কবিতে পারে।"
"আর কি আছে? আর কি দিব?"
তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

ভক্তি কথাটি স্থূল অক্ষবে মুদ্রিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পবিবর্তন গভীব উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। **আনন্দমঠের প্রতিপাদ্য এই ভক্তিমহিমাখ্যাপন।** প্রথমে যা ছিল তাতে স্বদেশচর্চাব মুল মন্ত্রটি উদ্গীত। কিন্তু স্বদেশচর্চা যদি উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয় কিংবা স্বার্থপ্রণোদিত হয় তবে তা বিপথগামী হতে বাধ্য। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদে স্বাধীন চেতনাব বিকাশে প্রথমোক্ত রূপের বিস্তার। অনেক সময়েই স্বদেশচর্চা পরপীড়নের নামান্তর। অবশ্য এ কথা বলি না যে ইউবোপীয় জাতীয়তাবাদ সর্বদাই পরপীড়ন কিংবা উচ্ছৃঙ্খল ছিল। বড়ো বড়ো দেশপ্রেমিকেব কথা স্মবণ করলে তা কখনোই বলা যায় না। সেখানকাব স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বদা বিপথগামী হয়েছে তাও ঠিক নয়। কিন্তু ভারতীয় চেতনায় সর্বকার্যেব মূলে ঐশীমহিমার শুভ অস্তিত্ব স্মরণ করা হয়। চিত্তশুদ্ধি এর মূল কথা। সুতবাং আত্মবিসর্জন গৌরব বটে যদি সে বিসর্জন ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। **আনন্দমঠের মূল বক্তব্যটি বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই দিয়েছেন,** গীতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধাব করে।[১]

---

১. 'কিন্তু হে পার্থ। যাঁহারা আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া আভ্যযোগে আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাদৃশ সাধক সকলকে আমিই অচিরে মৃত্যুপূর্ণ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতে সঙ্কল্প বিষয়াত্মক মনস্থির কব যদিও আমাতেই নিবেশিত কর দেহান্তে আমাতে বাস করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। হে ধনঞ্জয়। যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ হও তবে অভ্যাস যোগে আমাকে পাইতে প্রযত্ন কর।'

যে প্রবল প্রেরণার বশে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল **স্বদেশপ্রেম এবং গীতোক্ত উপদেশ**। ইতিপূর্বে মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে বলেছিলেন, 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে'। সে কাব্যের গৌরব তাতেই বেড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জাতির চিত্তকে পরানুকরণস্পৃহা থেকে স্বদেশমুখী করেছিলেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশগীতি রচনা করলেন, কিন্তু তাঁর নায়ক তেমন কিছু শক্তিশালী ছিল না। মধুসূদন যথার্থ বীরের গলায় মালা পরিয়েছেন। **বঙ্কিমচন্দ্র বীরত্বের সঙ্গে নীতিবোধ জুড়েছেন।** বঙ্কিমচন্দ্রেব ধ্যানদৃষ্টিতে স্বদেশচর্চাব যে আদর্শটি ছিল তা আনন্দমঠেই পবিস্ফুট। মৃণালিনী উপন্যাসে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিব বাহুবলেব অভাবেব জন্যে খেদ প্রকাশ করেছেন। পবে 'ভাবত কলঙ্ক' প্রবন্ধে ভাবতবাসীব বাহুবলের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবেছেন। আনন্দমঠে এই বাহুবলেবই প্রতিষ্ঠা। বাহুবল যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয, উক্তি উৎসারিত না হয়, তবে তাব দ্বাবা সংগঠনমূলক কোনো কার্য সম্ভব নয়। এইটিও আনন্দমঠেব অন্যতম ফলশ্রুতি।

আনন্দমঠেব বচনা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায বলেছেন,

'বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমবা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরেব মন্বন্তবের কথা প্রথম শুনি। কি প্রকারে তিল তিল করিয়া বঙ্গদেশ ছারখাব করিল, তাহা বিবৃত করিলেন।'[১]

সম্ভবত কৈশোরের স্মৃতি আনন্দমঠ বচনা কবতে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রেবণা দিয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সবকারেব সাক্ষ্যে জানতে পাবি আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র হুগলিতে অবস্থানকালে বচনা কবেছিলেন। জয়দেবেব একটি গান 'ধীবসমীরে যমুনাতীবে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয ছিল। আনন্দমঠে তাব প্রভাব আছে। 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গানটি সম্বন্ধেও পূর্ণচন্দ্র একই কথা বলেছেন। জয়দেবের **দশাবতার স্তোত্র থেকে** উদ্ধৃতি দেওয়াতে বুঝতে পাবি বঙ্কিমচন্দ্র সেই স্তোত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আনন্দমঠের সন্ন্যাসীবা স্বদেশনেতা কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে তারা বিফলকাম। বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক কালের ইতিহাসের শিক্ষাকে এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে চন্দ্রশেখব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজরাই যে যুদ্ধে জিতবে, ইংরেজি শিক্ষাই যে বাংলাদেশে স্থাপিত হবে সে কথা বলেছেন। মৃণালিনীতে পশ্চিমদেশীয় বণিক কর্তৃক ভাবতবর্ষের কলঙ্কমোচন হবে এই সিদ্ধান্ত কবেছিলেন। আনন্দমঠেই এই সিদ্ধান্তকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিস্ফুট করলেন সম্পূর্ণরূপে।

---

১. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

'ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।'১

আনন্দমঠের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র দেশের অরাজকতার চিত্র দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অরাজকতার জন্য অংশত দায়ী করেছিলেন ইংরেজের বণিকবৃত্তিকে। সুতরাং ইংরেজ বণিকবৃত্তি ত্যাগ করে দেশে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারলে ভারতবর্ষের মঙ্গল।

'ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান-বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।'

পরে বলেছেন,

'শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা।'১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজ শাসনকে নানাদিক থেকে স্বাগত জানিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজচেতনার এই spiritকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন।

'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে, যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।'

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আনন্দমঠে উপন্যাসের প্রয়োজনেই কেবল নয় লেখকের গভীর বিশ্বাস হতেই ইংরেজ প্রশস্তি উদ্রিক্ত হয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আনন্দমঠের সন্তান সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বলতে সচরাচর যা বোঝা যায় সেই অর্থে এরা বৈষ্ণব নন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মাতৃভক্ত। তাদের আরাধ্যা মাতৃকাদেবী। দেবী যা ছিলেন দেবী যা হয়েছেন এবং দেবী যা হবেন এগুলি সবই দেশের কথা। সন্তানরা আবার বিষ্ণুভক্ত। তাদের যুদ্ধোন্মাদনায় 'হরে মুরারে' গীতের প্রেরণা, দেশমাতৃকার স্তব তাদের সাহস বাড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের জবানিতে বলেছেন, 'সন্তানেরা বৈষ্ণব'। মহেন্দ্র এ শুনে প্রশ্ন করল,

---

১. আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ

২. ভারতবর্ষ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

'ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।'

সত্যানন্দ বলেন,

'সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক, প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।'[1]

সত্যানন্দ যখন কারাগারে তখন সন্তানগণ যে উৎসাহে শত্রুর বিনাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন সেখানেও একই ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এই যে ব্যাখ্যা দিলেন তা ভেবে দেখবার যোগ্য। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেব যে 'মর্কট বৈরাগ্য'কে ঘৃণা করতেন তাই নানাভাবে সমাজের ছিদ্রপথে প্রবেশ করছিল। শক্তি অপেক্ষা রসের সাধনায় জাতি যে মুক্তিকামনা করেছিল তাতে সমাজ লাভবান হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। সে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক জীবনে বৈষ্ণবতার যে-স্রোত লক্ষ্য করেছিলেন তারই সমালোচনা করেছেন। লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্বকে অবজ্ঞা করেন নি, কিন্তু শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসনার মধ্য দিয়ে জাতি তার বিষ্ণুর অন্য অংশকেও দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করুক বঙ্কিমচন্দ্র এই চেয়েছিলেন। আনন্দমঠের এইটিও অন্যতম ফলশ্রুতি।

আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত রচনা করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলেছেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[2] 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের পূর্বাভাষ পাই কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে নানা প্রহরণ ধারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার মূর্তি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ সংগীতের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

---

১. আনন্দমঠ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, নারায়ণ (বঙ্কিম-স্মৃতি-সংখ্যা)

চন্দ্রশেখর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা ঐতিহাসিক, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাও তাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদি দেশের বুকে যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যেত কবিবৃন্দ তাকে বার বার স্মরণ করেছেন। জাতির সে দুর্ভাগ্য বেদনার্ত ভাষায় এই সব কবিতায় উদ্গীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে তথ্যের জন্যে হাণ্টারের *Annals of Rural Bengal, Vol. I*-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। তার কথাও বঙ্কিমের স্মৃতিতে ছিল। পূর্ববর্তী কবিরা দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কোনো তুলনাই হয় না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম **ঐতিহাসিক তথ্যকে অতিক্রম করে কল্পনাবলে দুর্ভিক্ষের নগ্ন বীভৎসতাকে ফুটিয়েছেন।** ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম না ঘটিয়েও বঙ্কিম যে নিখুঁত বাস্তবচিত্র দিয়েছেন তা তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেয়। আবার এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্নেহ-মমতা-দয়া-প্রেমের যে উত্থান পতন লক্ষ্য করি তাও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশক্তির পরিচয় দেয়। দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী হয়ে স্তম্ভিত মানবাত্মার বিস্ময় অনুভব করি এই দৃশ্যগুলিতে। হাণ্টার তাঁর বইতে John Shore-এর যে কবিতাংশ তুলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করি—

'Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue ,
Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
Cries of despair and agonizing moans
In wild confusion dead and dying lie :—
Hark to the Jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howe, as midst the glare of day
The riot unmolested on their prey,
Dire scenes of horror, which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface.'[১]

একজন ইংরেজের চোখেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার যে স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি তাতেই এটা স্পষ্ট যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশবাসীর চিত্তে দুঃস্বপ্নের স্মৃতিরূপে জাগরূক ছিল।

যে সময়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় তার কিছুকাল আগে থেকেই সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের কথা শোনা যেত। মোগল বাদশাহেরা এই সমস্ত সন্ন্যাসী ফকিরদের অবাধ বিচরণে বাধা দেন নি। ববং ঐতিহাসিক তথ্য

১. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal, Vol. I*

থেকে জানতে পারি বাদশাহরা এদের কিঞ্চিৎ সমীহ করে চলতেন। এই সমস্ত ফকির এবং সন্ন্যাসীরা কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করতে এরা দ্বিধা করত না। ইংরেজ এই সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের দমন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। বাংলাদেশে কুচবিহার, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলে এদের গতিবিধি ছিল অবাধ। এরা যদিও ধর্মীয় আবরণে নিজেদের কার্যবিধি পরিচালিত করত তথাপি এদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এদের শক্তি ও সাহস এতই অপরিসীম ছিল যে গ্রামবাসীরা পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসে বিরোধী শক্তিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করত না। সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের গতিবিধি এত দ্রুত ছিল যে ইংরেজ সৈন্য এদের অনুসরণ করে ধরতে পারত না। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের দুর্দশার কাহিনী থেকে তা বুঝতে পারি। তিনি যখন সৈন্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে গেছেন তখন শত্রুর কোনো সন্ধান পান নি, পরে দেখা গেল তারা ময়মনসিংহ অঞ্চলে। গোড়ার দিকে এদের উৎপাত কম ছিল, কিন্তু ১৭৭২-১৭৭৪ সালে উপদ্রব তীব্র হয়।[১] শেষ পর্যন্ত টমাস ডগলাস, এডওয়ার্ড এদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। আমরা বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য থেকে উপন্যাসের যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে তিনি প্রচুর পরিবর্তন সাধন করেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের উচ্চ আদর্শ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। দেশপ্রীতি কিংবা গীতোক্ত ধর্মের বিন্দুমাত্র স্পর্শ তাদের চরিত্রে দেখা যায় না। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নবাব এবং ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ছিল। যাঁরা মনে করেন বঙ্কিম ভ্রান্ত আদর্শ প্রণোদিত হয়ে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের শক্তি ও সাহসকে অযথা বড়ো করে দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। রায় সাহেব যামিনীমোহন সরকারী রিপোর্ট থেকে এই সন্ন্যাসী এবং ফকির-সম্প্রদায়ের যে ইতিবৃত্ত সংকলন করেছেন তাতেই প্রমাণিত হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অলীক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক যে ভাববস্তুটি এদের উপর আরোপ করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা কালে দেখেছি অনেক লেখকই সমকালীন আদর্শ অতীতের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে জাতির পিপাসা মেটাতে চেয়েছেন।

১. Rai Saheb Jamini Mohan Ghosh, ***Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal***

বঙ্কিমচন্দ্রই তাব সার্থক উদ্ভাবয়িতা। আনন্দমঠেব পবিকল্পনাতে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে আর এক দিক থেকে প্রভূত সাহায্যকবেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। ঠিক কথা। কিন্তু **ইতিহাসের অবতারণা হল কেন?** প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্র **সমসাময়িক জীবনে তেমন কোনো মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান নি যার দ্বারা তাঁর ভাবপ্রকাশের সুযোগ হতে পারে।** দ্বিতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসেব জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই কাল ছিল অবাজকতাব। এই অরাজকতাই বিদ্রোহেব জন্ম দেয়।[১] সন্তান-সম্প্রদাযেব বীবত্বেব বর্ণনায় ক্রমবিকাশটি বঙ্কিমচন্দ্র দেখান নি সত্য কথা, কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহেব কাবণটি নিরূপণ কবাব চেষ্টা কবছেন। আনন্দমঠে সন্তান-সম্প্রদাযেব বাসস্থান যে জঙ্গলপবিকীর্ণ জাযগায় নির্বাচন কবা হয়েছে তাও অযথার্থ নয়। সত্যই সন্ন্যাসীবা জঙ্গলে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতেন। ছিযাত্তবেব মন্বন্তবেব ফলে দেশে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তাই ধূমাযিত হযে বিদ্রোহে পবিণত হল। ছিয়াত্তবেব মন্বন্তবেব জ্বালা এবং দ্বৈত শাসনেব বিরুদ্ধে দেশবাসীব অসন্তোষকে একসূত্রে স্থাপন কবে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন কবেছেন তা তাঁব দূবদর্শিতাব পবিচয়। সিপাহী বিদ্রোহেব ফলে মহাবাণীর শাসন। ছিযাত্তবেব মন্বন্তবেব ফলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং দ্বৈতশাসনেব অবসান। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন,

'৮৮ বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যেমন ব্রিটিশ কোম্পানীকে সরিযে সরাসরি ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন সেরূপ ১৭৭২ সালে কোম্পানীর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা স্থলে নিজেই শাসন করবেন স্থির কবলেন। ছিযাত্তরের মন্বন্তরের কালেই এমন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।'[২]

এই প্রসঙ্গে আবও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সাধাবণেব মনোবৃত্তিকে দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জনতাব দৃশ্যগুলিতে লুটেবা সম্প্রদায়ের যে কোনো উচ্চাদর্শ ছিল না, তাবা যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থেব দ্বাবাই পবিচালিত হত

---

১ সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনাযকরূপে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (Famine more famine···· ·) সে কথা স্মরণ আছে।

২. ইতিহাস, ১০ম খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ছিযাত্তরেব মন্বন্তর এই নামে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ইতিহাস পত্রিকায় পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। কৌতূহলী পাঠককে প্রবন্ধ দুটি পডতে অনুরোধ করি। The number of spinners was greatly reduced by the famine of 1770, with the result that the yarn was 25 p. c. dearer than formerly. *The famine of 1770 could not interrupt this moneymaking at the expense of the Company and the weaver. *The famine of 1770 gave a great blow to the cotton weaving industry of Bengal. The spinners the weavers and the cotton growers died in large number. The cultivation of mulberry suffered very much as a consequence of the famine of 1770.—N. K. Sinha : *Economic History of Bengal, Vol. I*

সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সুতরাং আনন্দমঠে ইতিহাস গৌণ বটে, কিন্তু ইতিহাসই যে বঙ্কিমের পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ইতিহাসের কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠককে W. Hunter-এব *Annals of Rural Bengal, Vol. I* এবং যামিনীমোহন ঘোষের *Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করি। বাঙালির বাহুবলের অভাব আছে এ তিনি বিশ্বাস করতেন না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে বহু বাঙালি জমিদার ডাকাতদের আশ্রয় দিত সে সংবাদ সরকাবী বিপোর্ট থেকে জানা যায়। মহেন্দ্রের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ইতিহাসেব নজিবেই পরিকল্পিত। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপেব সমরস্পৃহার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রেব চবিত্রে সে বস্তুই পরিস্ফুট কবেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন যুগপবিবেশটি অক্ষুন্ন বাখবাব চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু প্রথমে বীবভূমকে ঘটনাস্থল নির্বাচন কবে এবং পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে ঘটনাসংস্থান পরিবর্তিত করাতে উপন্যাসেব ভৌগোলিক বিবরণ কিছু পবিমাণে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। সেজন্যে আনন্দমঠেব পঞ্চম সংস্কবণে স্থানীয় বিবরণ কিঞ্চিৎ কম। কিন্তু দুর্ভিক্ষেব বর্ণনা, রেশম কুঠিব বিবরণ এবং অবাজকতাব সংবাদ ইত্যাদিতে কালগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন। গোরুব গাড়িতে টাকা পাঠানোব ঘটনাটিতে সেযুগেব বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন বয়েছে।

সত্যানন্দ আদর্শমহিমাব প্রতীক। শান্তি বোমান্স-বাজ্যের অধিবাসিনী। কিন্তু সে পুথিব জগতের চরিত্র নয়। ধনুকে ছিলা পরানো, কিংবা ইংরেজ সৈন্যেব কাছে তাব অকুতোভযতা চমকপ্রদ এবং বোমাঞ্চকব সন্দেহ নেই তথাপি জীবানন্দের প্রতি তাব আসক্তি এবং জীবানন্দেব আকর্ষণে আনন্দসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াব মধ্যে শান্তির মানবিক গুণ রক্ষিত হয়েছে। ভবানন্দেব পদস্খলন চিত্র যেমন স্বাভাবিক, অনুতাপজনিত আত্মবিসর্জন তেমনি মর্মস্পর্শী। চরিত্র-পরিকল্পনায় আনন্দমঠের বিশেষত্ব খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ সে দিকে ইঙ্গিত কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে চন্দ্রনাথ বসু যা বলেছেন বাংলার পাঠক আনন্দমঠকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছিল। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন,

'আনন্দমঠের কার্য সচরাচর সংসারধর্মের কার্য নয়—আনন্দমঠের ছবি সংসারধর্মের ছবি নয়। আনন্দমঠের কার্য একটি বিশেষ কার্য, সচরাচর বা every-day lifeএ মানুষ যে কার্য করে না সেই কার্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রভাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা—এই কার্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য নাই—তাহারা যতক্ষণ আমাদের সামনে আছে ততক্ষণ তাহাদের সেই

একমাত্র কার্য—সেই কার্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে—সে কার্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটিমাত্র ব্যক্তিস্বরূপ হইযা উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই।'১

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমশিষ্য। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেবও আনন্দমঠ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথেব অভিযোগকে অস্বীকার কবতে পারা যায় না। আনন্দমঠ উপন্যাস নিশ্চয়ই। কিন্তু কাহিনী বা চবিত্র-পরিকল্পনায় আনন্দমঠ উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বঞ্চিত। একটা Idea-র বস্তুরূপ আনন্দমঠ উপন্যাস।

দেবী চৌধুরানী

আনন্দমঠ বচনা শেষ কবেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুবানী' প্রকাশ কবতে আরম্ভ কবেন। উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত হযেছিল। প্রথম সংস্করণ আনন্দমঠেব সমাপ্তি ছিল এইবকম—

'বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তথন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিযা গিযাছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।'

সত্যানন্দকে চিকিৎসক বুঝিযেছিলেন আব বিদ্রোহে প্রযোজন নেই। ইংরেজ দ্বাবা হিন্দুব জ্ঞানাত্মক ধর্মেব সঙ্গে পাশ্চাত্যেব বহির্বিষযক জ্ঞান ভাবতে প্রচাবিত হলে পুনরায় হিন্দুধর্ম স্থাপিত হবে। তবে **সত্যানন্দ যে বিদ্রোহের সুচনা করেছিলেন তা সহজে নেবে নি। বঙ্কিমচন্দ্র তারই কথা 'দেবী চৌধুরানী'তে প্রকাশ করলেন। ভবানী পাঠক, রঙ্গরাজ, নিশি এবং প্রফুল্ল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ভাবনার প্রতীক।**

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবানীব ভূমিকা কবেছিলেন 'ক্ষুদ্রকথা' বাজসিংহ বডো গল্পে। ডাকাত মানিকলালকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে প্রচার কবতে চেয়েছিলেন ১২৮৪-১২৮৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু এ বিষয়ে জনমত কিছুটা বঙ্কিম-বিরোধী ছিল। তথাপি ডাকাত মানিকলাল তাব লঘুচিত্ততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসামান্য প্রভুভক্তি এবং দেশসেবাব আদর্শ নিয়ে আত্মপ্রকাশ

১. ১২৯১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৪৪

করেছিল ১২৮৮ সালে। তার আগেই আনন্দমঠ বার হতে আরম্ভ হয়েছে বঙ্গদর্শন কাগজে। বীজটি উপ্ত হযেছিল 'বাজসিংহে'। বস্তুত 'ক্ষুদ্র কথা' রাজসিংহের কেন্দ্রীয় চবিত্র মানিকলাল। তাবই চূড়ান্ত রূপ রঙ্গরাজ এমন-কি ভবানী পাঠক।

বায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষেব *Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থে সন্ন্যাসী ফকিবের উপদ্রবের কথা আছে। সে উপদ্রব সম্পূর্ণ মিটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেযের দিকে। দেশে যখন শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল তখন ডাকাতদেব অত্যাচাব অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। দেবীসিংহের অত্যাচার-কাহিনী চণ্ডীচবণ সেনেব উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও দেবীসিংহের কথা বলেছেন সবিস্তাবে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব ডাকাতদের কথা বলেছেন তাবা দেবীসিংহেব অত্যাচাব নিবাবণে কতটা সক্ষম হযেছিল সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। **বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকাতসম্প্রদায় ডাকাতিবিত্তার নৃশংসতাটুকু বর্জন করেছে। ফলে অনেক সময়েই এদের ডাকাত বলে চেনা যায় না।** দস্যু মানিকলালেব যেমন বাজসিংহের সংস্পর্শে এসে পবিবর্তন হযেছিল অথবা দস্যু বত্নাকবেব যেমন শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রেব ডাকাতদেবও সেবকম মনোভাব লক্ষ্য করি। এদের আচাব-আচরণে ডাকাতিশাস্ত্রেব নিদর্শন নেই। কেবল **রঙ্গরাজের** আবির্ভাবে মাঝে মাঝে এদেব স্বরূপটি চিনিয়ে দেয়। কিন্তু সেও ভবানী পাঠকের কাছে যেন মন্ত্রশান্ত। সেই তুলনায় মানিকলাল সজীব। দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্ম যে কিঞ্চিৎ ভাঁটাব দিকে এ থেকেও তা বোঝা যায়।

সত্যানন্দ যে আগুন জ্বেলেছিলেন তা যে অনেকদিন পর্যন্ত নেবে নি তার কাবণ কোম্পানি-শাসন তখন পর্যন্ত দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। এক দিকে দিল্লীব রাজনৈতিক পটভূমিতে শূন্যতা, অন্য দিকে নবাবী আমলের ভগ্নদশার একটি বাস্তব চিত্র দিয়েছেন আচার্য যতুনাথ সরকার মহাশয় দেবী চৌধুরানীব ঐতিহাসিক ভূমিকায়,

'মিব কাসিমের বর্দ্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল। তখন সরকারী তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পুরণের জন্য লুট আরম্ভ করিয়া দিল।'১

বঙ্কিমচন্দ্র সবকাবী কর্মচাবী ছিলেন। মাবপিটের কিছু কিছু সংবাদ তিনিও জানতেন। বঙ্কিম সয়ের মতাক্ষরীণ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। নিপীড়িত বাঙালির এই দুর্ভাগ্যের বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেছিল নিশ্চয়ই।

১. দেবী চৌধুরানী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

এই কারণেই আনন্দমঠ লেখার পরেও দেশের অবর্ণনীয় দুঃখ বলবাব আগ্রহ তিনি বোধ করেছিলেন। আবার ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন তিনি। W. Hunter-এর *Statistical Account*-এ কিছু সংবাদও পেলেন। সামান্য তথ্য থেকে তিনি কাহিনী রচনা করলেন। সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ভবানী পাঠক নামে একজন ডাকাত তাব অনুচব পরিবেষ্টিত হয়ে ডাকাতি করত। লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান ভবানী পাঠককে নিহত কবেন। একজন বানী ডাকাত ছিল দেবী চৌধুবানী। সে বজবায় বাস কবত। তাব অনেক বরকন্দাজ ছিল। এই তথ্যকে অবলম্বন কবে উপন্যাস বচনা কবা যায, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা কবা যায না। আর ইতিহাসের প্রভাবও দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপর বিশেষ দেখা যায় না। স্থানকালপাত্র সেই যুগেব। আধুনিককালের সাহিত্যেব পবিভাষায এই কারণে অনেকে দেবী চৌধুবানীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুবানী রচনাব সময়ে ধর্মবিষয়ক চিন্তায় মনোনিবেশ কবে-ছিলেন। হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে ধর্মচিন্তা নিয়ে যে বাদানুবাদ হয় তারও কিছু প্রভাব এই উপন্যাসে থাকবার কথা। অনুশীলনতত্ত্বের ভাষ্য হিসেবেও ওই উপন্যাসগুলি (আনন্দমঠ দেবী চৌধুরানী সীতারাম রাজসিংহ) বিবেচ্য। দেবী চৌধুরানীতেও বঙ্কিমচন্দ্র গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উপন্যাসে প্রফুল্লের শিক্ষারম্ভ এবং শিক্ষাসমাপ্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শান্তি এই শিক্ষা পেয়েছিল পরোক্ষভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেবীব শিক্ষাকে সুস্পষ্ট আকার (systematic) দিলেন। ইংবেজের সৈন্য আক্রমণ কবাব পূর্বে দেবীর নিশির সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা পাঠকেব উদ্দেশ্যে রচিত। প্রবন্ধগুলিতে তিনি যা বলেছেন তারই সারসংকলন কবেছেন দেবীর উক্তিতে। প্রফুল্লের শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র জঙ্গলে সমাধা করেছেন। লোকালয়ে সে শিক্ষা যে সম্ভব নয় সীতারামে শ্রী তার প্রমাণ। ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল বোধ করি এইখানে। ব্রজেশ্বরের তিন স্ত্রীর মধ্যে প্রফুল্ল ছিল হতভাগ্য। ঘটনার টানাপোড়েনে সে-ই দেবীতে রূপান্তরিত হল। সে-ই নিষ্কাম ধর্মেব শিক্ষাব দায়িত্ব বহন কবলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে দেশচর্চার বর্ণনা কেবলমাত্র দেশ উদ্ধারের উন্মাদনাতেই নয়, সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত

করার মহতী প্রেরণাতেও সমান উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন নিষ্কাম ধর্মের গ্রহণে যেমন বীরত্ব, শৌর্য আদর্শভূমিতে স্থাপিত হয় সেরকম পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধিও রক্ষিত হয়। শান্তি-জীবানন্দ আসক্তি ত্যাগ করতে পাবে নি, ভবানন্দ কল্যাণীর মোহে মুগ্ধ। উচ্চাদর্শেব মধ্যে এইগুলি ছিদ্রপথ। এই বন্ধ্রপথেই শনি প্রবেশ করে। আনন্দ-মঠে হয়েছিলও তাই। দেবী চৌধুরানীতে তাব একটা সমাধান দেবার চেষ্টা কবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রফুল্ল ফিরে এল বটে। কিন্তু তখন সে নিষ্কাম ধর্মেব প্রতীক।

ধর্মতত্ত্বই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বস্তু; সে সম্বন্ধে দ্বিধাব কারণ দেখি না। কিন্তু এই উপন্যাসে **শিল্পী বঙ্কিমের কোনো ভূমিকাই কি নেই?** প্রফুল্লব সাংসাবিক জীবনের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ, স্বামিগৃহে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে একরাত্রি বাস তাব নাবীজীবনেব ব্যাকুলতাকে স্পষ্ট কবেছে। নিষ্কাম ধর্মেব শিক্ষার মধ্যেও সে মাছ খেতে ভোলে নি। এ সংস্কার মজ্জাগত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। নিশির সঙ্গে সংলাপেব মাঝে মাঝে তাব যে চকিত মূর্তিটি দেখি তাতে অশ্রুসজল প্রফুল্লই **ধর্মের তত্ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ জীবনে এসে দাঁড়ায়।** বঙ্কিম নিষ্কামধর্মেব আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কববাব সময়েও প্রফুল্লব বাস্তব পবিবেশটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন সে কথা বুঝতে পাবি।

ব্রজেশ্বরের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃধর্ম এবং স্ত্রীব প্রতি আকর্ষণেব দোলায় চলচিত্ততা পরিস্ফুট কবেছেন। হববল্লভ সেকালেব জমিদার। দেবীসিংহেব পাশবিক অত্যাচাবেব বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্কবণ হরবল্লভ। হববল্লভের প্রফুল্লব প্রতি নির্দয় আচরণ, দেবীসিংহেব অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পুত্রকে সাগব-বৌয়েব বাড়ি অর্থ সংগ্রহেব জন্যে পাঠানো, ইংরেজদেব সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রফুল্লব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নিশিব কাছে কাপুরুষোচিত আচরণ বাস্তবধর্মী উপন্যাসেব সার্থক চবিত্রচিত্রণকে স্মবণ করিয়ে দেয়।

দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। প্রফুল্লর ধনলাভ ঘটনাটি রূপকথাকে স্মবণ কবিয়ে দেয। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তৎকালীন যে রূপটি বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়েছেন তাও লক্ষণীয়। বৈষ্ণব ধর্মের এই অবক্রমণের দিকটিকেই আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম বিশদ করেছিলেন। ভবানী পাঠকেব আহ্বানে হঠাৎ দস্যুদেব আবির্ভাব নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে। নিশীথে গুহার মধ্যে একলিঙ্গেব মন্দিবে প্রফুল্লর প্রবেশ ঘটনাটি মাধবীকঙ্কণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবীর নৌযুদ্ধ যে একেবাবে অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে

সে কথা আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকায় উদাহরণ সহযোগে বলেছেন। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসেও যে বাঙালির বাহুবলের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ আছে সে কথা জানতে পারি বঙ্কিমের ঈষৎ যষ্টি প্রশস্তিতে। কিন্তু লাঠির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিরও যে একটি কল্যাণের দিক আছে সে কথা বঙ্কিম দেবীর দরবার প্রসঙ্গে বলেছেন।

দেবী চৌধুরানী লেখবার সময়ে কিংবা তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র রংপুর অঞ্চল ঘুরে এসেছিলেন এই সংবাদটি উপন্যাসে পাচ্ছি। কোনো জীবনীতে এ সংবাদ পাই নি। অংশটি উদ্ধার করি—

'দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইযা তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।'[১]

এই দীর্ঘ উক্তি থেকে আমরা জানতে পারছি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী লেখবার আগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ডাকাইত সম্বন্ধে বঙ্কিমের কোনো মোহ ছিল না। কেননা স্বয়ং বিচারকের আসনে বসে তিনি ডাকাইতদের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু সেকালের ডাকাইতি সম্বন্ধে তাঁর ভিন্ন ধারণা ছিল। এ কালের পাঠকের জন্য তিনি তাই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে আর একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন।[২] প্রফুল্ল যে প্রচুর ধন পেয়েছিল তার কারণ নীলাম্বর নামে এক রাজা পাঠান অত্যাচার ভয়ে তাঁর ধনসম্পত্তি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই ধনই প্রফুল্ল লাভ করেছিল। কিংবদন্তীমূলক এই কাহিনীটি কোনো সূত্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন।

দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে অতীতকে চিত্রিত করেছেন তা খুব দূরের নয়। ত্রিস্রোতা নদীর বর্ণনায়, দেবীর দরবারের বিশাল জনতার দৃশ্যে, সেকালের

১. দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ
২. দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড নবম পরিচ্ছেদ

বজরার নিখুঁত চিত্রে, দেবীর ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি অঙ্কনে, রোম্যান্টিক পরিবেশটি বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখবাব চেষ্টা কবেছেন। সেকালে দেবী চৌধুরানীর ভয়ে জনসাধারণ যে কিরূপ ভীত ছিল তার একটি উদাহরণ পাই সাগর-বৌয়ের পরিচারিকার আচরণে। দেবী চৌধুবানীর কীর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসেব পাতায় স্থান দিয়ে সে যুগের পাঠকদের কৌতূহল মিটিয়েছিলেন। পাঠকদেব যে এ-সব ইতিহাস জানবাব আগ্রহ ছিল সে কথা বুঝতে পারি এ সময়েব বিখ্যাত ডাকাত শাহ মজনু সম্বন্ধে বচিত একজন কবিব রচনা থেকে। পঞ্চানন দাসেব মজনুব কবিতাটি (১২২০) যামিনীমোহন ঘোষ তাঁর গ্রন্থে সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন।

সীতারাম

সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রেব সর্বশেষ উপন্যাস।[১] উপন্যাসটি প্রচাব পত্রিকায় ১২৯১ সালে ধাবাবাহিক বাব হতে থাকে। সীতারামও অনুশীলনতত্ত্বের অন্যতম ফল মাত্র। চন্দ্রশেখব থেকে দেবী চৌধুবানী পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসেব যে অংশটিব উপব আলোকপাত করেছেন তা হচ্ছে ইংবেজ কর্তৃক বঙ্গবিজযেব পববর্তী ঘটনা। সীতারামেব ঘটনাস্থল বাংলাদেশেই বটে, কিন্তু কাল পবিবর্তিত। মুর্শিদ-কুলী খাঁর রাজত্বে সীতাবামেব আবির্ভাব। সে কালেব বিশিষ্ট পবিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব ধ্যানাদর্শকে রূপ দিতে চাইলেন। চন্দ্রশেখবে তিনি বাঙালি বীবেব চিত্র বচনা করলেন বটে কিন্তু সেখানে প্রণয়দ্বন্দ্বই মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল। আনন্দমঠেই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশচচাব উদ্দাব আশ্বাস ধ্বনিত হল। বাঙালিব বীবত্বের নিদর্শনও স্থাপিত হল। দেবী চৌধুবানীতে বঙ্কিম তত্ত্বচিন্তায় এত বেশি আবিষ্ট যে বাঙালির বীরত্বের ভূমিকা থাকলেও তা মনোযোগেব অভাবে তেমন পরিস্ফুট হয় নি। আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়েব কর্তব্য ছিল বাজ্য স্থাপন নয়, দেশেব অনাচাব অবিচার দূব কবা। দেবী চৌধুরানীব মর্মবাণীও এক দিক থেকে তাই। কিন্তু বঙ্কিম তাঁব Ideaকে তখন পর্যন্ত পবিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি। সেজন্য তিনি আরও একটু অতীতে দৃষ্টি স্থাপিত কবলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা চলত, কিন্তু তাব প্রবল বাধা প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় গ্রন্থ। সুতবাং ইতিহাসে যে বীর নিজের রাজ্য সংরক্ষণে তৎপরতা

১. 'পুনঃ প্রণীত' রাজসিংহকে বাদ দিলে
স্মরণ করিয়ে দেয়। [illegible]

দেখিয়েছিলেন, যিনি কিছু পরিমাণে নবাবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন তাঁকেই বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সঙ্গে প্রবল ধর্মীয় চেতনা এবং দেশচর্চার বীজটি যুক্ত করে দিয়ে বঙ্কিম তাঁর অভীপ্সার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি বিধান করলেন। কথঞ্চিৎ তৃপ্তি এজন্য বলছি যে সীতারাম উপন্যাসেও তিনি পরিকল্পনাটিকে সার্থক করতে পারেন নি। সে সার্থকতা এসেছিল রাজসিংহ উপন্যাসে। এ যেন অনেকটা মধুসূদনের মতো আক্ষেপ। মধুসূদন একটি রীতিমত মহাকাব্য রচনার জন্যে বিষয়বস্তু খুঁজেছিলেন কিন্তু পান নি। রামচন্দ্রকে প্রশ্রেয় নায়ক করতে পারলেন না কেননা রামচন্দ্রের অনুচরবৃন্দ বানর। মাইকেল যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও যেন এক-একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাইকেলের কাব্য ট্রাজেডির সুরে ধ্বনিত হয়েছে, বঙ্কিমের সীতারামও তাই।

সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের আরম্ভে গীতার শ্লোক উদ্ধারই তার প্রমাণ। এমন-কি সীতারামের শেষ যুদ্ধে যোগদান গীতার বাণী স্মরণ করেই। শ্রী-জয়ন্তী গীতার ধর্মতত্ত্বের মানুষী রূপ। প্রফুল্লর সঙ্গে জয়ন্তীর সাধর্ম্য দাবি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে।

'এখন, যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।'[১]

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যদি আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুরানীর অন্যতম ফলশ্রুতি হয় তবে সীতারামের ফলশ্রুতিও তাই।

দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্মের দীক্ষা দেবার পূর্বে একবার বলেছিলেন প্রফুল্ল পুরুষ হলেই ভালো হত। বঙ্কিমচন্দ্র এ উক্তির দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বলা কঠিন। তবে একটি পুরুষের মধ্য দিয়ে নিষ্কাম ধর্মের অভাবে কি প্রলয় ঘটতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তার চিত্র এঁকেছেন সীতারাম উপন্যাসে। ধর্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কর্মে সাফল্য লাভ করা যেমন ধর্মের মহিমাকে সূচিত করে তেমনি **ধর্মবোধের অভাবে কোনো চরিত্রের পতন হলে ধর্মের অভ্রান্ততাই প্রমাণিত হয়।** দেবী চৌধুরানী প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত, **সীতারাম দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্তস্থল।**

জ্যোতিষে-বঙ্কিমচন্দ্রের যে অপরিসীম আস্থা ছিল তার প্রমাণ পাই জয়ন্তী-

১. সীতারাম, প্রথম সংস্করণ

শ্রী-চরিত্র জ্যোতিষগণনাব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ব্যাপারে। জয়ন্তী-শ্রীর মন্ত্রপূত ত্রিশূল বঙ্কিমেব হিন্দুধর্মেব প্রতি অসীম বিশ্বাসেব সূচক।

বঙ্কিমচন্দ্র সীতাবাম উপন্যাসে সীতাবামেব বাজ্য জয় উপলক্ষে তৎকালীন দেশেব যে পবিচয দিয়েছেন তা মুসলমান ঐতিহাসিকদেব ইতিহাস থেকে পবিকল্পিত। স্টুয়ার্টেব *History of Bengal*-এ এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তাও বঙ্কিমচন্দ্রেব দেশ-কাল-পাত্র বচনায সাহায্য কবেছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন মুর্শিদ-কুলী খাঁ সিবাজদ্দৌল্লাব চাইতেও নিষ্ঠুব ছিলেন। এ কথা অতিবঞ্জন নয। মুর্শিদ-কুলী খাঁ দিল্লীব বাদশাব আদেশক্রমে কার্যত বাংলাব সর্বময কর্তা হযে উঠে শোষণেব নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কাব কবতে লাগলেন। স্টুয়ার্ট যে বিববণ দিযেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।[১]

নবাব হযেই মুর্শিদ-কুলী হিন্দু জমিদাবেব উপব অত্যাচাব আবম্ভ কবলেন। তিনি জমিদাবদেব কডা নজবে বাখতেন এবং আমিনদেব দ্বাবা প্রত্যেক কৃষকেব কাছ থেকে কব আদায কবতেন। তিনি জমিগুলিকে পুনবায মাপাব বন্দোবস্ত কবলেন। জমিদাবদেব কাছ থেকে জমি কেডে নিয়ে কৃষকদেব জমি দেবাব বন্দোবস্ত কবলেন। কেবলমাত্র বীবভূমেব জমিদাব আদম আল্লা মুর্শিদ-কুলী খাঁব অত্যাচাব থেকে মুক্ত ছিলেন। কানুনগো দর্পনাবায়ণকে মুর্শিদ-কুলী কৌশলে নিজেব অধীনে নিযে এলেন এবং পবিশেষে তাকে বাজকার্য থেকে পদচ্যুত কবেছিলেন। কিঙ্কব সেন নামে এক কর্মচাবীকে তিনি বাজকার্যে অবহেলার জন্যে মহিষেব দুধে লবণ মিশ্রিত কবে খেতে দেবাব শাস্তি দিযেছিলেন। কিঙ্কব সেন তাতেই মাবা যান। হিন্দু জমিদাবদেব পাল্কিতে চডা নিষিদ্ধ ছিল। ইচ্ছে কবলে তাবা ডুলি কিংবা চৌপাইতে আবোহণ কবতে পাবতেন। টাকা আদাযেব জন্য তিনি বাঙালি কর্মচাবীদেবই নিযুক্ত করতেন। কেননা তিনি জানতেন যে বাঙালি কর্মচাবীদেব শাস্তি দেওয়া সহজ এবং ওবা পালাতেও পাববে না। কোনো কর্মচাবী টাকা দিতে অপাবগ হলে নবাব তাকে এবং তার পবিবাবকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করতেন। নবাব কাউকেই বিশ্বাস কবতেন না। রাজস্বেব তদাবকি তিনি নিজেই রোজ করতেন। যদি তিনি দেখতেন যে কোনো জমিদার কব দিতে গাফিলতি কবছে তবে নবাব তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীকে প্রেবণ করতেন। সেই কর্মচারী যাতে কাজ শেষ করাব আগে খাওয়া-দাওয়া না করে সেজন্যে দুজন কর্মচারী তার সঙ্গে যেত। আবার সে দুজন কর্মচারী ঘুষ খেয়ে সত্য কথা না বলতে পারে

১. দ্রষ্টব্য, Stewart, *History of Bengal*, pp. 414-416

ভেবে নবাব তাদের পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। নবাবের আদেশে জমিদারদের পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, সারাদিন রোদে জমিদারদের রেখে দেওয়া হত, নগ্ন করে মারার ব্যবস্থা ছিল, এবং শীতকালে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়া হত। নবাবের আত্মীয় এবং কর্মচারী রেজা খাঁ পুকুর কেটে তাতে দুর্গন্ধ জমা করে জমিদারদের সেখানে ডুবিয়ে রাখতেন। শোনা যায় যে নবাবের আদেশে জমিদারদের পায়জামা পরিয়ে তার মধ্যে বিড়াল ঢুকিয়ে দিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হত। বাংলার জমিদারদের এই অত্যাচার নিপীড়ন করে বৈশাখ মাসের দিকে দিল্লীতে বাদশার কাছে নবাবের দেয় টাকা পাঠানো হত। রাজস্ব এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে তা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় পৌছায়। একশোটির উপর গোরুর গাড়িতে দিল্লীর বাদশার কাছে বাংলার নবাবের কর যেত। সঙ্গে থাকত তিনশো অশ্বারোহী পাঁচশো পদাতিক সৈন্য। একজন ধনাধ্যক্ষও এই টাকা নিয়ে যেতেন। টাকা ছাড়া দিল্লীর বাদশা এবং মন্ত্রীদের জন্যে নবাব হাতী, পাহাড়ী ঘোড়া, কাপড়চোপড় এবং বাংলার নানা মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন।

স্টুয়ার্ট যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ কিছু আতিশয্য নেই। সহজেই অনুমান করতে পারি মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে ভূম্যধিকারীদের কি দুরবস্থা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের ইতিহাসের যে তথ্য জানতেন পরবর্তীকালের গবেষণায়ও তা সমর্থিত হয়েছে। আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারাম উপন্যাসের ভূমিকায় সে যুগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র কাজী প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এই প্রসঙ্গটিও তাঁর ইতিহাস থেকেই পাওয়া। কাজীরা যে মধ্যযুগ থেকেই কিঞ্চিত স্বাধীন এবং উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছিলেন তা চৈতন্যদেবের কাজীদমন প্রসঙ্গ থেকেও অনুমান করতে পারি। যদুনাথ সরকার কাজীদের স্বেচ্ছাচারিতার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকায়।[১] আওরঙ্গজেব কেবলমাত্র হিন্দুদের উপরেই রাজশাসনের কঠোরতা নামিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়। শিয়া বোরা সম্প্রদায়ের উপরেও শেষ জীবনে নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ডকে লঘু পাপে গুরুদণ্ডরূপে অবিশ্বাস্য ঘটনা বলা যায় না। কেননা কাজীরা হামেশাই এমন দণ্ড দিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে সীতারামের বিষয়ে একটি প্রশ্ন আগেই সমাধান করে নিতে হয়েছিল। তিনি সীতারাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের গরমিল দেখতে

১. বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, সীতারাম

পেয়েছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন অবলম্বন করে স্টুয়ার্ট যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন তার প্রতিবাদ করে J. Westland সীতারাম সম্বন্ধে নূতন উপকরণের সাহায্যে ১৮৭৪ সালে তাঁর গ্রন্থে[১] সত্য ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন। J. Westland সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। কিছু কিছু অঞ্চল তিনি প্রত্যক্ষ করে সীতারামের ইতিহাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও খুলনা থাকার সময়ে সীতারামের রাজ্য দেখে এসেছিলেন। তিনি সীতারাম সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতে পেয়েছিলেন।

'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্প গুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ত হইয়া মাগুরায় থাকেন। তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।'[২]

এই গল্পগুলির মধ্যে কোন কোন গল্প যে বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছিলেন সে কথা আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু Westland সীতারাম সম্বন্ধে যে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন সেখানেও দেখতে পাই তিনি নানা গালগল্পকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকের জিজ্ঞাসা এবং যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থরচনায় স্টুয়ার্টের বিবরণ অপেক্ষা Westland-এর গ্রন্থকেই প্রামাণ্য করেছেন। বস্তুত Westland-এর বিবরণী জানাবার আগে সীতারাম একজন সাধারণ জমিদার রূপেই পরিচিত ছিলেন, যাঁর পেশা ছিল ডাকাতি। স্টুয়ার্ট বলেছেন, সীতারাম ছিলেন একজন উচ্ছৃঙ্খল জমিদার। তিনি কয়েকটি ডাকাত পুষতেন, তাদের কাজ ছিল পথে নদীতে ডাকাতি করা। ফৌজদারের ক্ষমতাকে না মেনে তারা লোকের গোরু পর্যন্ত চুরি করত। আবু তোরাব সীতারাম-দমনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নবাবের কাছ থেকে কোনোও সাহায্য পান নি। পরে তিনি নিজের চেষ্টায় পীর খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে দুশো সৈন্য দিয়ে সীতারাম-দমনে পাঠান। পীর খাঁ বিফল হন। আবু তোরাব অতর্কিতে সীতারামের হস্তে নিহত হন। শেষে নবাব বক্স আলি খাঁ নামে একজনকে পাঠিয়ে সীতারাম-দমন করেন। বলা বাহুল্য, স্টুয়ার্টের বিবরণে সীতারাম সম্বন্ধে উল্লসিত হবার কিছু নেই। কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতিনের (যার উপর স্টুয়ার্ট নির্ভর করেছিলেন) বিবরণ বঙ্কিমের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। না হবারই কথা। বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ইতিহাস চেয়েছিলেন।

১. *Report on the District of Jessore etc. 1874. pp. 25-38*

পরবর্তী গবেষণা তাঁকে সাহায্য করলে প্রচুর। Westland সে জন্যে বঙ্কিমের কাছে গ্রাহ্য হলেন। তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র Westland-কে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। সে বিচারের আগে Westland-এর বিবরণ কিছু কিছু উদ্ধার করি। Westland সীতারাম সম্বন্ধে দুটি বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম বিবরণে দেখি সীতারামের হরিহরনগরে ছোটো একটু তালুক ছিল। একদিন তিনি তাঁর তালুক দেখতে বার হলে তাঁর ঘোড়ার পা আটকে যায়। অনুচরদের তিনি সে জায়গা খুঁড়তে বলেন। একটু খোঁড়ার পর একটি ত্রিশূল দেখতে পেলেন, পরে আরও খুঁড়ে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আবিষ্কার করলেন। সেই থেকে সীতারামের ভাগ্য ফিরে গেল। তিনি প্রচুর লোকজন জমিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। মহম্মদ খাঁর নামে রাজধানীর নাম রাখলেন মহম্মদপুর। সেনাপতি মেনাহাতীর সাহায্যে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। পরে দুর্গনির্মাণ করে তিনি তাঁর শক্তি সামর্থ্য বাড়ালেন।

দ্বিতীয় বিবরণে জানা যায় যে এই অঞ্চলে বারোটি প্রদেশ ছিল। বারোটি প্রদেশের বারোজন জমিদার ছিল। সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সীতারাম এই সমস্ত জমিদাররা কর ইত্যাদি ঠিকমত দিচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। এই ব্যাপারে সীতারাম এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যে তিনি অতি শীঘ্রই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এবং দ্বাদশ জমিদারকে নিজের দলে আনতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। এখন নবাব সীতারামের কাছে রাজস্বের দাবি জানালেন। সীতারাম প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের প্রতিনিধি। সুতরাং নবাবকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলেন। সম্রাটকে তিনি রাজস্ব দেবেন জানালেন। কার্যত তিনি কাউকে রাজস্ব দেন নি। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে সীতারাম মহম্মদপুরে দুর্গের ভিতরে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছেন। তাঁর সৈন্যদলে আছে মেনাহাতী, বখ্তিয়ার খাঁ, মুচড়া সিং এবং গাজুব ডলন। এরা নবাবের সৈন্যকে রুখল। তখন নবাব আবু তোরাবকে পাঠান। এবারেও মেনাহাতী আবু তোরাবকে হত্যা করে নবাবসৈন্য বিতাড়ন করলে। নবাব এবারে সিংহরাম সাকে পাঠালেন। সিংহরাম মেনাহাতীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দী করল। কিন্তু মেনাহাতীকে মারতে পারল না। মেনাহাতীর শরীর মন্ত্রপূত। মেনাহাতী তাকে মারবার কৌশল বলে দিল। নবাবসৈন্য মেনাহাতীকে মেরে ফেলল। সীতারাম এই সংবাদে বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুও আসন্ন। তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। পরে তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

Westland সীতাবামেব নানা কীর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সীতাবামের দুর্গ ছিল চতুষ্কোণ। বামসাগব, সুখসাগব নামে দুটি দীঘি তিনি খনন কবেন। রাজাব কাচাবী, দোলমন্দিব, কোষাগাব, সিংহদবজা, শিবমন্দিব, তোশাখানা, লক্ষ্মীনাবাযণ মন্দিব, কৃষ্ণ মন্দিব ইত্যাদি সীতাবামেব কীর্তিব কথা স্মবণ কবিযে দেয। বথযাত্রা এবং নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদিব বর্ণনায় বুঝতে পারি লোকে তখন সীতাবামেব বাজত্বে মোটামুটি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র Westland-এব ইতিহাস পড়ে উদ্দীপ্ত হযেছিলেন। সীতাবামেব কীর্তিগাথা এতই জনপ্রিয ছিল যে কেবলমাত্র এই বিষয়বস্তু নির্বাচনেব জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় হলেন। স্বদেশেব ঠাকুবের পূজা যে জনচিত্তে আত্মমর্যাদাবোধ এনে দিতে পাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব সীতাবাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। Westland-এব ইতিহাসে আছে ঢাকাব নবাবেব কথা। বঙ্কিমচন্দ্র নবাবেব কথা না বললেও বুঝতে পাবি তিনি মুর্শিদ-কুলী খাঁব কথাই বলতে চেয়েছেন। মেনাহাতীকে ধরা সম্বন্ধে স্থানীয প্রবাদ এই যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই মেনাহাতী ধবা পডেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকাব ছিলেন তার প্রমাণ পাওযা যাবে এই ঘটনাব অভিনব রূপান্তবদানে। সামান্য এই প্রবাদকে অবলম্বন কবে তিনি গঙ্গাবাম-বমা কাহিনী বচনা কবেছেন। গঙ্গাবাম-রমা কাহিনীটি সীতাবামেব বাজ্যপতনেব একটি বিশিষ্ট ঘটনা। মেনাহাতীব পতনও তাই। মৃন্ময়েব কার্যে যে সাহস শৌর্য-বীর্যেব পবিচয পবিস্ফুট হযেছে তা মেনাহাতীব অনুরূপ। ইতিহাসেব ইঙ্গিতকে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনেব দ্বন্দ্বেব মাধ্যমে প্রকাশ কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন সীতাবাম দিল্লী গিযেছিলেন, ইতিহাসে তাব সমর্থন পাওযা যায না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপন্যাসেব প্রযোজনে সীতাবামেব দিল্লী গমন পবিকল্পিত হয়েছিল। সীতাবামেব অনুপস্থিতিতে বাজ্যে বিশৃঙ্খলাব যে সুযোগ ঘটল সীতাবাম থাকলে হযতো তা নিবাবিত হতে পাবত। প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরেব ফর্মান আনবাব জন্য দিল্লী গির্যেছিলেন এ সংবাদ আমবা জানি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাদৃশ্যেই এই কল্পনা কবেছেন। Westland-এব ইতিহাসে আমবা জানি যে সীতারাম দিল্লীশ্ববেব প্রিয়জন ছিলেন। সুতরাং এই ইঙ্গিত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যা কল্পনা কবেছেন তাতে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বিশেষ কিছু হযেছে বলে মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রচূড়ের যে কল্পনা করেছেন তা ইতিবৃত্তে উল্লিখিত যদুনাথ গাঙ্গুলীর সাদৃশ্যে।

প্রথম সংস্করণে চাঁদ শাহ ফকিরের কাহিনী কিছু বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিম কাহিনীর মূল বক্তব্যটিকে অবিকৃত রেখে চাঁদ শাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। প্রথম সংস্করণে চাঁদ শাহ ফকিরের ভূমিকা উদার। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সুরও সুস্পষ্ট আকারে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে।

'বাবা। শুনতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাহার সন্তান, উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।'১

সীতারামের রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তখন ফকির মক্কা প্রস্থান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের কথা বললেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অনুরূপ আদর্শে রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন।

রিযাজ-উস্-সালাতিন, স্টুয়ার্ট এবং Westland সকলের তথ্যে দেখতে পাই সীতারামের সঙ্গে নবাবসৈন্যের দুবার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমবার সীতারাম জয়ী হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবারের যুদ্ধ মহান গৌরবে স্থাপন করেছেন। সীতারামের প্রতিষ্ঠাও ঘটে এই যুদ্ধ জয়ে। সীতারাম যে ভাবে রাজ্য স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসসম্মত; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যকে এমন কৌশলে বর্ণনা করেছেন যে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে নি, তা একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের মহিমা পেয়েছে। এ কথা অস্বীকার করি না যে গঙ্গারাম-উদ্ধার ব্যাপারে সীতারামের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল বড়ো। তথাপি এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সমষ্টিগত প্রয়োজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সামঞ্জস্যবিধান করতে পেরেছেন। মুর্শিদ-কুলী খাঁর রাজস্ব আদায়ের সামান্য বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেশে অসন্তোষের যে বহ্নি ধূমায়িত হয়েছিল তাই গঙ্গারামবধ দৃশ্যে প্রজ্জলিত হল। কার্যকারণ শৃঙ্খলাসূত্রে বিধৃত হয়ে দৃশ্যটি বাস্তবতা এবং রোমান্সের অপরূপ সম্মিলনে মনোহর দীপ্তি লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি যে উচ্চাদর্শের স্বপ্ন দেখছিল সীতারামের উক্ত দৃশ্যটির মধ্যে তারই আংশিক রূপ দেখতে পেয়ে মুগ্ধ

১. সীতারাম, প্রথম সংস্করণ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হয়েছিল। সামান্ত একজন ভূস্বামীর এইরকম অভ্যুত্থানের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুরানীতে গল্পরসের জোগান কিঞ্চিৎ কম। ঐ দুটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার মহান্ দিকটি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রফুল্লর মধ্যে নিষ্কাম ধর্মের মহত্ত্ব আরোপ করতেই বঙ্কিমচন্দ্র উল্লাস বোধ করেছেন বেশি। কিন্তু সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আবার স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলে। 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহ এবং ইন্দিরা পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের প্রতিভা অম্লান ছিল। সীতারামের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক জাগ্রত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। যে একটি উপকাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তারও সার্থকতা বুঝতে কষ্ট হয় না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারাম-রমা কাহিনী সীতারাম উপন্যাসে স্থান পেতে পারে না বলে অভিমত দিয়েছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'ত্রয়ী'কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এই তিনটি উপন্যাসের যে তত্ত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তা অপরূপ। কিন্তু সীতারামের তত্ত্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিম-প্রতিভার শিল্পকুশলতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন বলে মনে করি। তিনি বলেছেন স্ত্রীর প্রতি মোহ যেন allegory হিসাবেও খাপ খায় না।[1] কিন্তু সীতারাম উপন্যাসের সঙ্গে দেবী চৌধুরানীর তুলনা করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। সীতারামের তিন স্ত্রী। শ্রী, নন্দা, রমা। ব্রজেশ্বরেরও তিন স্ত্রী। প্রফুল্ল, নয়ান বৌ, সাগর বৌ। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে নির্বাসন দিয়েছে, সীতারামও তাই। পিতৃবাক্য রক্ষার জন্যই শ্রী সীতারাম-সহবাস বঞ্চিতা। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের মিলটুকু যেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন তেমনি গরমিলও প্রচুর। ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ উপন্যাসে আদ্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তৃত করেছেন। ব্রজেশ্বর এজন্য অনেক সময়েই উচিত অনুচিত সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কার্যকালে কিছুই করতে পারে নি।[2] সীতারাম শ্রীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পূর্বকৃত কার্যের সমালোচনা করেছেন। শ্রীকে তিনি গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছেন। শ্রী যতই অপ্রাপণীয়

১. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী, নারায়ণ, বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা

২. সীতারামের পিতা নেই। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার সম্বন্ধে তিনি আপনার অভিমত দ্বারাই চালিত হন। প্রফুল্লর প্রতি ব্রজেশ্বরের সমবেদনা ছিল কিন্তু প্রফুল্লকে সে গৃহে স্থান দিতে পারে নি। কারণ পিতা হরবল্লভ।

হয়েছে সীতারাম ততই পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই কারণে সীতারাম উপন্যাসের গতি অসামান্য। দেবী চৌধুরানীতে এই গতি নেই। সীতারামের শ্রীর প্রতি মোহ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে পুরাতন ও নূতনের আকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

'যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা, দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা ·রমা ভাসিয়া গেল।'[১]

সীতারাম উপন্যাসে তত্ত্বচিন্তা আছে সত্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোপরি ঔপন্যাসিক। সীতারামের দোলাচলচিত্ততা, তাঁর মহৎ পিপাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন। ইতিহাসে সীতারামের পতনের যে কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কারও ঐকমত্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সীতারামের পতনের যে কারণ উপস্থিত করেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকারণ শৃঙ্খলা-সূত্রে বিধৃত। গঙ্গারাম-রমা উপাখ্যানও সীতারামের পতনের পথটিকে প্রশস্ত করে।

রমার চরিত্রে দলনীবেগমের ছায়াপাত ঘটেছে। স্বামীর মঙ্গলের জন্য দলনী রাজনীতির জটিল আবর্তে আপনার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছিল। রমাও সীতারামের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করাবার চেষ্টা করেছিল। তার সংসার ছোটো এবং তার কল্পনায় সমুদ্রের অসীমতা বা গভীরতা নেই। সীতারামের মঙ্গলের জন্য সে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র রমার চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদে। শেষ পর্যন্ত রমা যে দুঃসাহসিক কাজ করেছে তা উপন্যাসটির গতিকে বন্ধুর করে তুলে মানবরহস্যের সরুমোটা চিহ্নগুলি চিনিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। গঙ্গারামের মধ্যে যে পাপবোধ ছিল তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের দৃশ্যেই বুঝতে পারি। সুতরাং গঙ্গারামের চরিত্রও যেমন স্বাভাবিক তেমনি রমার অতর্কিত ভ্রান্তপথে পা বাড়ানো ঘটনাটিও রমার উৎকণ্ঠার প্রবল টানেই ঘটেছে। পরিশেষে যুঁই ফুলের মতো ক্ষুদ্র রমার

১. সীতারাম, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

ভূমিকায়ও বঙ্কিমচন্দ্র পলাশেব অগ্নিদীপ্তি সঞ্চাবিত করেছেন বিচারের দৃশ্যে। বমাব প্রেমেব আতিশয্যই সীতাবামকে তাব পরিণতিব দিকে আর এক পদ অগ্রসব কবে দিযেছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব কোনোও নাযিকাবই সন্তানপ্রীতি তেমন-নেই। বিষবৃক্ষে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য বস আছে। তা লঘু, স্নিগ্ধ, মনোবম। কিন্তু বাৎসল্য প্রীতি যে মাতাকে কতখানি গৌবব প্রদান কবতে পাবে বমাব ভূমিকা তাব প্রমাণ। সন্তানকে কেন্দ্র কবে বমাব মাতৃহৃদযেব যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ লক্ষ্য কবা যায় তাতে চরিত্রটিব অপরূপ মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবানী, সীতাবাম, বাজসিংহে অত্যাচাবের পট-ভূমিকায় নূতন শক্তিব অভ্যুত্থানেব কাহিনী। সীতাবামে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাচারের পটভূমিকাটি কযেকটি ইঙ্গিতেব মধ্য দিযে প্রকাশ কবেছেন। ঐ পটভূমিকাটুকু না থাকলে সীতাবামেব অভ্যুত্থান অলীক কল্পনায পর্যবসিত হত। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাজ্যগঠন তথা বাজ্যবিধিব কতগুলি চমৎকাব দৃষ্টান্ত স্থাপন কবেছেন। এ-সব বর্ণনাব মধ্যে বাস্তবতাব পবিবেশন লক্ষণীয। অবশ্য স্কটেব মতো এই বর্ণনা বিস্তৃত নয। তথাপি সীতাবাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এ-ব্যাপাবে বেশ কৃতিত্ব দেখিযেছেন। আবু তোবাব সীতাবামের বাজ্যে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী প্রজা আত্মগোপন কবে আছে লিখে পাঠালেন। আবু তোবাব যা লিখেছিলেন তা সত্যি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। সীতাবামেব বাজ্যে পলাতক প্রজাবা সকলেই সাজ বদলে ফেলল। সুতবাং সীতাবাম আবু তোবাবেব নামেব তালিকায় যে-সব ব্যক্তিব নাম আছে তাদেব খুঁজে পেলেন না। প্রজাদেব এই চাতুবী বাস্তববোধেব দ্বাবা অঙ্কিত। ইচ্ছে কবলে আবু তোবাবেব চবিত্রেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেখে সীতাবাম আবু তোবাবেব নির্দেশকে মিথ্যা বলে চালাতে পাবতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম কলাজ্ঞানেব পবিচয় দিযেছেন। জনতাব মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিমেব শিল্পকর্মেব প্রশংসা অবশ্যই কবতে হয। উড়িষ্যাব পথে জযন্তী ও শ্রী-র গমনকালে সেখানকাব জনবাসীব মন্তব্য কৌতুকজনক। সবল জনবাসীব অলৌকিকতায বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক। তোবাব খাঁ যখন সীতাবামেব বাজ্য আক্রমণ কববে ঠিক কবলে তখন প্রজাদেব আচবণ কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিযে তুলেছেন। বামচাঁদ শ্যামচাঁদ যথার্থ জনতাব প্রতিনিধি। জনতার আবও কতকগুলি দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। প্রথম গঙ্গারামের বধ্যভূমির দৃশ্য বর্ণনায়। দ্বিতীয় রমার বিচাবের দৃশ্যে, তৃতীয় জযন্তীব বেত্রাঘাতের দিনটিতে। বিশাল জনসমুদ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

করেছেন অথচ সমুদ্রের গর্জন পাঠককে শুনিয়েছেন। রমার পীড়িত থাকা কালে কবিরাজগোষ্ঠীর আচরণকে পর্যন্ত বঙ্কিম স্নিগ্ধ কৌতুকরসের সাহায্যে অঙ্কন করতে ভোলেন নি। সীতারামের রাজ্যের পতন যখন আসন্ন তখন বঙ্কিম রাজ্যবিধি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা ঐতিহাসিক বাস্তবতা এনে দিতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম সংস্করণ সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দুগৌরব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে উড়িষ্যার ভাস্কর্যশিল্পের নৈপুণ্য বর্ণনায়। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর খেদও প্রকাশ করেছেন। 'কাল বিগুণ হইলে সকলই লোপ পায়।' দেশচর্চার এই ইঙ্গিতটি লক্ষণীয়।

শ্রী-চরিত্র নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আনন্দমঠের শান্তি, দেবী চৌধুরানীর প্রফুল্ল এবং সীতারামের শ্রী রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। বাস্তব সংসারে এদের সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। এমন-কি এই জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে পাঠকের বিশ্বাসবোধও পীড়িত হয় কিঞ্চিৎ। শ্রীর চরিত্রে অবাস্তবতা আছে সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবসর নেই। শ্রী সীতারামের চরিত্রে অনেকটা নিয়তির মত।

সীতারাম উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটির নাম যথাক্রমে দিবা-গৃহিণী, সন্ধ্যা-জয়ন্তী, রাত্রি-ডাকিনী। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সীতারামের উপযুক্ত গৃহিণী ছিল না। নন্দা, রমা ব্যক্তিত্বে হেয় নয়, তাদের ত্রুটিও বিশেষ কিছু নেই। কেবলমাত্র সীতারামের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার হবার মতো চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাদের ছিল না। উপযুক্ত গৃহিণীর আবির্ভাবে সমস্ত অন্ধকার কেটে যায়, দিবালোকের দীপ্তির প্রকাশ দেখা দেয়। প্রথম খণ্ডে শ্রী-ই সীতারামের উত্থানের কারণ। সুতরাং শ্রী-ই সীতারামের উপযুক্ত গৃহিণী। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রী এবং জয়ন্তীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। তথাপি শ্রী জয়ন্তীর ছায়া মাত্র। শ্রী এবং জয়ন্তীর সহায়তায় সীতারামের রাজ্যজয় হল। কিন্তু কাহিনী তখন সূচ্যগ্রভাগে স্থাপিত। সীতারামের এত বড়ো জয়েও শান্তি নেই কেননা এত বড়ো রাজ্যের ভোগের জন্য শ্রী-র প্রয়োজন। কিন্তু শ্রী নেই। তাই এক দিক থেকে সীতারামের রাজ্যে সন্ধ্যার আলো এবং আঁধার ঘনিয়ে এলো। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ডের ঐ নাম। তৃতীয় খণ্ডে সীতারাম অধঃপতনের মুখে। শ্রী সন্ন্যাসিনী হলেও সীতারামের জীবনে তখন তার প্রভাব অনিষ্টকর। শ্রীকে যখন সীতারাম পেল তখন তাঁর মনে হয়,

'বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্তি, অবিচলিতধৈর্যসম্পন্না, অশ্রুবিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা। বুঝি এ শ্রী নহে। হায়। মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে।'[১]

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকে ডাকিনীরূপে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সীতারামের জীবনে শ্রীর প্রভাব পরবর্তীকালে ডাকিনীর প্রভাবের মতোই হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর দেখিয়েছেন। তিনটি স্তরে শ্রীর তিনরকম ভূমিকা আছে। শ্রীকে এদিক থেকে দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-পরিকল্পনা কিছুটা বোধগম্য হবে বলে মনে করি।

শ্রী এবং জয়ন্তীর মন্ত্রপূত (magnetized) ত্রিশূলের অলৌকিক মহিমা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এইটি কি সীতারাম মাটি খুঁড়ে প্রথম যে ত্রিশূল দেখেছিলেন তার সাদৃশ্যে পরিকল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র পীর বক্স খাঁ নামে নবাব-সেনাপতির সঙ্গে সীতারামের যুদ্ধ হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন এবং স্টুয়ার্টের *History of Bengal*-এ তাই আছে। Westland অন্যরকম বলেছেন। চন্দ্রচূড় এবং মৃন্ময়ের যুদ্ধকৌশলের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা।

শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদের সংলাপ কথ্যভাষাশ্রয়ী। এইটি লক্ষণীয়। সিংহ-বাহিনী শ্রী-মূর্তি রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। অনুরূপ দৃশ্য পাই যুদ্ধক্ষেত্রে চঞ্চল-কুমারীর আকস্মিক আবির্ভাবে।[২]

রাজসিংহ

'রাজসিংহ' বঙ্গদর্শনে ১২৮৪ সালের চৈত্র থেকে ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস পর্যন্ত বার হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নি। কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকেই জানতে পারি।

'এঁরা বলেন—আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটী হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।'[৩]

বন্ধুবান্ধবের ইচ্ছাতে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ করেন। পুস্তকাকারে 'রাজসিংহ' বার হয় ১২৮৮ সালে। তখন গ্রন্থের নামের নীচে ছোটো করে লেখা

১. সীতারাম, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২. দ্রষ্টব্য, রাজসিংহ

৩. বঙ্কিম প্রসঙ্গ

থাকত 'ক্ষুদ্র কথা'। রাজসিংহের এই 'ক্ষুদ্র কথা' আকারেই পর পর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৯৩ সালে 'পুনঃপ্রণীত' রাজসিংহের বৃহৎ সংস্করণ বার হল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা'র আমুল পরিবর্তন করেছিলেন এই সময়ে। রাজসিংহের এই জাতীয় পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থটি যে কেবল দীর্ঘ হয়েছে তাই নয় একটা গভীরতর ঐতিহাসিক বোধ এই উপন্যাসের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা উদ্দেশ্য (mission) সাধিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকাতে কতগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন। সে প্রসঙ্গের বিচার করি।

'সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধবাক্য খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্য কি।'

তা হলে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের জন্য যে দাবি করেছেন, সে দাবি হচ্ছে ঐতিহাসিকের। ইতিহাসের কাহিনী জাতির উত্থানপতনের বর্তমানকালকে গতিময় এবং লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে সেই ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। চঞ্চলকুমারীর এবং রাজসিংহের গুণাবলীর প্রশংসা করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সম্বন্ধে খাঁটি ইতিহাস নেই বলে আক্ষেপ করেছেন।

'ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্মরক্ষার জন্য বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই।'১

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

'আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল।'২

এই-সকল উক্তি থেকে বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে কেবলমাত্র গল্পখোর পাঠকের জন্যে রস জোগান নি, রাজসিংহ উপন্যাসে তিনি একটি জাতীয় দায়িত্ব সমাধা করতে চেয়েছিলেন। রাজসিংহ এবং আওরঙ্গজেবের যুদ্ধকে বঙ্কিমচন্দ্র মহাযুদ্ধ বলেছেন। সুতরাং পৃথিবীর মহাযুদ্ধগুলির সঙ্গে এর তুলনা করতে ভোলেন নি। উপক্রমে গ্রীক ঐতিহাসিকদের ঐতিহাসিক বিবেকের কথা উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে গ্রীক ঐতিহাসিকদের সমগোত্রীয় হতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি মন্তব্য ভূমিকা থেকে উদ্ধার করি।

---

১. রাজসিংহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ
২. ঐ পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

''ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যাযামের অভাবে মনুষ্যের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইযাছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বলবান্ ছিলেন বলিযা আমার বিশ্বাস। তবে রাজকীয় অন্যান্য গুণে তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন। যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। লক্ষ রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের শুরু করেছিলেন রোমান্সরস পরিবেশন করবার জন্যে। পরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের নবতর সম্ভাবনার দিকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত হলেন। H. Butterfield ঐতিহাসিক উপন্যাসকে এ যুগের মহাকাব্য বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মহাযুদ্ধ বর্ণনা করেছেন তাতে এ যুগের মহাকাব্য গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সে কাজে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন, সে কথা বিবেচ্য। ১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটি রচনা করেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুরা বাহুবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তাদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল না। তারা স্বতন্ত্র থাকবার জন্যে প্রত্যাশী ছিল না। কেবলমাত্র মেবার এর ব্যতিক্রম। মেবারবাসীদের স্বাধীনতাস্পৃহা মজ্জাগত। ইংরেজি ইতিহাস পড়ে আমরা এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস নেই বলেই ভারতবর্ষীয়দের বাহুবল নেই এ কথা বিদেশী ঐতিহাসিকরা প্রচার করতে সাহস পেয়েছেন। সুতরাং ভারত পরাধীন কেন তার কতক কারণ বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে উত্থাপন করেছিলেন। অপর কারণ তিনি রাজসিংহ উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। সুতরাং 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত'কে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্বও অঙ্গীকার করেছিলেন এই উপন্যাসে। উদ্ধৃত অংশে রাজসিংহকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে গ্রহণ করার কারণ বলেছেন। শিবজী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন,

'ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইযাছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিযাছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীযে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল।'

শিবজী সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই সশ্রদ্ধ উক্তির পরেও মহারাষ্ট্র নায়ককে উপন্যাসে তিনি কেন গ্রহণ করলেন না? এর একটি সঙ্গত কারণ আছে। ইতিহাসে

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত শিবজীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে' জাতীয় অভ্যুত্থানের শুভসূচনাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে Grunt Duff রচিত মারাঠা জাতির ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় তিনি রাজপুত জাতির পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে শিবজী সুচিত্রিত। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'র বেদনা বঙ্কিমচন্দ্রকে মর্মাহত করেছিল। বাহুবলে রাজপুতও যে মোগলকে বিনষ্ট করতে সক্ষম, তাদের জীবনেও যে প্রভাতসূর্যের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সে কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির একটি অভিপ্রায়কে বাণীমূর্তি দিয়েছিলেন। ভূমিকায় তিনি এ কথা বলেছেন যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুত ইতিহাসের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মত আছে। সুতরাং প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাই নি। রাজপুতজাতির বাহুবল প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, 'ক্ষুদ্র কথা'র দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। সুতরাং রাজসিংহ পুনঃপ্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সমগ্র যুদ্ধটিকে তিনি উপন্যাসে স্থান দিলেন।

ভূমিকাতে এর পর বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন তাদের বিচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-উপযোগী চরিত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে নৃত্যগীতের সমারোহ ছিল বলে বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসে আছে আওরঙ্গজেব নৃত্যগীত পছন্দ করতেন না। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

'আমার স্থির বিশ্বাস, ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।'

আওরঙ্গজেব নিজে মদ্যপান করতেন না। কিন্তু পৌরাঙ্গনাগণ যে মদ্য পান করতেন সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক নজির তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী ইতিহাস গবেষণায়ও সমর্থিত হয়েছে।

'He slept little, spent hours in devotion, confined himself to vegetable diet, and often fasted His attendants marvelled how a man of his age could endure the hard condition to which he subjected his body,'

বঙ্কিমচন্দ্র মোগল শিবিরের যে ঐশ্বর্যসমারোহপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে ইতালীয় পণ্ডিত Dr. Gamelli-Carri-র বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

'. . enclosure of the royal tents alone measured about three miles, and the whole camp, with circumference of some thirty miles had a population of half a million The separate bazars or markets numbered 250, and every class of goods, even the most costly on sale.'[১]

১. Vincent A. Smith, *The Oxford History of India*

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে এইটি বুঝতে পারি আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগত জীবনে কঠোরতা অবলম্বন করলেও রাজ্যপালন ব্যাপারে বাদশাহী সমারোহকে অশ্রদ্ধা করতেন না। বরং প্রশ্রয় দিতেন। এই থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের সম্ভাবিত সত্য বলতে দ্বিধা করি না। রাজসিংহের ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার আলোচনা করেছেন। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধারণা পোষণ করতেন আচার্য সরকার সে সম্বন্ধে বলেছেন,

'ধীরভাবে সেই যুগের সত্য ঐতিহাসিক উপাদানগুলি আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আওরংজীবের কতকগুলি গুণ ছিল বটে, কিন্তু দোষগুলি ততোধিক এবং দেশের পক্ষে, মানবের পক্ষে, স্বজাতির পক্ষে মারাত্মক। তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই, অজ্ঞ ধর্মান্ধতা দ্বারা লেশমাত্রও প্রণোদিত হন নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র যে অজ্ঞ ধর্মান্ধতা দ্বারা প্রণোদিত হন নি তার প্রমাণ রাজসিংহের উপসংহারে লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্য। পাছে কেউ রাজসিংহের মূল উদ্দেশ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন সেই কারণে উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র জুড়ে দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সমভাবাপন্ন ছিল। তার প্রমাণ পাই প্রবন্ধে আকবরের প্রশংসায়, উপন্যাসে মবারক চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে। আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে বলেছেন,

'পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, যথা, নর্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।১

বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের প্রবর্তিত জিজিয়া করের বিষময় ফল দেখিয়েছেন। এবং এই জিজিয়া করের বিরুদ্ধে রাজসিংহ যে পত্র লেখেন আওরঙ্গজেব তার সমুচিত জবাব দেন। এরই বিরুদ্ধে রাজপুত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই অন্যায় করকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি।

মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ (৪র্থ সংস্করণ) উপন্যাসখানি কৃষ্ণ-চরিত্রের অনেক পরে রচনা করেন। কৃষ্ণকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র নানা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে সত্যের আলোকে দেখতে চেয়েছিলেন সেরকম রাজসিংহকেও তিনি সত্য ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও না বললেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বঙ্কিম রাজসিংহকে জাতির ত্রাণকর্তা মনে করেছিলেন। দুষ্কৃতকারীকে সমুচিত দণ্ডবিধি দিয়ে পৃথিবীর কলঙ্ক দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন। রাজসিংহ জিজিয়া করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, চঞ্চলকুমারীকে আশ্রয় দেন। এই বীরত্ব এবং

১. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০

ন্যায়নীতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যের মধ্যে গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। এ কথা মানি, গ্রন্থের মধ্যে এই দার্শনিক মনোভাব কোথাও জোবড়া হয়ে লেগে থাকে নি। তথাপি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুধাবন করলে এই কথাই মনে হয় যে, রাজসিংহের উদ্দেশ্য 'পরিত্রাণায় চ সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করবার সম্মতি চেয়ে রাজসিংহ বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট পত্র দিয়েছিলেন। উত্তরে বিক্রম সোলাঙ্কি আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিক্রমের পত্র কিছু উদ্ধৃত করি।

'আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রীয় বীরেরা কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিতেন। ভীষ্ম, অর্জুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সে বলবীর্য কই? আপনার বাহুতে যদি বল আছে, তবে হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহ কেন? শৃগাল হইয়া সিংহের অনুকরণ করা কর্তব্য নহে।'[১]

স্পষ্টত রাজসিংহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা না থাকলেও এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারি, রাজসিংহ তাঁর বাহুবলের প্রমাণ দিয়েই বিক্রমের পত্রের জবাব দিয়েছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেমন কন্যা হরণ করেছিলেন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবার জন্যে রাজসিংহও তাই করেছেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের সহিত তৃতীয় উইলিয়মের তুলনা করেছেন। ওলন্দাজ তৃতীয় উইলিয়মের শৌর্যবীর্যের কাহিনী সুপরিচিত। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন অসামান্য শক্তির দ্বারা। তৃতীয় উইলিয়মের সঙ্গে তুলনা করার আর-একটি সার্থকতা এই যে তৃতীয় উইলিয়ম ধর্মে সমদর্শী ছিলেন। সে কথা ঐতিহাসিক বলেছেন:

'But in practice the policy of William and the spirit of the times secured for them a considerable degree of free religious worship in England, the infamous penal laws were usually inoperative and were only brought into partial vigours in times Jacobite of insurrection, worship in private houses was hardly ever interfered with, and public chapels were erected and priests often went about openly in spite of the laws. In the favourable atmosphere of the new age, the spirit of the Toleration Act was practised much more widely than the latter warranted '[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র এই উদারনীতি প্রার্থনা করেছিলেন। সেজন্যে বার বার বলেছেন,

কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।'[৪]

---

১. রাজসিংহ, পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২ 'তুমি যদি রুক্মিণী হইতে পার, যদুপতি আসিয়া অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন', রাজসিংহ

৩ G. M Trevelyan, *History of England* (New Impression)

৪ রাজসিংহ, উপসংহার

কিন্তু বঙ্কিম রাজসিংহ উপন্যাসে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে অন্তত একটি ঐতিহাসিক ভুল করেছেন। আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে আওরঙ্গজেবের একমাত্র পত্নী ছিলেন নবাব বাঈ। আওরঙ্গজেব কোনো যোধপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নি। উদিপুরী যে আওরঙ্গজেবের পত্নী ছিলেন সে সংবাদ বঙ্কিমচন্দ্র অর্মের ইতিহাসে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের তথ্যে আরও কয়েকটি ভুল আছে সেগুলি আচার্য সরকার বিচার করেছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজ-আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' তখন বার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'তে রাজার আদর্শ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজ-আদর্শ একটা idea—তা ধ্যানগম্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে আদর্শরাজার পরিকল্পনা করেছেন। পঞ্চম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের রাজ্যশাসন প্রণালীর সমালোচনা করেছেন। রাজসিংহের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পৈশাচিক অভিযানকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন নি। তাই তিনি রাজসিংহের সমরসজ্জাকে পাশ্চাত্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৌর্যে বীর্যে রাজনীতিতে বিচক্ষণ রাজ-আদর্শের পক্ষপাতী। তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজার আদর্শ থেমিস্টোক্লিস, উইলিয়ম ইত্যাদি। যে রাজার হৃদয় নির্মম, প্রজার জন্যে আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ, অত্যাচারে, নিপীড়নে আপন ঐশ্বর্যের চূড়া গড়ে তোলে সে রাজাকে বঙ্কিমচন্দ্র চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসার চরিত্র বিশ্লেষণের সময়ে সে কথা বলেছেন—

'সে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া শীস মহলের দর্পণে আপনার প্রতিমূর্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও রমণীর হৃদয়, স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।'১

আসলে রাজপরিবারের আদর্শই তাই হওয়া উচিত।

সীতারাম নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও সীতারামের পতনের কারণ বঙ্কিম দেখিয়েছেন। রাজসিংহের কাছেও সে প্রলোভন এসেছিল। কিন্তু রাজসিংহ সে প্রলোভন জয় করেছিলেন। চঞ্চলকুমারীর পিতার অনুমতি ব্যতীত রাজসিংহ তাকে গ্রহণ করেন নি এবং চঞ্চলকুমারী স্বেচ্ছায় রাজসিংহের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারে এই অনুমতিও রাজসিংহ দিয়েছিলেন। উপন্যাসের দিক থেকে এই দৃশ্যগুলি যতই ফিকে মনে হোক

---

১ রাজসিংহ, অষ্টম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

না কেন বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার দিক থেকে এই তথ্যগুলি মূল্যবান।[১]

উপক্রমে বলেছি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির মূল্য বড়ো ছিল। এবং বীরপূজার আদর্শ স্থাপিত হবারও লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক নির্বাচিত করে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করে সে কথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাই দেখতে চেয়েছিলেন। এই প্রেরণা থেকেই রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বীরের আদর্শে ভূষিত করেছেন। ঐতিহাসিক উপাদান তখন পর্যন্ত যা ছিল তার নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে আদর্শ বীবরূপে আঁকতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাজপুত জাতির পতন যে কারণে ঘটে তার মধ্যে জাতিগত কৌলীন্য এবং বিদ্বেষ অন্যতম। এই সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্যই রাজপুত জাতিব পতন এ কথা ঐতিহাসিকবৃন্দ স্বীকাব কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিক্রম সোলাঙ্কির পত্রেব মধ্যে সেই দিকটির ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু রাজসিংহ যে কেবলমাত্র বাহুবলেই দুর্জয় তাই নন, তাঁরই প্রেরণায় রাজপুত মিলিত হবার চেষ্টা করেছিল। সুতবাং মহাযুদ্ধেব আদর্শ নায়ককে সংকীর্ণ বুদ্ধি ত্যাগ কবতে হবে। হল্যাণ্ডেব প্রতি যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে উইলিযম চতুর্দশ-লুইকে বাধা দিয়েছিলেন সে জ্বলন্ত দেশ-প্রেম বাজসিংহের মধ্যে ছিল। কার্লাইলেব বীরপূজাব আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলা উপন্যাসে প্রকাশ কবেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র বাজ-পুত জাতিব প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব কবেছিলেন। জগৎসিংহেব চরিত্রে সে কথা সুস্পষ্ট। বীবেন্দ্রসিংহেব মানসিংহেব প্রতি বিদ্বেষ বাজসিংহ উপন্যাসে আবও স্পষ্ট কবে দেখিয়েছেন চঞ্চলকুমাবীব চিত্রনির্বাচন প্রসঙ্গে। সে কথা বলি। চঞ্চলকুমাবী চিত্র দেখতে চাইলে প্রাচীনা বুড়ী মানসিংহ, বাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতিব চিত্র দেখালো। চঞ্চলকুমাবী বলল 'এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানেব চাকব।' চঞ্চলকুমাবীব এই উত্তরে বাজপুত জাতির গৌরব মর্যাদা রক্ষিত। বাজপুত রমণী 'বীর সম্বে বীরবালা' অথবা 'বীর ভজত যুবতী মনমে'। নির্মলকুমারীর আওবঙ্গজেবের প্রতি উক্তি চমকপ্রদ। দৃশ্যটির রোমাঞ্চকরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত জাতির

---

১. রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের কাছে সন্ধি করতে চাইলে মাণিকলাল বাধা দিয়েছিল। উত্তরে রাজসিংহ বলেছিলেন, 'হিন্দু, ক্ষুধার্তের অন্ন জোগান পরম ধর্ম বলিযা জানে। অতএব হিন্দু শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহেনা।' দয়াল সাহার প্রশ্নের উত্তরে রাজসিংহের উক্তি, 'ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্য হত্যার পর সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে।'—রাজসিংহ অষ্টম খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু বঙ্কিম রাজসিংহ উপন্যাসে আওরঙ্গজেবের চরিত্রে অন্তত একটি ঐতিহাসিক ভুল করেছেন। আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে আওরঙ্গজেবের একমাত্র পত্নী ছিলেন নবাব বাঈ। আওরঙ্গজেব কোনো যোধপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নি। উদিপুরী যে আওরঙ্গজেবের পত্নী ছিলেন সে সংবাদ বঙ্কিমচন্দ্র অর্মের ইতিহাসে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের তথ্যে আরও কয়েকটি ভুল আছে সেগুলি আচার্য সরকার বিচার করেছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজ-আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' তখন বার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি'তে রাজার আদর্শ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজ-আদর্শ একটা idea—তা ধ্যানগম্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে আদর্শরাজার পরিকল্পনা করেছেন। পঞ্চম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের রাজ্যশাসন প্রণালীর সমালোচনা করেছেন। রাজসিংহের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পৈশাচিক অভিযানকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন নি। তাই তিনি রাজসিংহের সমরসজ্জাকে পাশ্চাত্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৌর্যে বীর্যে রাজনীতিতে বিচক্ষণ রাজ-আদর্শের পক্ষপাতী। তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজার আদর্শ থেমিস্টোক্লিস, উইলিয়ম ইত্যাদি। যে রাজার হৃদয় নির্মম, প্রজার জন্যে আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ, অত্যাচারে, নিপীড়নে আপন ঐশ্বর্যের চূড়া গড়ে তোলে সে রাজাকে বঙ্কিমচন্দ্র চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসার চরিত্র বিশ্লেষণের সময়ে সে কথা বলেছেন—

'যে জেব-উন্নিসা রত্নরাশি, পুষ্পরাশিতে মণ্ডিত হইয়া শীস মহলের দর্পণে আপনার প্রতিমূর্তি দেখিয়া হাসিত, এ সে জেব-উন্নিসা নহে। যে জানিত যে, বাদশাহজাদীর জন্ম কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে। জেব-উন্নিসা বুঝিয়াছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, বাদশাহজাদীর হৃদয়ও রমণীর হৃদয়, স্নেহশূন্য নারীহৃদয়, জলশূন্য নদী মাত্র—কেবল বালুকাময় অথবা জলশূন্য তড়াগের মত—কেবল পঙ্কময়।'১

আসলে রাজপরিবারের আদর্শই তাই হওয়া উচিত।

সীতারাম নানা সদ্গুণে বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও সীতারামের পতনের কারণ বঙ্কিম দেখিয়েছেন। রাজসিংহের কাছেও সে প্রলোভন এসেছিল। কিন্তু রাজসিংহ সে প্রলোভন জয় করেছিলেন। চঞ্চলকুমারীর পিতার অনুমতি ব্যতীত রাজসিংহ তাকে গ্রহণ করেন নি এবং চঞ্চলকুমারী স্বেচ্ছায় রাজসিংহের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারে এই অনুমতিও রাজসিংহ দিয়েছিলেন। উপন্যাসের দিক থেকে এই দৃশ্যগুলি যতই ফিকে মনে হোক

১. রাজসিংহ, অষ্টম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

না কেন বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার দিক থেকে এই তথ্যগুলি মূল্যবান।[১]

উপক্রমে বলেছি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির মূল্য বড়ো ছিল। এবং বীরপূজার আদর্শ স্থাপিত হবারও লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক নির্বাচিত করে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করে সে কথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাই দেখতে চেয়েছিলেন। এই প্রেরণা থেকেই রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বীরের আদর্শে ভূষিত করেছেন। ঐতিহাসিক উপাদান তখন পর্যন্ত যা ছিল তাব নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে আদর্শ বীবরূপে আঁকতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজপুত জাতির পতন যে কারণে ঘটে তার মধ্যে জাতিগত কৌলীন্য এবং বিদ্বেষ অন্যতম। এই সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্যই রাজপুত জাতির পতন এ কথা ঐতিহাসিকবৃন্দ স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিক্রম সোলাঙ্কিব পত্রেব মধ্যে সেই দিকটিব ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু রাজসিংহ যে কেবলমাত্র বাহুবলেই দুর্জয় তাই নন, তাঁরই প্রেরণায় রাজপুত মিলিত হবাব চেষ্টা করেছিল। সুতবাং মহাযুদ্ধেব আদর্শ নায়ককে সংকীর্ণ বুদ্ধি ত্যাগ কবতে হবে। হল্যাণ্ডেব প্রতি যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে উইলিয়ম চতুর্দশ-লুইকে বাধা দিয়েছিলেন সে জ্বলন্ত দেশ-প্রেম বাজসিংহেব মধ্যে ছিল। কার্লাইলেব বীবপূজার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলা উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র রাজ-পুত জাতিব প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব কবেছিলেন। জগৎসিংহের চবিত্রে সে কথা সুস্পষ্ট। বীবেন্দ্রসিংহেব মানসিংহের প্রতি বিদ্বেষ বাজসিংহ উপন্যাসে আবও স্পষ্ট কবে দেখিয়েছেন চঞ্চলকুমাবীব চিত্রনির্বাচন প্রসঙ্গে। সে কথা বলি। চঞ্চলকুমাবী চিত্র দেখতে চাইলে প্রাচীনা বুড়ী মানসিংহ, রাজা বীরবল, বাজা জযসিংহ প্রভৃতিব চিত্র দেখালো। চঞ্চলকুমাবী বলল 'এও লইব না। এ সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।' চঞ্চলকুমাবীব এই উত্তবে রাজপুত জাতির গৌরব মর্যাদা বক্ষিত। রাজপুত রমণী 'বীব সমৃঝে বীরবালা' অথবা 'বীব ভজত যুবতী মনমে'। নির্মলকুমারীর আওবঙ্গজেবের প্রতি উক্তি চমকপ্রদ। দৃশ্যটির রোমাঞ্চকরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত জাতির

---

১. রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের কাছে সন্ধি করতে চাইলে মাণিকলাল বাধা দিয়েছিল। উত্তবে রাজসিংহ বলেছিলেন, 'হিন্দু, ক্ষুধার্তেব অন্ন জোগান পরম ধর্ম বলিযা জানে। অতএব হিন্দু শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহেনা।' দয়াল সাহার প্রশ্নের উত্তরে বাজসিংহের উক্তি, 'ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুষ্য হত্যার পব সে আশা ফলে পরিণত হইবে। কত অসংখ্য রাজপুত বিনষ্ট হইবে।'

সতীত্ববোধ, বীরত্বকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নির্মলকুমারী সমস্ত রাজপুত জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই উক্তি সর্বৈব সত্য।[১] এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর-একটি ভ্রমের কথা বলি। জেজেয়া করের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে রাজসিংহ যে পত্র লিখেছিলেন সে পত্র রাজসিংহের লেখা নয়। আচার্য যদুনাথ সরকার সে কথা প্রমাণ করেছেন।

এবারে রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিক তথ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে ব্যবহার করেছেন সে কথা আলোচনা করি। আচার্য যদুনাথ সরকার দেখিয়েছেন যে চঞ্চলকুমারীর ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করতে হয়। রাজপুত জাতির হাতে আওরঙ্গজেবের সৈন্যের লাঞ্ছনার কথাও আচার্য সরকার সবিস্তারে বলেছেন।[২] তবে আওরঙ্গজেব স্বয়ং রাজপুতদের হাতে লাঞ্ছিত হন নি এইটিই ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্কিম জ্ঞাতসারে কোনো তথ্যকে বিকৃত ব্যাখ্যা করেন নি। রাজসিংহ উপন্যাসে যে-সব তথ্য-বিভ্রান্তি আছে তা বঙ্কিমের ইচ্ছাকৃত নয়; কতকটা তথ্যের বিরলতা, কতকটা বিকৃত ইতিহাস এর জন্যে দায়ী। সে জন্যে আপাত দৃষ্টিতে রাজসিংহ পড়তে পড়তে অনেক সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব নজরে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র টডের ইতিহাস থেকে রাজসিংহ এবং আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যে তথ্য পেয়েছিলেন তাই সম্ভবত তাঁকে চঞ্চলকুমারীর দ্বারা আওরঙ্গজেবের লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করতে প্রণোদিত করেছে। এই দৃশ্যটিতে রোমান্সের দীপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে এখানে বঙ্কিমের দৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন। উদিপুরীর যে লাঞ্ছনার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা অর্মের ইতিহাস অনুযায়ী বটে, কিন্তু উদিপুরীর তামাক সাজার চিত্র অনৈতিহাসিক এবং বঙ্কিমের আচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় দেয়। আসবপানে উন্মত্তা উদিপুরীর চিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন বলে মনে করি। এই কারণেই কি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর আলমগীর নাটকে উদিপুরী এবং আওরঙ্গজেবের চরিত্রের কলঙ্ক অপনোদন করতে চেয়েছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র মোগল অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য-সমারোহের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং এই সমারোহের মধ্যে যে অন্তঃসার-শূন্যতার চিত্র এঁকেছেন, তা উপন্যাস ও ইতিহাস এই উভয় দিক থেকেই সুদূরপ্রসারী চিন্তার স্মারক। মোগল বাদশার চিত্র আঁকার সময়ে বাঙালির মনে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নবাবী আমলের ইতিবৃত্ত। প্রত্যক্ষভাবে ঔপন্যাসিকবৃন্দ এই বর্ণনার জন্যে নবাবী আমলের ইতিহাস অনুকরণ

---

[১] বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

[২] বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র দিল্লীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে ইতিহাসের বর্ণবিহ্বলতাকে কল্পনার বলে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

'এই সমস্ত একত্রিত হইয়া, নরকে নন্দনকাননের ছায়ার ন্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ জন্মাইতেছে।'

রমেশচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। রমেশচন্দ্র যেখানে তথ্যের পর তথ্য দিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে কেবলমাত্র কয়েকটি রেখায় সে কথা বলেছেন। অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য-সমারোহ এবং বহির্বঙ্গণের জাঁকজমক এই দুইয়ে মিলে বাদশাহী পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। রাজসিংহের অন্যতম আকর্ষণ যুদ্ধের দৃশ্যগুলিতে। এখানে বঙ্কিম পারস্য অধিপতি Xerxes-এর গ্রীস অভিযানের কথা স্মরণ করেছিলেন অবশ্যই। গ্রীক বীরদের অল্প সৈন্য নিয়ে Xerxes-এর বিরুদ্ধে অভিযান পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে আছে। রাজসিংহের সৈন্য অল্প ছিল। দেশ-প্রেমের উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুদ্ধ বর্ণনার প্রাক্কালে গ্রীস ইতিহাসের কথা স্মরণ করেছেন—

'যখন পারস্য পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য ছিল, তখন তদধিপতি সের (Xerxes) পঞ্চাশ লক্ষ লোক লইয়া গ্রীস নামা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন। থার্মপলিতে Leonidas সালামিসে Themistocles এবং প্লাতীয়ায় Pausanias তাঁহার গর্ব খর্ব করিয়া, তাঁহাকে দূর করিয়া দিল—শৃগাল কুক্কুরের মত সের পলাইয়া আসিলেন। সেইরূপ ঘটনা পৃথিবীতলে এই দ্বিতীয়বার মাত্র ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেনা লইয়া ভারতপতি—সেরের অপেক্ষাও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা—রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড জয় করিতে গিয়াছিলেন—রাজসিংহ তাঁহাকে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি।'১

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সেনাপতিদের ইউরোপীয় রণপণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাহুবল প্রতিপাদন করা রাজসিংহের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং গ্রন্থে যুদ্ধবর্ণনা বিস্তৃত স্থান জুড়বে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। সমগ্র রাজসিংহ উপন্যাসের মধ্যে মোট দশটি পরিচ্ছেদ যুদ্ধবর্ণনায় ব্যয়িত হয়েছে। গ্রীসদেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করবার আরও একটি কারণ আছে। রাজপুতনার ভৌগোলিক অবস্থান এবং গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে কতক সাদৃশ্য আছে, সেজন্যে থার্মপলির যুদ্ধবর্ণনা অনুসরণ করাতে বঙ্কিম সার্থকতা পেয়েছেন। উপক্রমে বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি বীরত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। স্বদেশচর্চায় বীরত্বের মহান গৌরব বাঙালির জীবনে ছিল না। বাস্তবে যা পাই নি কল্পনার জগতে তাকে প্রকাশ করে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে বাঙালিহৃদয়ের সেই পিপাসা মিটিয়েছিলেন। রাজসিংহ

১. রাজসিংহ, সপ্তম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

উপন্যাসের সাফল্যের এও একটা কারণ। বঙ্কিমের উদার কল্পনা যুদ্ধের দৃশ্যগুলিকে উজ্জ্বল এবং বাস্তব করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য বর্ণনার কিয়দংশ এখানে তুলে দিই।—

'তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে। তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা ব্যক্তিবিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।'১

যোধপুরী বেগমের দ্বারা দেবীর দৌত্য অনৈতিহাসিক। আওরঙ্গজেবের কোনো অন্তঃপুরিকার এই জাতীয় আচরণ বেমানান। যোধপুরী বেগম যে-কথা বলেছিল আসলে সেটিতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে—

'আরও বলি, ভয় নাই। দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানায় গোহত্যা হইতেছে। কোন্ রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত একত্রিত হইতেছে। উদয়পুরের রাণা, বীরপুরুষ। মোগল তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্রধারণ করেন—যদি এক দিকে শিবজী, আর এক দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয় দিন টিকিবে?'২

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনা চরিত্রোচিত হয় নি। যোধপুরী বেগমের এই উক্তি বঙ্কিমের আরোপিত—স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

তৃতীয় খণ্ডের বক ও হংসীর কথা টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত।

'The family priest (her preceptor) deemed his office honoured by being the messenger of her wishes and the billet he conveyed is incorporated in the memorial of this reign. "Is the swan to be the mate of the stork : a Rajpootani pure in blood, to be wife to the monkey-faced barbarian!" Concluding with a threat of destruction if not saved from dishonour '৩

এর সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর উক্তি তুলনীয়—

'তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া মুসলমান বানরের শয্যায় শয়ন করিব? হংসী কি বকের সেবা করে ·দিল্লীর পথে বিষ খাইব? নির্মল জানিত অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে।'৪

সুতরাং সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় এই বর্ণনা যতই অনৈতিহাসিক মনে হোক না কেন বঙ্কিমচন্দ্রকে তার জন্যে দায়ী করা যায় না।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, 'রাজসিংহ'
২ রাজসিংহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
৩. J Todd—*Rajasthan*
৪ রাজসিংহ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রের কলঙ্ক প্রকাশ করতে ত্রুটি করেন নি। উদিপুরীর নিকট সম্রাটের আত্মসমর্পণ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাদশাহের এই চরিত্র আধুনিক ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নয়। কিন্তু আচার্য সরকারও বলেছেন যে ধর্মান্ধ ওসমান খলিফার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের চরিত্র তুলনীয়। খলিফা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ বলেছেন—

The throne of an active and able prince was degraded by the useless and pernicious virtues of a bigot.'

আওরঙ্গজেবেরও কম গোঁড়ামি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র আওবঙ্গজেবের গোঁড়ামির চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু আওবঙ্গজেব সম্বন্ধে বঙ্কিম সর্বত্র গোঁড়ামির পবিচয় দিয়েছেন এও সত্য নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, আওরঙ্গজেবের চরিত্রের মধ্যে যে অসামান্য দৃঢ়তা ছিল, সংকল্পকে সিদ্ধ করার জন্য যে অনমনীয় কঠোরতা ছিল, সে কথা বঙ্কিম উল্লেখ করতে ভোলেন নি। রাণার দূত মানিকলাল আওবঙ্গজেবের নিকট যে উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিল তার অনর্ঘতা দেখে সম্রাট ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত সম্রাটেব মতো তিনি যা গ্রহণ কবলেন তা তাঁবই চবিত্রেব উপযোগী।

'প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল, একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিযা আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন।'[১]

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

'ঔরঙ্গজেব মার্ক আন্তনি বা অগ্নিবর্ণ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না।'[২]

রাজসিংহের গঠন-সুষমার কথা সকলেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাতে গঠনকৌশলের কথা অন্যতম। এখানে সে বিষয়েব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে জেবউন্নিসার ভূমিকাকে ববীন্দ্রনাথ যে গুরুত্ব দিয়েছেন সে বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।···জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনাব অংশীভূত করিযা লয় নাই, সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।'[৩]

কিন্তু আমাদের মনে হয় জেবউন্নিসার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ ক্ষীণ হলেও

---

১. রাজসিংহ, ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ
২. ঐ সপ্তম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, 'রাজসিংহ'

বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসাকে ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এক অসাধ্য সাধন করেছেন। জেবউন্নিসার চিত্তমথিত হলাহল এই মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণরূপে চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের গঠনকে সুষম করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে বুঝতে পারি, রাজসিংহ উপন্যাসের দ্বন্দ্ব কেবল রাজপুত-মোগল বিরোধ নয়। আরও একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের বীজ বঙ্কিমচন্দ্র বপন করেছেন। জেবউন্নিসা মোগল হারেমের সর্বময়ী কর্ত্রী। বাদশাহের উপর তার প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু তার ক্ষমতার একাধিপত্য ছিল না। উদিপুরী তার অসামান্য সৌন্দর্যরাশি দিয়ে বাদশাহকে আবিষ্ট করেছিল। জেবউন্নিসার বিচক্ষণতা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও উদিপুরীই তার বাধা। সেই কারণে জেবউন্নিসা কণ্টক দিয়ে কণ্টক দূর করতে চেয়েছিল। চঞ্চলকুমারীর রূপ অসামান্য। উদিপুরী অপেক্ষাও সে সুন্দরী। সুতরাং চঞ্চলকুমারী এলে উদিপুরীর গর্ব খর্ব হয়। আবার চঞ্চলকুমারীকে সে নিজের বশে রেখে আওরঙ্গজেবের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে—এইটিও সে আশা করেছিল। সেজন্যে সে মবারককে বারবার বলেছিল যে চঞ্চলকুমারী উদিপুরী অপেক্ষা সুন্দরী হলে তবেই যেন মবারক তাকে হারামে আনে। জেবউন্নিসা উদিপুরীকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ দিয়েছিল। উদিপুরী বাদশাহকে সে খবর দিলে। বাদশাহের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হল। বাদশাহজাদীর ক্ষমতার লড়াইয়ের কি পরিণাম হয়েছিল তা আমরা জানি। রাজসিংহের প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চলকুমারীর বাদশাহের চিত্রপটে পদাঘাত করার ঘটনাটি লোকমুখে বাদশাহ সংবাদ পেয়েছিলেন এইরকম বলেছেন। কিন্তু পরে জেবউন্নিসার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস অংশ এবং উপন্যাস অংশ স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয় নি। এই দুইয়ের সম্মিলিত ধারা যে মোহানায় পড়েছিল তারই সৌন্দর্য রাজসিংহ উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ। পুনরায় রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করি—

'এই ইতিহাস এবং উপন্যাস একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে, কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়।'[১]

আমরা বলতে পারি রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের 'পরস্পর-স্পর্ধিত্ব রমণীয়'। উপন্যাসটির অনবদ্য গঠনকৌশলের আর একটি দিক উল্লেখ করি। ষষ্ঠ খণ্ডের প্রায় সবগুলি পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সমিধ সংগ্রহ' নাম

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আধুনিক সাহিত্য—'রাজসিংহ'

দিয়েছেন। এই সমিধ উপন্যাসের পাত্র পাত্রী সকলেই সংগ্রহ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও ইতিহাসের চাকা এবং উপন্যাসের চাকাকে একই সঙ্গে চালিয়েছেন। এ-ও উপন্যাসটির গতিবেগের একটা কারণ। রাজসিংহ উপন্যাসের 'পুনঃপ্রণীত' সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ব্যবহারেও আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। উচ্ছ্বাসকে সংযমের বন্ধনে বেঁধেছেন। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। রাজসিংহের প্রথম সংস্করণে চঞ্চলকুমারীর সৌন্দর্য দর্শনে প্রাচীনা বুড়ীর 'প্রণাম'কে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

'বুড়ী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্যের ছায়া দেখিল। তিনিই রূপ তিনিই গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয়।'১

লক্ষণীয় প্রথম সংস্করণে 'তিনিই' পদটি স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত ছিল। বস্তুত উপরোক্ত মন্তব্যে যে দার্শনিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা উপন্যাসের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে এই অংশটি বর্জন করেন। এই বর্জন যে ঔপন্যাসিকের ঔচিত্যজ্ঞানের পরিচায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

রাজসিংহ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ করে জেবউন্নিসা এবং মবারক চরিত্র। দরিয়ার কার্যাবলী কিছুটা রমেশচন্দ্র দত্তের জেলেখার অনুরূপ। সে রোমান্স সৃষ্টির একটা যন্ত্র মাত্র। মোগল-শিবিরে তার আবির্ভাব কিংবা গুলি করে মবারককে হত্যা করার মধ্যে চমকপ্রদ কাহিনী সৃষ্টি করার প্রয়াস আছে। নির্মলকুমারীর ভূমিকাও রোমান্সরস পরিবেশন করার জন্যে সৃষ্ট। রসিকা পানওয়ালী কিংবা আয়ী বুড়ীর গৌণ ভূমিকা হাস্যরসের উপাদান জুগিয়েছে। এই দুটি অংশ যুদ্ধের মধ্যে কথঞ্চিৎ অবকাশের (relief) সৃষ্টি করে।

জেবউন্নিসার চরিত্রের উত্থানপতনের চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এঁকেছেন। জেবউন্নিসা বাদশাহজাদী এবং politician। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল ক্ষমতার দম্ভ। ক্ষমতার উচ্চাসনে থেকেও সে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। তার শক্তি ও তেজ অলোকসামান্য। জেবউন্নিসা চরিত্রের চাবিকাঠি বঙ্কিমের এই বিশ্লেষণের মধ্যেই পাওয়া যায়।

'কিন্তু জেবউন্নিসা তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভুল হয় যে, খোদা বাদশাহজাদীকে ও চাষার মেয়েকে এক ছাঁচেই ঢালিয়াছেন;—ধন দৌলত, তক্তে তাউস্, সকলই কর্মভোগ মাত্র, আর কোন প্রভেদ নাই।'২

শেষ পর্যন্ত জেবউন্নিসা শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, দুই খুইয়ে মবারককে ডেকে পাঠাল, কিন্তু মবারক এল না। তখন—

১. রাজসিংহ (প্রথম সংস্করণ), ১২৮৮
২. রাজসিংহ, ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

'উত্তর শুনিয়া জেবউন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইল এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাতসাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহা বাদসাহী দস্তুর।'[১]

বাদশাহী দস্তুরের বিচিত্র রূপ জেবউন্নিসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। প্রেমের দ্বন্দ্বে সে সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে। নরনারীর শাশ্বত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ লীলাকে বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসার চরিত্রে ফুটিয়েছেন। জেবউন্নিসার স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং মবারকের আবির্ভাব ও তার হৃদয়ের মর্মবেদনাকে বঙ্কিম আর্টের সংযমের দ্বারা চিত্রিত করেছেন। রোমান্সের দীপ্তিও এইখানে।[২] উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদনে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

'রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়।'

বঙ্কিমচন্দ্রেব এই বিশ্লেষণে মবারক ভূমিকাকে ঠিক বোঝা যায় না। সত্য কথা, মবারকেব চবিত্রের অধঃপতন বঙ্কিম দেখিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের চিত্ত-গহনে মবারকের দুর্বলতা সবলতা যে অনুবণন তুলেছিল তাব পব এ সিদ্ধান্ত কিছুটা পীড়া দেয়। রাজসিংহ উপন্যাসে মবাবক এবং জেবউন্নিসা আমাদের হৃদয় লুট করে নেয়। কিন্তু মবাবকেব মৃত্যু মনুষ্যেব মহত্ত্বকেই যেন বড়ো করে দেখায়। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বজাতিদ্রোহিতার জন্যে অনুতাপ, জেবউন্নিসাব অসহায়তায় সমবেদনা—এই-সব মিলে তাকে সাহিত্যের শাশ্বত আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। নিয়তিব নিষ্ঠুব নিপীডনে পিষ্ট মবারক বঙ্কিমের অভিপ্রায়কে পবাস্ত করেছে। শিল্পীই জয়ী হয়েছে।

রাজসিংহ উপন্যাসে কি বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়েছেন? আমরা আগে দেখেছি, কোথাও কোথাও বঙ্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। কিন্তু সর্বোপরি বাজসিংহেব ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যে-কথা বলেছেন তাতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ দেখি না।

'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল।'[৩]

---

১. রাজসিংহ, ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

২. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

৩. রাজসিংহ, উপসংহার

রমেশচন্দ্র দত্ত

রামবাগান দত্ত-পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম। এই দত্ত-পরিবারে বহু কৃতবিদ্য লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পিতৃব্য শশিচন্দ্রের কথা আগেই বলেছি। শশিচন্দ্র দত্তের প্রেরণা রমেশচন্দ্রের রচনায় কার্যকরী হয়েছিল। প্রধানত শশিচন্দ্রের শিক্ষাতেই রমেশচন্দ্রেব বিদ্যাচর্চা অগ্রসব হয়েছিল। এই পরিবারেই তরু দত্ত ও অরু দত্তের জন্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বাব এই পরিবারে উন্মুক্ত ছিল। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যেব প্রভাব দত্ত-পবিবারের অনেকেব লেখাতেই সুলভ।

ছাত্রজীবন থেকেই বমেশচন্দ্রেব বিদ্যাচর্চাব প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। বিলেতে গিয়ে তিনি আই সি. এস. পবীক্ষায বাঙালিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রমেশচন্দ্রেব এই বিদ্যাচর্চাব আগ্রহ স্কটেব বিদ্যাচর্চাব কথা স্মবণ করিয়ে দেয়। সমালোচকেবা বলেছেন স্কট ছিলেন 'Glutton of Books.' বোধ কবি বমেশচন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায। বিলাতে কেবল যে তিনি নিজেব পাঠ্যপুস্তক নিযেই ব্যস্ত ছিলেন তা নয় ববং দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ভাবতবর্ষেব ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ভারতেব ইতিকথা বিদেশীদেব কাছে পৌছে দেবাব দায়িত্বও তিনি গ্রহণ কবেছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই বিষয়গুলি ছিল—*Study of Indian History*; *History, Civilisation and Religion of the Ancient Hindus*, *History, Civilisation, Religion and Literature of the Ancient Hindus (2nd)*; *the Epic and Poetry in Ancient India*; *The Epic and the Epic age of India*. বিষয়গুলি দেখলে বোঝা যাবে রমেশচন্দ্র প্রধানত ইতিহাসচর্চাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাসপ্রীতি বমেশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।[১]

যাঁদের লেখা পড়তে বমেশচন্দ্র ভালোবাসতেন তাঁদেব কথা তিনি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ কবেছেন।

১· বর্ধমানে সরকারি কাজের সময়ে রমেশচন্দ্রকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন সরকারি কাজ অপেক্ষা গ্রন্থপাঠেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল।

১৯০৫ সালে *Wednesday Review*-তে রমেশচন্দ্র লিখেছেন—

'Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago I spent days and nights over his novels, I almost lived in those historic scenes and in those mediaeval times which the great enchanter had conjured up. Scott, has thus, in fact created a world of his own—a somewhat idealised, but a vivid and on the whole picture of the mediaeval world in Europe'

একটু পরে বলেছেন—

'Byron and Sir Walter Scott were my favourite poets forty years ago'[১]

এই থেকে বোঝা যায় স্কটের উপন্যাসে যে আদর্শলোক রচিত হয়েছিল রমেশচন্দ্রের কাছে তা গ্রহণীয় বস্তু বলে মনে হয়েছিল। ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততা তিনি স্কটের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। আবার বায়রনের কবিতার দেশপ্রেরণাও রমেশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে স্বদেশপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল তাতে বায়রন গৃহীত হবারই কথা। নবীনচন্দ্র সেন এক কালে বাংলার বায়রন বলে পরিচিত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও আদর্শবাদ আছে, উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতির সবিস্তার বর্ণনারও অপ্রতুলতা নেই।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাস রচনায় ব্রতী হবার অন্য একটি গুরুতর কারণের উল্লেখ করতে হয়। রমেশচন্দ্র যে সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু। বঙ্গদর্শনের সূচনা বাংলা সাহিত্যে একটি যুগান্তর এনে দিয়েছিল। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে একদল নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল।

'কর্মে জ্ঞানে চিন্তায় শিক্ষিত বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন (১৮৭২)। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনা দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যাহাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয় সেই জন্য এই অধ্যবসায়। সেই সঙ্গে সমাজবোধ জাগাইবার চেষ্টাও রহিল। দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবের প্রতিও তিনি সচেতন ছিলেন।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র অন্যতম। রমেশচন্দ্র বাংলায় কিছু রচনা করেন নি বলে সংকুচিত ছিলেন। সেই কারণে বাংলা রচনা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে সে সংকোচ কেটে গেল। রমেশচন্দ্র বলেছেন—

১. 'I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.'

২. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), 'বিশ বছরের আয়োজন'

'একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখনা কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—'আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি ন। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওবাই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা বচনাপদ্ধতি জানি না।' গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনাপদ্ধতি আবার কি—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত কবিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।'[১]

রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং শশিচন্দ্র দত্তেব কবিতাবলী ইংবেজিতে। পাঠকের এ-সকল রচনার প্রতি আগ্রহ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংবেজি-বচনাব এই পবিণামের প্রতি রমেশচন্দ্রকে সতর্ক কবে দিলেন। বমেশচন্দ্র গুরুব বাক্য শিবোধার্য কবে উপন্যাস বচনায অগ্রসব হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বমেশচন্দ্র অনুসবণ কবেছিলেন **রচনারীতিতেও। সাধু পুরুষের অবতারণায় প্রণয়কাহিনী বয়নে, পাঠককে সম্বোধন করে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদানে তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে-ছিলেন।** বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি একটি গোষ্ঠীব গুরুরূপে দেখা যায তবে বমেশচন্দ্র সে গোষ্ঠীব অন্যতম অধিনাযক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ নেই।

কিন্তু বমেশচন্দ্র বঙ্কিমকে পুবোপুবি অনুসবণ কবেন নি। কোনো সার্থকনামা লেখকেই তা কবেন না। 'সমাজ' ও 'সংসাবে' যে প্রগতিশীল মনোভাবেব পবিচয় পাই তাব নামগন্ধও বঙ্কিমচন্দ্রেব লেখাতে ছিল না। এখানে রমেশচন্দ্র সেকালেব ঔপন্যাসিকদেব মধ্যে একক।

রমেশচন্দ্রেব ঐতিহাসিক উপন্যাসেব কৃতিত্বেব দিক হল এই যে তিনি প্রথমে দেখালেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসনিষ্ঠা ও কল্পনাব যথার্থ মেলবন্ধন স্থাপন কবা প্রযোজন। বঙ্কিমচন্দ্রেব উক্তি থেকেই জানতে পাবি দুর্গেশনন্দিনীব সমাদব সেকালে অত্যন্ত বেশি ছিল। বইটিব একাধিক সংস্কবণ তাব প্রমাণ। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী খাঁটি বোমান্স। বমেশচন্দ্র যা বচনা কবেছেন তাও ঐতিহাসিক বোমান্স বটে, কিন্তু সেগুলি বোমান্সসর্বস্ব নয। দুর্গেশনন্দিনী বাব হবাব পর অনেক অক্ষম লেখক বোমান্সকে আবও তরল কবে পবিবেশন কবেছিলেন। রমেশচন্দ্রেব রচনা সে দিক থেকে তদানীন্তন বঙ্কিম-অনুসবণ-কারীদের সতর্ক কবে দিলে। সে যুগেব পক্ষে এব মূল্য অপবিসীম। বমেশচন্দ্রেব উপন্যাসেব প্রধান রস হচ্ছে ভৌম রস। দেশপ্রীতির কথা যথার্থ সুরে অনুরণিত

১. নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০০

হয়েছে তাঁর রচনায়। তিনি যে একবার বলেছিলেন—I feel a pride at being thus a martyr to my duty এ কথা খাঁটি সত্য। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক রচনা-রীতিতে বঙ্কিম-রমেশকেই অনুসরণ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যুগ আবার আসন্ন বলিয়া মনে হয়। সে যুগের বাঙালী লেখকগণকে পুনরায় জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাত মন দিয়া পড়িতে হইবে। তাঁহাদের চোখে ইতিহাসের ও শিল্পরীতির অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে। সেই ত্রুটিগুলি এড়াইয়া চলিতে গিয়া পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকগণ নিজেদের নূতন শক্তির আবিষ্কার করিবেন। এক সময়ে রমেশচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যিককে দক্ষিণ হাতে ধরিয়া নূতন পথে চালনা করিয়াছেন, তখন আবার বাম হাতে ধরিয়া পুরাতন পথের খানখন্দ এড়াইয়া চলিতে সাহায্য করিবেন। যিনি নূতন পথে চালনা করেন তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেন তিনি গুরু। রমেশচন্দ্র একাধারে নেতা ও গুরু দুই-ই।'১

বঙ্গবিজেতা

রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা' 'বঙ্গদর্শনে' বার হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রেরণায় এ গ্রন্থ লিখিত। রমেশচন্দ্র 'বঙ্গবিজেতা'য় প্রধানত ইতিহাসকেই আশ্রয় করলেন। উনিশ শতকে যে-সকল সমাজঘটিত উপন্যাস পেয়েছি (যদিও সংখ্যায় খুবই কম) সেগুলির চাইতে ঐতিহাসিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। এইজন্যেই রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ সে সময়ে জনপ্রিয়তায় ন্যূন ছিল না।

'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীর ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ, সময় ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ। বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদের অভ্যুদয় ঘটে। মোগলসম্রাটেরা বাংলাদেশকে তাঁদের অধীনে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। পাঠানরা সহজে দেশ ছেড়ে দেয় নি। মোগলদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে পাঠানকুল বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজা টোডরমল্ল সর্বসমেত তিনবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তৃতীয়বার বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ করতলগত করার জন্যে রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে উপনীত হলেন। এবারে বিদ্রোহী স্বয়ং মোগলসৈন্য। কি ভাবে রাজা টোডরমল্ল বাংলার জমিদারদের সাহায্যে এ বিদ্রোহকে দমন করেন এবং বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন সেই কথাই আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে। আখ্যায়িকার ঘটনাটি ঘটতে মোট ছয় মাস লেগেছে।

রমেশচন্দ্র Major Stewart-এর *History of Bengal* গ্রন্থটি অবলম্বন করেছিলেন। স্টুয়ার্টের বই থেকে ঘটনাটির সারমর্ম নিই।

বাংলাদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই সম্রাট আকবর রাজা টোডরমল্লকে বিদ্রোহ দমনে পাঠালেন। স্টুয়ার্ট আকবরের এই কার্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলেছেন—

'The political conduct of Akbar, in employing the Hindoo Chiefs, was attended with the most salutary efforts , they were always accompanied by a large body either of their own clan, or of Rajpoots (the milifary tribe), who not only served to support the Moghul troops, now inadequate to retain in subjection so extended an empire, but were also useful as a check upon the latter, when refractory or dissatisfied '

বলা বাহুল্য, বমেশচন্দ্র স্টুযার্টের এই মন্তব্যটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রাজাব মুঙ্গেরে অবস্থানেব কালে ভাগলপুবে শত্রুসৈন্য সমাবেশ হল। রাজাও সৈন্যসজ্জা কবতে লাগলেন। রাজার এই সতর্কতাব প্রয়োজন ছিল। কারণ ইতিমধ্যেই দুইজন সেনাপতি বাজাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবে চলে গেল। বাজাও তখন কৌশল অবলম্বন কবলেন। ছোটখাট যুদ্ধ-বিদ্রোহ চলতে লাগল।

'At length the Raja, by his influence amongst the Hindoo zemindars prevailed upon them no longer to supply the rebels with provisions , promising to pay them ready-money for everything they brought to his camp ✝: The combined effects of similarity of religion and ready-money payments worked so effectually on the zemindars, that famine shortly found its way into the rebel camp, and compelled the Chiefs to separate, in order to obtain food.'

স্টুয়ার্ট যে দুইজন সেনাপতিব উল্লেখ কবেছেন বমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতায় তাঁদেব কথা সবিস্তারে বলেছেন। একজন তর্খান খাঁ (Tersoom Khan) আব একজন মাসুম ফেরানজুডি (Masoom Ferunjudy)। বমেশচন্দ্র স্টুয়ার্টেব ইঙ্গিতকে অবলম্বন করে নূতন কাহিনীর জাল বুনেছেন। হিন্দু জমিদারদের উপব টোডবমল্ল যে কৌশলজাল বিস্তাব কবেন উপন্যাসে তারই অব্যর্থ ফল উদ্ঘাটিত হয়েছে। জমিদার সতীশচন্দ্র যে ভাবে হিন্দু সৈন্যকে টোডবমল্লের পাশে দাঁড় করিয়েছেন তা সম্ভব হয়েছিল টোডরমল্লের হিন্দুত্বের জন্য। টোডরমল্লের আশ্রয়ে হিন্দু জমিদাররা আশ্বাস পেয়েছিল। এই কারণেই বিদ্রোহদমন সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য রমেশচন্দ্র এর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ-সরলার কাহিনী জুড়ে দিয়ে কাহিনীতে আবর্ত সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। সেইটি হল নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সরলার প্রেমাসক্ত। কতকটা নিজের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের জন্য [illegible] [illegible]

অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এবং সর্বোপরি সরলাকে লাভ করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইতিহাসের সঙ্গে রমেশচন্দ্র এই কাহিনীটি যোগ করে বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সুরেন্দ্রনাথের রাজা টোডরমল্লের নিকট ভক্তি নিবেদন কতকটা আকস্মিক বলেই মনে হয়।

'বঙ্গবিজেতা' রমেশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক বাংলা রচনা। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর বিলাতভ্রমণ (বাংলা অনুবাদ) ছাপিয়েছিলেন। প্রথম রচনা হিসাবে বঙ্গবিজেতা হয়তো অসার্থক নয়, কিন্তু বঙ্গবিজেতায় ত্রুটিবিচ্যুতি প্রায় সর্বত্র। ইতিহাসের তথ্য সমাবেশের প্রাচুর্য উপন্যাসটির আষ্টেপৃষ্ঠে। পাঠক সে জটিল অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্যের জন্য কাহিনী বর্ণনা নিস্তরঙ্গ। অনেক সময় বর্ণনার একঘেয়েমি গল্পের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। প্রায়ই কাহিনীর গতি রুদ্ধ করে রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে শিথিলবদ্ধ অনেক বস্তু উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রশেখরের আশ্রমের বিস্তারিত বর্ণনা, উপেন্দ্র-কমলা কাহিনী উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রায়ই মহাপুরুষ-জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। সেই চরিত্রগুলি ঘটনার নিরপেক্ষ সাক্ষী মাত্র। (আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কার্য এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয়) কিন্তু বঙ্কিমের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মহাপুরুষদের প্রভাব অন্তঃশীলা ভাবে উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দেন। কোনো কোনো চরিত্রের উপর মহাপুরুষের প্রভাব এমনই আত্যন্তিকভাবে দেখা দেয় যে তাঁদের একটা পরোক্ষ প্রয়োজন সেখানে লক্ষ্যগোচর হয়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের সৃষ্ট চন্দ্রশেখর এই জাতীয় চরিত্র নয়। তার সার্থকতা উপন্যাসে বিশেষ নেই। সুরেন্দ্রনাথ বিমলা অমলা কমলা সরলার উপর চন্দ্রশেখরের কোনো প্রভাবই দেখতে পাই না। চন্দ্রশেখরের মধ্যে মানবিকতার স্পর্শ নেই, তিনি একটা অশরীরী ছায়া —গ্রন্থকারের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শন মাত্র। চন্দ্রশেখর আসলে প্রচারের বাহন। কাহিনী-বর্ণনার মধ্যে সহজ সমাধান খোঁজবার প্রচেষ্টায় রমেশচন্দ্র পরিণতিতে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য উপকাহিনী যোজনা করেছেন। পূর্বে উপেন্দ্র-কমলা কাহিনীর ব্যর্থতার কথা বলেছি। উপেন্দ্রের প্রেমের যে জ্বলন্ত বর্ণনা পাই তা পূর্বপরিচয়ের অভাবে একেবারে বেমানান হয়ে পড়েছে। পরিশেষে উপেন্দ্র-কমলার মিলন অসঙ্গতির মাত্রাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মহাশ্বেতা নিষ্ক্রিয় (Passive) চরিত্র। রোমান্সে ঘটনার প্রাচুর্য থাকেই। কিন্তু তা বাস্তবকে অস্বীকার করে না। ঘটনা আশ্রিত হলেও

ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ দেখানো সম্ভব। যেমন দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র এ কাজে ব্যর্থ।

রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি সর্বাপেক্ষা বেশি পড়েছে সুরেন্দ্রনাথ-বিমলার উপর। বিমলা ইউরোপীয় উপন্যাসের আদর্শে অঙ্কিত। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও বিদেশী উপন্যাসের ছায়া বর্তমান। বিমলা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। সে পিতৃভক্ত, দেবমহিমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণা, স্বার্থত্যাগী ও আদর্শপ্রেমের উপাসিকা। এতগুলি গুণের সমাবেশ করে রমেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত চরিত্রটির মধ্যে সঙ্গতি আনতে পারেন নি। অথচ সরলা-বিমলা-সুরেন্দ্রনাথ এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে যদি আবর্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হত তবে বাংলা সাহিত্যে ত্রিভুজ প্রণয়ের একটি চমৎকার নিদর্শন মিলত। সরলাকে কেন্দ্র করে বিমলার মনের গোপনতম প্রদেশটিকে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রমেশচন্দ্র এ ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে বিমলাকে আদর্শলোকের অধিবাসিনী করে তুলেছেন। বিমলার নৌকাযোগে মুঙ্গের যাত্রা এবং সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয়দান কতকটা ম্যাজিকের লক্ষণাক্রান্ত। বিদ্রোহীদের শিবিরে দাসীবেশে বিমলার আকস্মিক আবির্ভাব পাঠকের বিশ্বাসের উপর পীড়ন মাত্র। কেননা এ চরিত্রে এ দুঃসাহসিক কাজের কোনো লক্ষণই ছিল না। কেবলমাত্র রোমান্সের খাতিরেও একে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বিমলার যে সন্ন্যাসিনী রূপ পাই তা গ্রন্থকারের আদর্শবাদেরই জয় ঘোষণা করছে।

রাজা টোডরমল্লের চরিত্র উপন্যাসে বিস্তৃত নয়। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাঁর উপস্থিতি। টোডরমল্ল বঙ্গবিজেতা। গ্রন্থের নাম যখন রাজাকে কেন্দ্র করেই তখন এ স্বল্প পরিচিতি অবাঞ্ছিত। ইতিহাসের বড়ো বড়ো পরিচিত চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করা কষ্টসাধ্য। কেননা এঁদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্বলব্ধ জ্ঞান এত স্পষ্ট যে সেখানে কল্পনার অবকাশ কম। রমেশচন্দ্রও টোডরমল্লের বিস্তৃত পরিচয় দেন নি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত কাল্পনিক চরিত্রকে অবলম্বন করেই গ্রন্থাকার ইতিহাসের ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেন। টোডরমল্লের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয় নি। তাঁর স্বজাতির প্রতি প্রীতি-পক্ষপাত কতটা কূটচক্রান্তের অধিকারভুক্ত কতটা আন্তরিকতার নিদর্শন এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। টোডরমল্ল তেজসিংহ রাণা প্রতাপাদিত্য ইত্যাদির মধ্যে যে দুর্মর স্বাদেশিকতার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন নিজের জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি তাকে ধন্য করে তুলতে পারেন নি। টোডরমল্লকে একবার মাত্র আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দেখি। শকুনির উত্তেজনামায়

বক্তৃতার সামনে টোডরমল্লের নির্ভীক আচবণেব প্রত্যাশা পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু টোডবমল্ল শকুনির কাছেও নীবব—বিচাবসভা প্রহসনে পবিণত হয়েছে। এমন-কি টোডবমল্লেব চবিত্রেব সঙ্গতিও ব্যাহত। কাবণ টোডবমল্ল প্রকৃত বীব, সাহসী যোদ্ধা, স্বজাতিব বক্ষক। এই আদর্শ চবিত্রেব এই নীববতা, তাঁর কাপুরুষোচিত আচরণ বাস্তবতাব সমস্ত বেশটুকুকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবাব নেই। সুবেন্দ্রনাথ সেকালেব জমিদাবেব প্রতীক। বমেশচন্দ্র বলেছেন সেকালেব বাংলাদেশের আভ্যন্তবীণ অবস্থা অনেকটা ইংলণ্ডেব ফিউডাল প্রথাব মতো ছিল। ফিউডাল সমাজেব প্রভুদেব আচবণের মতোই সুবেন্দ্রনাথেব আচবণ। আবাব মধ্যযুগীয় নাইট চবিত্রেব ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও সুবেন্দ্র-চবিত্রে দুর্লক্ষ্য নয়। বিমলাব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সে যখন ঘোড়সওযাব নিযে তাকে উদ্ধাব কবে তখন ইউবোপীয় নাইট চবিত্রেব বীবত্বেব আচাব-আচবণকেই মনে কবিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বমেশচন্দ্র স্কটেব অনুগামী। সুবেন্দ্রনাথ আদর্শ প্রেমিক, প্রকৃত যোদ্ধা, এবং প্রজাবৎসল জমিদার। তাব জীবনও নির্দ্বন্দ্ব, নিস্তবঙ্গ। বমেশচন্দ্র ঘটনাব পব ঘটনা সাজিয়েছেন, কিন্তু তাতে প্রাণ সঞ্চাব কবতে পাবেন নি। একটাব পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাগুলিও অনেকটা নিরূপিত। বিশেষ কোনো আবর্তসঙ্কুল অবস্থায় সুবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বেব বিপর্যস্ত অবস্থা দেখতে পাই না। সুবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

'নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। ** ধনবান্ জমিদারের পুত্র হইযাও ধনে তাঁহার আদর ছিল না, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন, সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন।'

গ্রন্থেব নায়ক চরিত্র আসলে সুবেন্দ্রনাথ। সে-ই টোডরমল্লের যথার্থ সহচব।

শকুনিব চরিত্রটি মোটামুটি মন্দ হয় নি। বিদেশী প্রভাব থাকলেও শকুনিব কার্যকলাপেব মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিব পবিচয়টুকু বমেশচন্দ্র বর্ণনাব দ্বাবাই শেষ কবেন নি, ববং তাব কপটতা, ঈর্ষাবিদ্বেষকে ঘটনাব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পবিস্ফুট কবেছেন। শকুনি সতীশচন্দ্রকে যে ভাবে ধীরে ধীবে প্রলুব্ধ করেছিল তাব কিছু অংশ নেপথ্যে, বাকি যে অংশ গ্রন্থে আছে সেখানেও দেখি পাষণ্ডের [illegible] মাধ্য চবিত্রোচিত ধর্ম অব্যাহত। সতীশচন্দ্র মুঙ্গের গেলে

শকুনির যে স্বগতচিন্তা পাই সেইটি অনেক সময়ই শেক্সপীয়রের ইয়াগোর কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য ইয়াগোর সঙ্গে শকুনির তুলনা অসমীচীন। শকুনি নামটি উদ্দেশ্যমূলক। মহাভারতোক্ত শকুনির ধর্ম আরোপ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য।

রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতার কাহিনীর স্থুলভ সমাধান করেছেন। ন্যায়নীতির বিচাবে চরিত্র সাজিয়েছেন। পাপ ও পুণ্যের ফল বণ্টনে লেখক সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের পরিচয় লেখকের কাছে তখনও অজ্ঞাত। মানবমনের গতি যে বিচিত্র এবং জটিল এবং তা যে সব সময়ই ন্যায়নীতিব সহজ পথ ধবে চলে না এইটি লেখক বুঝতে পারেন নি। লেখকেব আদর্শবাদ এ দিকটিব প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা দেখিয়েছে।

কিন্তু বঙ্গবিজেতা উপন্যাসেই বমেশচন্দ্রের শক্তিমত্তাব পরিচয় আছে। সতীশচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে, শকুনিব কপটরূপাচিত্রণে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব নগণ্য নয। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঙালি বীবচবিত্রের চিত্র দিযেছেন। ঐতিহাসিকেরা বলেছেন পাঠান বাজত্বে বাংলাদেশে যে শান্তি ফিবে এসেছিল তা মোগল আক্রমণে পুনরায় ব্যাহত হয়। বাংলাদেশেব এই অবাজকতাব সময়কে কেন্দ্র কবে রমেশচন্দ্র তাঁব কাহিনীব বীজ বুনেছেন।

'তবে বাঙ্গালী তখনো মরে নি, ধর্মেব নামে তখনো সে প্রাণ দিতে পা৲ত।'[১]

রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে দেশেব আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রতীক রূপে দেখেছেন। সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নবহরি সরকারেব শিষ্য বৈষ্ণ চন্দ্রশেখব নয়। মধ্যযুগেব কবিব কাছে ধর্মের নামে প্রাণদান মহৎ সম্ভাবনায় সূচিত হযেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বমেশচন্দ্র সেইটি দেখেছেন দেশপ্রেমেব পটভূমিকায়। বমেশচন্দ্র বাংলাদেশেব জমিদাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও ইতিহাসেব অনুকরণে। কেননা জমিদাবরা পবস্পরেব প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তখনকার জমিদারদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দেখেছেন অপ্রতিহত ক্ষমতা। আধুনিক গবেষণায়ও রমেশচন্দ্রেব এ মন্তব্য স্বীকৃত হবে—

'The Zemındars, within their territories were free to rule as they liked: free to rule and, free to oppre s.'[২]

মুকুন্দবাম মোগল শাসনেব অত্যাচাবের বর্ণনা দিয়েছেন আত্মপরিচয়-সূত্রে। বমেশচন্দ্র অবশ্য এই অত্যাচাবেব বর্ণনাকে প্রকটিত কবেন নি। তাঁব উপন্যাস

---

১. শ্রীসুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

২. Tapan Kumar Rov

এই দিক দিয়ে জমিদাবের পারিবাবিক দ্বন্দ্ব এবং টোডরমল্লের সঙ্গে জমিদারদের সম্বন্ধ নির্ণযে বচিত। বঙ্গবিজেতাব প্রথম সংস্কবণে কৃত্তিবাস ও মুকুন্দবামেব মিলনদৃশ্যটি ছিল। পববর্তী সংস্কবণে এ দৃশ্য বর্জিত। হযতো গ্রন্থেব পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলে রমেশচন্দ্র একে বর্জন কবেছেন। কিন্তু তাঁর ***Literature of Bengal*** গ্রন্থে কৃত্তিবাস এবং মুকুন্দবামেব আবির্ভাব-সময় বিভিন্ন। তিনি বলেছেন এঁরা সমসাময়িক নন। সুতবাং ঐতিহাসিক সত্যের খাতিবে এইটিকে বর্জন করা হয়েছে বলে মনে কবি।

মাধবীকঙ্কণ

১৮৭৭ সালে 'মাধবীকঙ্কণ' বার হল। 'বঙ্গবিজেতা'ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণ প্রকাশ করাব উৎসাহ ও উদ্দীপনা দুই-ই বেড়ে গেল। মাধবীকঙ্কণেব কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসেব আবির্ভাব চকিত বা অস্পষ্ট নয়। 'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীতে ঐতিহাসিক ঘটনাব বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ্য কবি। সবই যেন ধূসববর্ণে চিত্রিত। কিন্তু মাধবীকঙ্কণে ইতিহাসেব চিত্রগুলি সজীব এবং প্রাণবন্ত। এখানে অতীতেব আবহবচনায বমেশচন্দ্র সার্থককাম।

শাজাহানেব শেষজীবনে তাঁব পুত্রদেব মধ্যে বিবোধ ব্যাপাবটি মাধবীকঙ্কণেব ঐতিহাসিক পটভূমি। এই বিবোধ মোগল শাসনেব একটি বিখ্যাত ঘটনা। পববর্তী দুই উপন্যাসে বমেশচন্দ্র যে বাজপুত জাতিব ইতিহাস অঙ্কন কবেছেন তাব প্রকৃত সূচনা মাধবীকঙ্কণে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাবে। বাজপুত-কাহিনীব প্রতি অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকেব মতো বমেশচন্দ্রেবও প্রীতিপক্ষপাত ছিল। বঙ্গবিজেতায টোডবমল্লেব সপ্রশংস উক্তির মধ্য দিযে রাজপুতজাতিব প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা নিবেদিত হযেছিল। বঙ্গবিজেতায় যা বীজাকাবে মাধবীকঙ্কণে তাব অঙ্কুবোদ্গম, পরবর্তী দুই উপন্যাসে তা ফুলে ফলে শোভিত হয়েছে। এই চারখানি উপন্যাসের মধ্যে অন্তবঙ্গ যোগসূত্রেব এই একটি দিক। স্মবণ বাখা কর্তব্য, একশো বছবেব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলেই উপন্যাস চারখানি 'শতবর্ষ' নামে বেরিয়েছিল। এই শতবর্ষে একটি জাতির উত্থানপতন এই উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত হযেছে।

মাধবীকঙ্কণ শাজাহানের সময়েব ঘটনা বটে, কিন্তু উপন্যাসটির আসল আকর্ষণ

রমেশচন্দ্র নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রকৃত নায়ক কে এ প্রশ্নের উত্তবে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু লেখকেব অভিপ্রায় দেখে বোঝা যায় তিনি মোগল সম্রাটদেরও নাযকের মূল্য দিতে স্বীকৃত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কাহিনীপবিকল্পনা বিচাব কবেও এ কথা বলা যায। ঐতিহাসিক ঘটনাব উৎস তিনটি। এক, রমেশচন্দ্রেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; দুই, টডেব বাজস্থান; তিন, স্টুয়ার্টেব *History of Bengal.* ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে সুজাব দিল্লীব সিংহাসনেব প্রতি দৃষ্টি এবং সিংহাসন লাভেব জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা, আওবঙ্গজেবেব সঙ্গে যুদ্ধ এবং পবাজিত হয়ে পলাযন। অপব দিকে আওবঙ্গজেবেব কপটতা, মোবাদকে বশীকবণ, যশোবন্ত সিংহেব সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজপুত বীবেব পরাজয। মেওযাব ও মাড়োয়াবেব দ্বন্দ্ব এবং বাজপুতজাতির বীবত্বগবিমা গ্রন্থেব আকর্ষণ বাড়িযেছে।

কাহিনীর সমাপ্তিতে বমেশচন্দ্র সুজার ট্রাজেডি বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনা উপন্যাসেব মূল অঙ্গ হতে পাবে নি। আবাকানীদের দ্বারা সুজা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন, এবং তাঁব অপব দুই পার্শ্বচবকে নৃশংসভাবে হত্যা কবা হয। তাঁব প্রিয়তমা মহিষী প্যাবীবানু সৌন্দর্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আরাকানী রাজা তাঁকে বিবাহেব প্রস্তাব করলে তিনি আত্মহত্যা করেন। সুজা সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট বলেছেন—

'He might have filled with credit the throne of a well-regulated and established kingdom but he had not energy or ability to contend with such a revival as Aureungzeb, nor prudence to remain content with a province, while he thought himself entitled to the empire. No prince was ever more belooked than Shuja; misfortune, and even death itself, could not deprive him of his friends, and though his fate was not known in Hindoosthan for some years after his death, yet it filled every eye with tears.'

মহম্মদেব সুজার বিরুদ্ধে অভিযান এবং তাঁর কন্যার প্রতি আসক্তি পবে সুজাব পক্ষ ত্যাগ—স্টুয়ার্ট এই ঘটনাগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। মীবজুমলার কৌশল অবশেষে সুজাব মৃত্যু ডেকে আনল। সুজার ট্রাজেডি ববীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ কবেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক শাজাহানের কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে।

স্টুয়ার্টের গ্রন্থ রমেশচন্দ্রেব অবলম্বন হলেও গ্রন্থের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে রাজপুতকাহিনী। নায়ক নবেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার পর দিল্লীতে যে রাজপুতদের মধ্যে বিবোধসংঘাত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রমেশচন্দ্র

মূলত টডেব রাজস্থান থেকে সেই কাহিনী নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ, বাজপুত জাতির উৎসব এবং যোধপুব মাড়ওয়ারের ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন। মোগল ভ্রাতৃবিরোধে বিশ্বস্ত বাজপুত সম্রাটেব পক্ষ ত্যাগ না করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব দারাব পক্ষাবলম্বী যশোবন্ত সিংহকে পবাস্ত কবে নিজেব ক্ষমতায আসীন হন। প্রধানত যশোবন্তেব সঙ্গে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধবর্ণনা এবং মেওয়ার মাড়ওয়ারের বাজনৈতিক বিষয় মাধবীকঙ্কণে স্থান পেয়েছে। যশোবন্ত সিংহেব সঙ্গে আওরঙ্গজেবেব কলহ টডের বাজস্থানে অবশ্য বেশি জায়গা জোড়ে নি। রমেশচন্দ্র কল্পনাবলে এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাব মধ্যেও ইতিহাসের চাঞ্চল্যকে জাগ্রত করেছেন। স্টুয়ার্ট যশোবন্ত সিংহেব কথা বলেছেন। তিনি অপ্রাসঙ্গিক বলে দীর্ঘ বর্ণনা এড়িযে গেছেন। অবশ্য টডেব কাহিনীতে ঘটনাটি উপযুক্ত মর্যাদাতে বঞ্চিত। উম্‌রার পবে বাজা যশোবন্ত সিংহ মাড়ওয়াবেব সিংহাসনে অধিরূঢ হলেন। মেওয়ারের রানীর বংশজাত বলে যশোবন্তের কৌলিন্যও বঞ্চিত। চাঁদ ববদাই বলেছেন, সেই সময়ে গণ্ডয়ানার যুদ্ধে আওবঙ্গজেবেব বিরুদ্ধে রাজা যশোবন্ত সিংহ বাইশটি বাজপুত জাতির সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পব শাজাহানেব জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যশোবন্তকে পাঁচহাজাবী মনসবদাবেব পদে উন্নীত কবেন। শাজাহানেব অসুস্থতাব সমযে তাঁব পুত্রদেব মধ্যে যে ভ্রাতৃবিবোধ ঘটে তাতে রাজপুত জাতিব ভূমিকাও নগণ্য নয। টড বলেছেন,

'In the struggle for empire amongst the sons of Shah Jehan, consequent upon their illness, the importance of the Rajpoot princes and the fidelity we have often had occasion to depict, were exhibited in the strongest light '

আওরঙ্গজেব ও মোবাদেব সম্মিলিত অভিযানেব বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ সাহসেব সঙ্গে দাঁড়িযেছিলেন। কিন্তু কূটনীতিব দৈন্যে এবং কতকটা বাজনৈতিক দূবদর্শিতাব অভাবে বীবত্ব প্রদর্শন কবেও যুদ্ধে যশোবন্ত পবাজিত হন। এই যুদ্ধ বাজপুত ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বার্নিযেব, চারণকবি, প্রত্যেকেই রাজপুতবীবেব প্রশংসা কবেছিলেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যশোবন্তেব কলহ-মিলনেব দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে টড এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যশোবন্ত তখনকার সময়ের অনেক রাজপুতবীর থেকে উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কার্যের মধ্যেও একটা বৃহত্তর প্রয়োজন সাধনের বীজ নিহিত থাকত। এই বৃহত্তব স্বার্থ সম্ভবত রাজপুত-জাতির

ঐক্য সাধন এবং রাজপুতজাতির হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার। যশোবন্ত সিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করে টড বলেছেন,

'Although the Rahtore ha'd a preference amongst the sons of Shah Jehan, esteeming the frank Dara above the crafty Arungzebe, yet he detested the whole race as inimical to the religion and the independence of his own , and he only fed the hopes of any of the brothers, in their struggles for empire, expecting that they would end in the ruin of all.'

নর্মদার যুদ্ধে পরাজয়ের কথা যশোবন্ত কখনোই ভুলতে পারেন নি, ভোলা সম্ভবও ছিল না। প্রতিশোধের স্পৃহা সর্বদাই তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। সুতরাং আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতির ছিল না। রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তের এই দুই নায়ক একে অপরের সমর্থন বা শত্রুতা করেছেন। টডের এই উক্তিটি স্মরণীয় :

'If Jeswunt's character had been drawn by a biographer of the court, viewed merely in the light of a great vassal of the empire, it would have reached us marked with the stigma of treachery in every trust reposed in him , but, on the other hand, when we reflect on the character of the king, the avowed enemy of the Hindu faith, we only see in Jeswunt a prince putting all to hazard in its support.'

রমেশচন্দ্রও যশোবন্ত সিংহের এই দিকটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। যশোবন্ত সিংহ হিন্দুজাতির আশা এবং আকাঙ্ক্ষার স্থল। তাঁর পরাজয়ে বৃহত্তর সভ্যতার পরাজয়, তাঁর জয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম উজ্জীবিত হবে এইটি রমেশচন্দ্রের ধারণা ছিল। সে কথা পরে বিস্তৃত আলোচনা করছি। শশিচন্দ্র দত্তও যশোবন্ত সিংহের মহীয়সী পত্নীকে অবলম্বন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যশোবন্ত দেশে ফিরে এলে তাঁর পত্নী রাজধানীর দরজা বন্ধ করে দেন। এবং পরাজিত রাজা দেশে ফিরলে মেওয়ার মাড়ওয়ারের অপমান, এ জন্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই রাজার পক্ষে শ্রেয় এই কথাই রানী রাজাকে বলে পাঠিয়েছিলেন। এই গৌরবগাথা রমেশচন্দ্র সবিস্তারে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পিতৃব্যের কবিতা হয়তো রমেশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

তৃতীয় সূত্রের যে উল্লেখ করেছি তার প্রমাণ লেখক নিজেই গ্রন্থের মধ্যে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেশের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে সহায়তা করেছিল। শারদীয়া পূজার বর্ণনা দিতে গিয়ে রমেশচন্দ্র বলেছেন—

'বর্তমান লেখক রাজস্থানে ভ্রমণকালীন শারদীয়া খড়্গপূজা ও শারদীয়া সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্রনগরবাসিদিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুতদিগের শরৎকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করিয়াছে।'

লক্ষণীয়, রমেশচন্দ্র 'স্বাধীন রাজপুত' কথাটি ব্যবহার করেছেন। লেখকের স্বাধীনতাব প্রতি অনুবাগের প্রমাণ এই গ্রন্থে সর্বত্র।

পূর্বে বলেছি মাধবীকঙ্কণে বমেশচন্দ্র ইতিহাসেব অনুসবণ কবে ইতিবৃত্তেব মধ্যে সজীবতাব স্বতশ্চাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কেবল ইতিহাসের ফাঁক পূবণ কবেন নি, ববং জ্ঞাত তথ্যকে উপস্থাপন কবেছেন দক্ষতাব সঙ্গে। বমেশচন্দ্র বচনাবীতিতেও অনেকটা কৃতিত্ব দেখিযেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেব অন্যতম আকর্ষণ অতীতেব প্রতি পাঠকেব হৃদযকে স্নেহসিক্ত কবা। এই অতীত তখন আব অতীত রূপেই থাকে না। আমবা তাব উপস্থিতি নিজেদেব মধ্যে অনুভব কবি। অতীতকাহিনী সেখানে বর্তমানেব হাসিকান্নাব সঙ্গে একটা নিবিড় নৈকট্য লাভ কবে। অতীত ও বর্তমানেব সঙ্গে এই সাযুজ্যসাধন বমেশচন্দ্রেব অন্যতম কৃতিত্ব। ইতিহাসেব বড়ো বড়ো চরিত্রেব ক্ষেত্রে বমেশচন্দ্র নিজেব কল্পনাকে ব্যবহার কবেন নি। যুগোপযোগী পরিবর্তনও কবেন নি। হযতো রূপান্তবেব প্রযোজনও তিনি অনুভব কবেন নি। ইতিহাসে যশোবন্ত সিংহেব, আওবঙ্গজেবেব যে পবিচয পেয়েছি রমেশচন্দ্রেব বর্ণনায় তাব থেকে কোনো মৌলিক পবিবর্তন বা রূপান্তব দেখতে পাই না। মাধবীকঙ্কণেব অন্যতম আকর্ষণ রয়েছে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্র পবিবেশনেব মৌলিকতায়। নবেন্দ্র-হেমলতা কাহিনী বাজপুত-গৌবব-গাথাব প্রতিস্পর্ধী হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কথা ঠিক কাহিনীটি ঐতিহাসিক ঘটনাব সঙ্গে ঈষৎ শিথিলভাবে যুক্ত। কিন্তু এই শিথিলতা ঐতিহাসিক উপন্যাসেব গঠন-পারিপাট্যের মধ্যেই কিয়ৎপরিমাণে বয়েছে।

রাজপুত জাতির গৌববগাথা বমেশচন্দ্র তাঁব ব্যক্তিগত বিবৃতিব মধ্যেও প্রকাশ কবেছেন। গজপতির সার্থকতা অনস্বীকার্য। গজপতিব চকিত আবির্ভাব রাজপুত জাতির একটি গুণেব দিকে আলোকসম্পাত কবেছে। তাঁর আবির্ভাব ক্ষণিক কিন্তু প্রভাব স্থায়ী। বমেশচন্দ্রেব সমযে বাঙালি বীর বলে পবিচিত ছিল না এ কথা সত্য, কিন্তু বীবত্বেব প্রতি শিক্ষিত বাঙালির সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল। রাজপুত গৌরবগাথাব মধ্য দিযে সে সেই বীরত্বের স্বাদ পেয়েছে। নরেন্দ্রেব খেদোক্তিতে সেই কথা শুনতে পাই। রমেশচন্দ্র একটি পবিচ্ছেদে রাজপুত চারণেব জ্বালাময়ী ভাষণ উদ্ধার করেছেন। এই ভাষণ আসলে রাজপুতজাতিব চারিত্রিক ভাষ্য। যুদ্ধের কোদণ্ডটংকার কিংবা তার উত্তাপ উত্তেজনা অপেক্ষা এই উদাত্ত আহ্বান কোনো অংশেই ন্যূন নয়। ঐতিহাসিকেবা বলেন ধর্ম এবং জাতি ও দেশেব নামে চারণরা

সৈনিকদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের অবমাননা রাজপুতগৌরবকে কলঙ্কিত করেছে। বৃদ্ধ চারণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশকে আহ্বান করেছেন। এর মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পারি। অতীতের মহত্ত্ব বর্তমান জীবনকেও চকিত করে তোলে।

ইতিহাসের তথ্যবিবৃতির পাশাপাশি রমেশচন্দ্র যে কাহিনীগুলি স্থাপন করেছেন সেগুলির বিচার করি।

প্রথমেই ধরা যাক নরেন্দ্র-জেলেখা উপাখ্যানটি। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে যেমন, এই উপন্যাসেও তেমনি ত্রিভুজ প্রণয়চিত্র অঙ্কনে লেখক ব্যর্থকাম। ত্রিভুজ প্রণয়চিত্রে স্কট রোয়েনা-রেবেকা-আইভ্যানহো-র চলচ্চিত্র কেবল ঘটনা-সংঘাতের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও তিনি যথাসম্ভব করেছেন। আইভ্যানহো একবার রোয়েনা, আর একবার রেবেকা কোটিতে আন্দোলিত হয়েছে। এতে একটা আবর্তসংকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে এর বিপরীত পন্থা অনুসৃত হতে দেখি। জেলেখা সম্পূর্ণ রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। তাতারদেশীয় যুবতীর মধ্যে যে একটা হিংস্র প্রবৃত্তির জ্বালা পাঠকচিত্তগহনে অনুরণন তুলতে পারত রমেশচন্দ্র তাতার রমণীর সে দিকটিকে অপ্রকাশিত রেখেছেন। একবার মাত্র ছুরিকাহস্তে তাকে দেখতে পাই। কিন্তু সেই অবস্থাটি ঘটনার বিবরণমাত্র, হৃদয়দ্বারা স্পৃষ্ট নয়। জেলেখার দেওয়ানা রূপে নরেন্দ্রের পশ্চাৎগমন, এবং তার সেবাপরায়ণা মূর্তি, অবশেষে ব্যর্থপ্রেমের আত্মাহুতি একটা ধীর অকম্পিত আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালা হয়েছে। তবু এই চরিত্রটিতে রোমান্সের দীপ্তি লক্ষিত হয়। চরিত্রবিশ্লেষণ নেই কিন্তু তার কার্যাবলীর মধ্যে অসাধারণত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

মোগল-হারামের বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব সমধিক। নরেন্দ্রনাথ রোগশয্যায়। চারিদিকে সতর্ক প্রহরীর শাসনে অন্তঃপুরের বিলাসিতার মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের লক্ষণ পরিস্ফুট। নরেন্দ্রের কাছে সমস্ত ঘটনাটি স্বপ্ন কিংবা ইন্দ্রজাল বলে বিবেচিত হয়েছে। মোগল-বিলাসিতার বর্ণনার পশ্চাতে দুটি নরনারীর চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা স্থাপিত করে রমেশচন্দ্র মোগল ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের মধ্যেও অন্তঃসারশূন্যতার, রিক্ততার হাহাকার ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজান্তঃপুরে এক দিকে ভোগের চরমতা, অন্য দিকে অবরুদ্ধ জীবনের আর্তনাদ। সমস্ত পরিবেশটির মধ্যে একটা শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

অপর দিকে লেখক রাজপুত জাতির আচার-ব্যবহার রীতিনীতি নিয়ে

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা কবেছেন। সেখানে ঐশ্বর্যেব প্রমত্ততা নেই, কিন্তু নিবাভরণ সৌন্দর্য বয়েছে। যশোবন্তেব রানীব একবাব মাত্র আবির্ভাব ঘটেছে। তাব মধ্য দিয়েই ক্ষাত্রবীর্যেব মহিমা চিবস্মবণীয় হয়েছে। মাড়ওয়ার ও মেওয়াবেব বাজনৈতিক কলহকে কেন্দ্র কবে বমেশচন্দ্র দু-একটি মাত্র ঘটনাব উল্লেখ কবেছেন। স্কট যেমন লোকাচাব প্রাচীন ছড়া লোকনীতিকে অবহেলা কবেন নি, ববং নিজের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিযে তুলতে সেগুলির সাহায্য নিয়েছেন, সেইরকম রমেশচন্দ্রও দেশজ কাহিনী ছড়া প্রবাদ প্রবচন গ্রহণ কবেছেন ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি কববার জন্যে। রমেশচন্দ্র 'মাধবীকঙ্কণে' মাড়ওয়ার ও মেওয়ারের মধ্যে বিরোধটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই ছড়াটির মাধ্যমে—

'আক রা ঝোপরা
ফোক রা বার
বাজরা রারোটি
মথ রা ডাল
দেখো হো রাজা, তেরি মাড়ওয়ার।'[১]

এইটি বাজপুত জাতিব সমাজদর্পণ। শাবদীয়া পূজা পবিচ্ছেদটি বাস্তবধর্মী উপন্যাসে অনাবশ্যক, কিন্তু এই উপন্যাসে এব আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য। এক দিকে রোমান্সবস পবিবেশনে, অন্য দিকে বাস্তবতাব অনুসরণে 'মাধবীকঙ্কণে' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণটি প্রকাশিত।

কিন্তু উপন্যাসটিব দুর্বলতাও প্রচুব। নরেন্দ্রনাথ-হেমলতা-জেলেখা কাহিনী এবং ইতিবৃত্ত সমান্তবাল বেখায় প্রবাহিত। এই দুইয়েব অন্তবাল কোথাও ঘোচে নি। হেমলতাকে লাভ করবাব জন্যেই নবেন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা। কক্ষচ্যুত গ্রহেব ন্যায় নবেন্দ্রনাথ দিশেহাবা। নবেন্দ্রনাথেব সংকল্পকে চবিতার্থ করিবাব যে উদ্যম-প্রচেষ্টা সেইটি ঘটনাজালেব অতিবিস্তাবের জন্য ব্যাহত। যুদ্ধেব ঘনঘটাব মধ্যে, মোগল-দরবার বর্ণনাব ফাঁকে ফাঁকে, বাজপুত গরিমার দীপ্ত মহিমা চিত্রণেব মধ্যে রমেশচন্দ্র হেমলতাব কথা মনে করিযে দিলেও নায়ক-চবিত্রেব মধ্যে উদ্যমহীনতাব ছাপ সুস্পষ্ট। কেবলমাত্র পূর্বস্মৃতি বোমন্থনেব মধ্যে পাঠক নবেন্দ্রেব মানসিক অবস্থাব পবিমাপ করতে সমর্থ হয়। এতে নবেন্দ্রনাথ কেন্দ্রনিযামক শক্তি না হযে গৌণ স্থান অধিকাব করেছে। কাহিনীর আকর্ষণেব মূল কেন্দ্রটিও দ্বিধাবিভক্ত। তবে 'বঙ্গবিজেতা'য় এ ত্রুটি

১. James Tod, ***Annals of Rajast'han***

যতটা অধিক, এখানে সেই পরিমাণে নয়। হেমলতা গ্রন্থের প্রারম্ভে সজীব-প্রাণাবেগের অজস্র উৎসারে গতিচঞ্চল। তার নরেন্দ্রনাথের প্রতি আসক্তি তীব্র ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিদায়দৃশ্যে হেমলতার মধ্যে নরেন্দ্রের স্মৃতি জাগরিত থাকলেও পূর্বের আবেগ মন্থর হয়ে এসেছে। তার আন্তরিকতার মাঝখানে একটা ঔদাসীন্যের সুর বেজে উঠেছে। এর কারণস্বরূপ ডক্টর সুকুমার সেনের ইঙ্গিতটিকে বিস্তৃত করা যায়।[১] তিনি বলেছেন কাহিনীটির পশ্চাতে টেনিসনের এনক আর্ডেনের ছায়াপাত ঘটেছে। এনক আর্ডেন—নরেন্দ্র, ফিলিপ—শ্রীশচন্দ্র, অ্যানি লি—হেমলতা। টেনিসনের কবিতাটিও কাহিনী-মূলক। তথাপি এনক আর্ডেনে গীতিকবিতার ধর্ম অব্যাহত। কতগুলি ইঙ্গিতের সাহায্যে কবি এই তিনটি চরিত্র বর্ণনা করেছেন। এনক আর্ডেনের চরিত্রের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাধর্ম্য বজায় আছে। নরেন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন, **Enoch Arden**ও তাই—

'And Enoch Arden, a rough sailor's lad
Made orphan by a winter ship-wreck, play'd. '

এনক আর্ডেনের অ্যানি লির কাছ থেকে বিদায়দৃশ্যটিও নরেন্দ্রনাথের হেমলতার কাছ থেকে বিদায়দৃশ্যের অনুরূপ। সমুদ্র-উপকূলে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এনক আর্ডেন একটি মাত্র আশা নিয়ে যখন আবার ফিরে এল, তখন সে জানতে পারল ফিলিপের সঙ্গে অ্যানি লি বিবাহিত। এনক আর্ডেনের খেদোক্তিতে কবিতার পরিসমাপ্তি। রমেশচন্দ্র এই প্রণালী অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উপন্যাস আর গীতিকাব্য এক নয়। ঔপন্যাসিক চরিত্রের পরিবর্তন নানা বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিস্ফুট করবেন। কবি যেখানে কেবলমাত্র বর্ণনার আশ্রয় নেন, ঔপন্যাসিক সেইখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলবার জন্য পাঠকের নিকট বিশ্লেষণ করতে প্রতিশ্রুত। বিশেষত হেমলতার পরিবর্তনটি যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত। তবে নিছক গীতিধর্মিতার দিক দিয়ে দুটি নরনারীর প্রেমের উত্থানপতন, ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর্ডেনের খেদোক্তি করুণ। তার আর্ত হাহাকার নরেন্দ্রনাথের মাধবীকঙ্কণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ-হেমলতার প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনীর তুলনা করেছেন।[২]

---

১. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

২. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

শৈলেশ্বরের ভূমিকায় রোমান্টিকতাব চূড়ান্ত রূপ পরিস্ফুট। শৈবলিনী বিরলদৃষ্ট হলেও বর্ণনাকৌশলে সুন্দর।

মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

১২৮৩ বঙ্গাব্দে মাধবীকঙ্কণ বচনাব পব বৎসবই 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্রেব কিছু কিছু ইংরেজি বচনাও বাব হল। প্রথম দুই উপন্যাসেই রমেশচন্দ্রেব প্রতিষ্ঠা ঘটে। পূর্বে বলেছি প্রথম দুটি উপন্যাসে ইতিহাস বিশেষ মূল্য পায় নি। অথচ ইতিহাসেব প্রতি লেখকের অনুবাগ পূর্ণমাত্রায বর্তমান। 'বঙ্গবিজেতা'য় এবং 'মাধবীকঙ্কণে' প্রণয়-কাহিনীগুলিও যথাযোগ্য মর্যাদায় চিত্রিত হয় নি। আবও একটি কথা মনে হয় যে বমেশচন্দ্র বঙ্গদেশেব ইতিহাস নিযে উপন্যাস বচনা কববাব উৎসাহ বোধ কবলেও উপাদানেব অভাবে তাঁব আশা সফল হয নি। বাংলাব ইতিহাস বর্ণনা কবতে গিয়ে লেখক স্বচ্ছন্দ বোধ কবেন নি। ১৮৭৭ সালে ছদ্মনামে বাংলা-দেশেব প্রাচীন কবিসাহিত্যিকেব জীবনী প্রকাশ কবলেও প্রাচীন বাংলার সামাজিক বীতি-নীতি, বিধিবিধান সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য লেখক পান নি। তা না হলে বঙ্গবিজেতায তিনি তদানীন্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নৈতিক কাঠামোকে ফিউডাল আখ্যায় অভিহিত কবলেও ফিউডালিজমের স্বরূপ নির্ণয কবতে পাবেন নি। 'বঙ্গাধিপ পরাজযে' প্রান্তীয় রাজকাহিনী স্থান পেলেও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন এই কারণে রাজপুত বীবত্বগাথা অতি সহজে বমেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। 'মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে' নবজাগ্রত মহাবাষ্ট্রবীবের কাহিনী সংকলিত। শিবজীব অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেক বাঙালিই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজী রাজপুত জাতিব কাছে দেশপ্রেমের বাণীটি পেলেন। বাজপুত জাতি তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল, স্মৃতিবোমন্থনে তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। প্রতাপেব বীরত্বকাহিনী রাজপুত জাতিব চিত্তচাঞ্চল্য ঘটালেও আওবঙ্গজেবের কৌশলের কাছে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। সুতবাং শিবজীই রাজপুতপবিত্যক্ত বিজয়গৌরবেব উত্তবাধিকাবী। ভূদেব মুখোপাধ্যাযও শিবজীব কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে ভূদেবের কাহিনীতে বোশিনাবা উপাখ্যানের প্রাধান্যের জন্যে ইতিহাসের অন্যতর প্রয়োজনীয়তার দিকটি খানিকটা অবহেলিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের

কাছে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে শিবজী দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, জ্বলন্ত ভাষায় রাজা যশোবন্তকে উত্তেজিত করবার যে প্রচেষ্টা শিবজীর মধ্যে দেখতে পাই রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের পূর্বাভাসরূপে তাকে গণ্য করা যায়। ভূদেবের স্বপ্ন রমেশচন্দ্রের মননকল্পনায় আবদ্ধ হল। এই উপন্যাসে অপর আর-একটি কাহিনীর সার্থকতাও এইখানে। তিলকসিংহের এবং পৌত্র গজপতি সিংহের পুত্র রঘুনাথের যে করুণ মধুর রূপটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাতেও রাজপুত গরিমাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে রাজপুত ও মারাঠা-জাতিকে লেখক একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাচীন হিন্দু গৌরবকে পুনরুদ্ধার কাজে যে সমস্ত রাজা আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই লেখকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। রমেশচন্দ্র নিজেও রাজপুত-মারাঠা মিলনসূত্রটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। রমেশচন্দ্রের বাসনা ছিল মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান নিয়ে আর-একটি উপন্যাস রচনা করবার। এই বিষয়েও রমেশচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য দেখি। ভূদেব স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কল্পনাময় ছবি এঁকেছেন। রমেশচন্দ্রের বাসনা অন্যরূপ। তার প্রকৃত রূপ কী হত আমরা জানি না। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ লেখবার প্রত্যক্ষ কারণ কী তা তিনি নিজেই বলেছেন—

'I remember the solitary evenings when I encamped in the midst of the rice-fields of Dakhin Shahbazpur a sea-washed island in the mouth of the Ganges when I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Mahrattas, and spent my nights in dreaming over story of Sivaje.

Duffএর *History of the Mahrattas* গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। এটির প্রকাশকাল ১৮২৬ সাল। সমগ্র মারাঠা জাতির উত্থান ও পতন গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রথম খণ্ডে শিবজীর ইতিহাস। রমেশচন্দ্র এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে শিবজীর পূর্বজীবন বর্ণনা করেছেন।

শিবজীর মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ, জয়সিংহের সঙ্গে সহায়তা, এবং যশোবন্ত সিংহের আনুকূল্য সবই বর্ণনা করেছেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের কাহিনীও Duff থেকে গৃহীত।

চন্দ্ররাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত। তবে শিবজীর প্রথম জীবনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার মধ্যে চন্দ্ররাওয়ের নাম পাচ্ছি। চন্দ্ররাও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এইটি বংশগত নাম। চন্দ্ররাওকে বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে না পেরে শিবজী কৌশলে রঘুনাথ দ্বারা তাঁকে হত্যা করান। ডফ যে বিবৃতি দিয়েছেন যদুনাথ সরকারও সেই মত

বিষয় উল্লেখ করেছেন। সকলেই মনে কবেন শিবজীর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পবে কৃষ্ণজী অনন্ত সভাসদেব বচিত শিব-ছত্রপতি-চেন সপ্তম-প্রকরণ-আত্মক-চরিত (১৬৯৪) গ্রন্থে শিবজীব এই ঘটনাব উল্লেখ আছে। ডফ প্রকাশ্যভাবে শিবজীব নিন্দা করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যদুনাথ সরকার শিবজীর এই ঘটনাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবতে চান নি। তিনি মনে কবেন বাল্যকালেব অস্থিবমতিত্বই এব জন্য দায়ী। বমেশচন্দ্রেব পক্ষে আধুনিক গবেষণা জানা সম্ভব ছিল না। শিবজী তাঁব দৃষ্টিতে আদর্শ চবিত্র। স্থতবাং তিনি বীরেব এ কলঙ্ক মোচন কববেন এটা স্বাভাবিক। চন্দ্রবাও মাবাঠাবাসী। প্রকৃত যোদ্ধা ও বীব। কিন্তু শিবজীব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব জন্যই তাব মৃত্যু এইটি রমেশচন্দ্র প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবেছেন। চন্দ্রবাও চবিত্রটিব মধ্যে ঐতিহাসিক অনুগতি বেখেও বমেশচন্দ্র অন্য উপাযে তাব প্রযোজন সাধন কবতে চেযেছেন। দ্বিতীযত দেখতে পাই চন্দ্রবাওকে হত্যা কবে বঘুনাথ নামে শিবজীব এক অনুচব। উপন্যাসেও চন্দ্রবাওযের মৃত্যুব গৌণ কাবণ বঘুনাথ হাবিলদাব। চন্দ্ররাও লক্ষ্মীবাঈযেব স্বামী। লক্ষ্মীবাঈযেব প্রতি ভালোবাসা তাব রাজনৈতিক জীবনেব জটিলতার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনাব বিষয। ক্রমাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাব মোহে সে যখন কপটতাব আশ্রয় নেয় তখনও লক্ষ্মীবাঈকে সে প্রতাবণা কবে নি। এইটি চন্দ্ররাওয়েব জীবনের মহত্ত্বেব দিক। আর বাজনৈতিক দাবাখেলায় এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কপটতার স্থান যে একেবাবে নেই তাও অস্বীকাব কবা যায় না। চন্দ্ররাওয়ের প্রতি লেখকেব যে সহানুভূতি ছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ পাই লক্ষ্মীবাঈয়ের সহমবণ দৃশ্যটিতে। ভ্রাতা রঘুনাথেব স্নেহ, ব্যাকুলতা, নিষেধ সবকিছুকে উপেক্ষা কবে লক্ষ্মীবাঈ চন্দ্ররাওয়ের অনুমৃতা হয়েছে। লক্ষ্মীবাঈয়েব প্রতি পাঠকেব আকর্ষণ এবং সমবেদনা অধিক। স্থতরাং এক দিকে ইতিহাসেব অনুগতি, অন্য দিকে লেখকেব কল্পনাপ্রবণতা চরিত্রনির্মাণে সহায়তা করেছে।

শিবজীর পলায়নেব দৃশ্য-বর্ণনায় লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আওবঙ্গজেব কর্তৃক অপমানিত হয়ে বন্দী শিবজী বাজধানীতে আশ্রয় পেলেন। তাঁব পলায়ন-কাহিনী ইতিহাসেব একটি স্মবণীয অধ্যায। বমেশচন্দ্র পলায়ন-কাহিনীটির মধ্যে চমৎকাবিত্ব স্মৃষ্টি কববার জন্যে যে নূতন ঘটনাটি যোজনা কবেছেন তা তাঁব বচনাকর্মেব নৈপুণ্য প্রকাশ কবে। ঘটনাটি যোজনার মধ্যে লেখকের গল্পরস পরিবেশন করবার ক্ষমতার চিহ্ন বর্তমান। শিবজী পথে মোগল

মধ্যে রোমান্সের দীপ্তি এনে দিয়েছে। অথচ কোনো অলৌকিকতার দ্বারা এই অতর্কিত দৃশ্যটি অতিপ্রাকৃতের স্তরে উন্নীত হয় নি। রাজপুত জাতির বিশ্বস্ততা এবং আত্মমর্যাদাবোধ এই দুই-ই যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে রঘুনাথের চরিত্রে।

গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্র অনৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে শিবজীর চরিত্র মুখ্যতম। ডফ শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন,

'To form an estimate of his character, let us consider him assembling and conducting a band of half naked mawulees through the wild tracts where he first established himself, unmindful of obstruction from the elements, turning the most inclement seasons to advantages, and inspiring the minds of such followers with undaunted enthusiasm. Let us also observe the singular plans of policy he commenced, and which we must admit to have been altogether novel, and most fit for acquiring power at such a period. **For a popular leader his frugality was a remarkable feature in his character * Shivajee was patient and deliberate in his plans ; ardent, resolute, and persevering in their execution '

এর পর ডফ শিবজী চরিত্রের কয়েকটি কলঙ্কের দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা শিবজী চরিত্রের অন্যতম দিক। অপর পক্ষে যেখানে কেবল ক্ষমতার দ্বারাই জয়লাভ নিশ্চিত সেখানেও শিবজী কপটতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। ডফের উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

'Let us contrast his craft, pliancy, and humility with his boldness, firmness, and ambition , his power of inspiring enthusiasm while he showed the coolest attention to his own interest , the dash of a partizan adventurer, with the order and economy of statesman , and lastly, the wisdom of his plans which raised the despaired Hindoos to sovereignty, and brought about their own accomplishment when the hand that had formed them was low in the dust.'

শেষের উক্তিটি লক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র একেই বড়ো করে দেখেছেন। হয়তো শিবজীকে নিয়ে কাহিনী গড়ার স্বপ্ন এই উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। ডফ শিবজী চরিত্রের যে ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন সেগুলি আসলে শিবজীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয়। রাজনীতি নিস্তরঙ্গ বস্তু নয়। বঙ্কিমপথগামী বলেই রাজনীতির চোরাবালিতে মুহূর্তের ভ্রম জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। শিবজী রাজনীতি-বিচক্ষণ ছিলেন। সুতরাং প্রয়োজনবোধে কপটতার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। আফজল খাঁর কাহিনী মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে অনুল্লিখিত। হয়তো রমেশচন্দ্র ডফকে অনুসরণ করেছিলেন বলেই আফজল খাঁ কাহিনীটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেছিলেন। তখনকার ইতিহাসচর্চায় নিরাসক্ত দৃষ্টির অভাব ছিল বলেই কি শিবজীর এই আচরণকে ডফ এত বাড়িয়ে দেখেছিলেন ?

যাই হোক, গ্রন্থের মধ্যে জয়সিংহ-শিবজীর যে কথোপকথন দেখতে পাই তা রমেশচন্দ্রের মৌলিক উদ্‌ভাবনশক্তির পরিচয় দেয়। ইতিহাসে জযসিংহেব সঙ্গে শিবজীব যুদ্ধবর্ণনাও কম মর্যাদা পায় নি। জয়সিংহেব সঙ্গে শিবজীব বন্ধুত্বও নিতান্ত বাজনৈতিক। আধুনিক কালেব ইতিহাসলেখকও তাই বলেছেন। কিন্তু বমেশচন্দ্র এই বন্ধুত্বেব মধ্যে এক নবতব ইঙ্গিতেব সন্ধান পেয়েছেন। পূর্বে বলেছি বাজপুত জাতিব জীবনসন্ধ্যাব পব মাবাঠার অরুণোদয় শিবজীর মধ্য দিযে ঘটল। লেখক একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানেন নি। আওবঙ্গজেবের সংশয়প্রবণতার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল না ফলে বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। জয়সিংহেব প্রতি সম্রাটেব আচরণ প্রশংসনীয় ছিল না। মৃত্যুব প্রাক্‌কালে জয়সিংহ তা বুঝতেও পেরেছিলেন। আজীবন বিশ্বস্ততার প্রতিদানস্বরূপ তিনি যখন আওবঙ্গজেবের কাছ থেকে কেবল অবজ্ঞাই পেলেন তখন তাঁর চৈতন্যোদয হল। জয়সিংহ মৃত্যুকালে সেই সত্যটি উপলব্ধি কবলেন। বমেশচন্দ্র ইতিহাসেব থেকে এই ইঙ্গিত পান নি। এটি তাঁব কল্পনাপ্রসূত। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যায শায়িত জযসিংহেব সঙ্গে শিবজীব বাখীবন্ধন স্থাপিত হল। শিবজীব জীবনে এটি চবমতম মুহূর্ত। উপন্যাসটিও এব কযেক অধ্যায পবে শেষ হযেছে। বস্তুত শিবজীব ভবিষ্যৎ জীবনেব বীজটি এই দৃশ্যেই সংস্থাপিত। আওবঙ্গজেব অন্যায় আচবণেব দ্বাবা চাবি দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করেছেন।

'অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধু ধু শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে মোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইযা গেল। তাহার পব? তাহার পর, মহারাষ্ট্র জাতিব নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ। অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।'

শিবজী বাজপুতেব আশীর্বাদ শিবোভূষণ কবে বললেন—

'পূর্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের প[illegible]ক্ষ সামান্য প্রভাত নহে। মহারাষ্ট্রগণ। অদ্য আমাদের জীবনপ্রভাত সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিযা গর্জিযা উঠিল, অদ্য আমাদেব জীবনপ্রভাত।'

এ থেকে লেখকেব আসল অভিপ্রাযটি বুঝে নিতে কষ্ট হয না। রমেশচন্দ্রেব উপন্যাসে স্কটেব প্রেবণা থাকলেও এই ক্ষেত্রে স্কটপ্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসব হন নি। বমেশচন্দ্রেব বচনায় ইতিহাসেব ঘটনা অনুগতি ও কালানুক্রমের উল্লেখযোগ্য রূপান্তব নেই। ইতিহাসের সত্যকে তিনি বরাবর মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। এই কারণে শিবজীর ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য থেকে তিনি মাত্র [illegible] দিক বেছে নিয়েছেন। নূতন সংযোজনা হিসেবে রঘুনাথ হাবিলদারের

কাহিনীটি অন্যতম। ভবানী দেবীর কথাটিও ইতিহাসে উক্ত। ভূদেব যেখানে রামদাস স্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র সেখানে সরযূবালার পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অন্যান্য আর যে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলি ঐতিহাসিক। শিবজীর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ, যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ, জয়সিংহের নিকট নতি স্বীকার, আগ্রায় গমন এ-সবই ঐতিহাসিক। শিবজীর চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের সময়ে। শিবজী অসমসাহসী যোদ্ধা আবার রণনীতিকুশল। শায়েস্তা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করবার পূর্বে ছদ্মবেশে শিবজীর সমস্ত পুণা নগরী ভ্রমণ এবং গোপনে যুদ্ধসজ্জা ইতিহাসে লেখে না। রমেশচন্দ্র এই ঘটনাটি দ্বারা শিবজীর জীবনে নূতন আলোকপাত করেছেন। শিবজী যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মারাঠা প্রধানদের নিষেধ মানলেন না। নিজে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। শিবজীর মাতৃভক্তি এবং দেশপ্রীতির মহৎ দিকটি তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। রঘুনাথ হাবিলদারের অসমসাহসিকতায় শিবজী যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। হাবিলদারের এই বীরোচিত কার্যের জন্য শিবজীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করে জয়লাভ করবার পর চন্দ্ররাওয়ের অভিযোগে শিবজী বিচলিত হলেন। রঘুনাথ যখন যশের চরমতম শিখরে, তার বহুদিনের সঞ্চিত স্বপ্ন যখন সাফল্যের পথে তখন বজ্রাঘাতের মতো শিবজীর ন্যায়দণ্ড এল। শিবজী চরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিবজী প্র্যাকটিক্যাল রাজনীতিবিদ। রাজনীতির সূচ্যগ্র মুখে কোনো ভাবালুতার প্রশ্রয় তিনি দেন নি। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কিন্তু শিবজী কেবল রাজা মাত্র নন, কেবল যোদ্ধা নন। রাজনীতির জটিলতা তাঁর স্নেহমমতাকে আড়াল করলেও মাঝে মাঝে তাঁর প্রশস্ত হৃদয়কেও রমেশচন্দ্র উদ্ঘাটিত করেছেন। যখন শিবজী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই দণ্ড ন্যায়ের ভিত্তির উপর নয় তখন তাঁর অনুশোচনার অন্ত ছিল না। দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার সমবেদনাও উপন্যাসে করুণ আবহের সৃষ্টি করেছে। উপন্যাসটিতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। রঘুনাথ রাজপুত, তার উপরে এই দণ্ডের যথাযোগ্য সম্মান সে দিয়েছে প্রতিশোধ নিয়ে নয়, প্রভুর প্রাণরক্ষা করে। যদুনাথ সরকার শিবজীর গুরু রামদাস স্বামীর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যকে 'ফলিত গীতা' বলেছেন।[১] শিবজী তার বাস্তব উদাহরণ। রমেশচন্দ্র রামদাস স্বামীর উল্লেখ

১. যদুনাথ সরকার, শিবজী

করেন নি। শিবজীকে ঈশানীর ভক্ত বলেছেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দেবীর আদেশের প্রয়োজনও শিবজী স্বীকার করেন। মধ্যযুগীয় মানুষের নিকট এই জাতীয় ধর্মবিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক। সেকালের সমাজজীবনে মানুষের কাছে ধর্ম বহিরঙ্গ বস্তু ছিল না, তা ছিল অন্তরঙ্গ। এইটি স্মরণে না রাখলে মধ্যযুগ সম্বন্ধে বিচারে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। শিবজীর জীবনের অন্যতম দিক এই ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মবিশ্বাসের ফলেই তিনি অনুভব করেছিলেন হিন্দুজাতির ধর্ম রক্ষা করাও তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে গভীর প্রত্যয়ে তিনি 'ভবানী'র খড়্গ হাতে করেই হিন্দুধর্ম রক্ষার শপথ গ্রহণ করতেন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব এক দিক থেকে ঐতিহাসিকের অপেক্ষা জটিল। কেননা তাঁর কর্তব্য দ্বিবিধ। এক দিকে ইতিহাসের সত্য রক্ষা করা, অন্য দিকে সাহিত্যের মূল নীতিগুলির অনুসরণ। ইতিহাসের সত্যের দিক থেকে রমেশচন্দ্র শিবজীকে হিন্দু বীর হিসেবে দেখেছেন। এ দেখা কোনো সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত নয়। শিবজীর বাস্তবরূপ যা তারই প্রতিফলন। রামদাস স্বামীর শিষ্য শিবজীর আচরণের মধ্যে কোনো ভুল থাকা সম্ভব নয়।

আবার রমেশচন্দ্র শিবজীর যুদ্ধবিগ্রহ রণনীতি অপেক্ষা তাঁর স্বপ্নকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন। এমন-কি অনেক সময়ে চরিত্রচিত্রণে লেখকের উদ্দেশ্য-মূলকতার আরোপ ঘটেছে। উপন্যাসে লেখকের দীর্ঘ উক্তিগুলি তাঁর দেশপ্রীতিকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়। শিবজী যশোবন্তের কাছে এবং জয়সিংহের কাছে হিন্দুধর্মের নামেই আবেদন জানিয়েছিলেন। এর মধ্যে কৌশলের কোনো স্থান ছিল না। তাঁর আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর, ধর্মবিশ্বাসের বেগবতী প্রবাহ পাঠক-সাধারণের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের পদাতিক জীবনে ইতিহাসের অশ্বারোহী সৈনিকের দ্রুত নিশ্বাস অনুভব করি। এ কথা ঠিক শিবজী চরিত্র-অঙ্কনে লেখকের রোমান্সপ্রিয়তাই জয়ী হয়েছে। তবে এ রোমান্সও জীবনবিবিক্ত নয়, জীবনোত্থিত।

শিবজীর চরিত্র আলোচনার দিক থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। রমেশচন্দ্রের রচনাসম্ভার ইতিহাসঘটিত। উপন্যাসগুলিও তার একটি অঙ্গ। কেবলমাত্র 'সংসার' 'সমাজ'কে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসরূপে দেখা উচিত। প্রাচীন বৈদিক ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা অপরিসীম। রামায়ণ মহাভারতের প্রতি আসক্তি তো ছিলই। লেখকের রামায়ণ মহাভারতের প্রতি প্রীতি বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণে দেখেছি। শকুনি মহাভারতের

শকুনির আধুনিক সংস্করণ। সরলা, হেমলতা দুঃখের দিনে মহাভারতের কাহিনী শুনে যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করেছিল।

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে'ও রমেশচন্দ্র মহাভারতের উল্লেখ করেছেন। এর থেকে লেখকের মানসপ্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। শিবজীকেও তিনি মহাভারতের বীররূপে দেখেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দের আলোচনায়ও দেখি এর সমর্থন। উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ লেখকই কর্মযোগী। উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত পরিকল্পনা লেখকবৃন্দের কল্পনাপ্রসূত নয়, এর পশ্চাতে সামাজিক উত্থানের প্রবলতর বেগটিকে লক্ষ্য করা উচিত। রমেশচন্দ্রও এই প্রবাহের টান অনুভব করেছেন। তিনিও আদর্শ বীরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিবজীর মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে, বৈদিক সভ্যতার অরুণোদয় ঘটবে, স্বাধীনতার মর্মবাণীটি ধ্বনিত হবে এইটিই লেখকের কাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ মারাঠাদের পতনের কারণ সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন। শিবজী বিভেদ-মূলক ধর্মসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারেন নি।

'ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, সেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া, এমন-কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরও সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি হয়তো রমেশচন্দ্রের ছিল না। থাকলেও শিবজী চরিত্র অঙ্কনে এ বিরোধকে বড়ো করে দেখাবার সুযোগ তখন ছিল না। কেননা শিবজীর চরিত্রে যুগের আনুগত্য রক্ষা করা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দৃষ্টি নির্মোহ নয়, তবে অবহেলার বস্তু নয়। স্বপ্নসম্ভাবনা বাস্তবাতিরিক্ত তো বটেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভূদেব, রমেশ ইত্যাদি লেখকবৃন্দ নিছক সাহিত্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থ রচনা করেন নি। গ্রন্থগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতা সুস্পষ্ট।

যশোবন্ত সিংহ-জয়সিংহের চরিত্র রাজপুত জাতির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যটিকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। যশোবন্ত সিংহের পরিচয় পেয়েছি 'মাধবীকঙ্কণে'। সেই কারণে এই উপন্যাসে তাঁর স্থান স্বল্প। জয়সিংহের চরিত্রটিতে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের অনুগতি পাই। ডফ জয়সিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন নি। করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি।

ডফেব ইতিহাসে জয়সিংহেব আচাব আচবণেব মধ্যে আমবা রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্যটি দেখেছি। শিবজীকে কবায়ত্ত কববাব পব দিলীর খাঁর নিকট তাঁকে প্রেবণ কবার মধ্যে জয়সিংহেব বণনীতিকুশলতার পবিচয়। রমেশচন্দ্র জয়সিংহেব চবিত্রটিব আদর্শ পেযেছেন টডেব বাজস্থান থেকে। দিলীর খাঁব প্রসঙ্গ 'জীবন-প্রভাতে' অনুপস্থিত। জযসিংহেব বিশ্বস্ত অনুচব গজপতির সাক্ষাৎ পাই মাধবীকঙ্কণে। গজপতিব প্রাণদান জযসিংহেব শিক্ষাব ফল। বঘুনাথ হাবিলদার জয়সিংহেবই প্রতিরূপ। জযসিংহ আওবঙ্গজেবের উপযুক্ত সেনাপতি। কিন্তু আওবঙ্গজেব তাঁকে বিশ্বাস করতে পাবেন নি। রামসিংহেব পুনঃ পুনঃ অনুবোধেও আওবঙ্গজেব জযসিংহেব সাহায্যেব জন্য সৈন্য পাঠান নি, জয়সিংহেব প্রতিশ্রুতিমত আওবঙ্গজেব শিবজীব উপব সুবিচাব কবেন নি। তথাপি জয়সিংহেব ক্ষোভেব মধ্য দিযেও বাব বাব বিশ্বস্ততাব সুবটি ধ্বনিত হযেছে। যশোবন্ত সিংহ যেখানে বাজনীতিব চোবাবালিতে বাঁধ বাঁধবাব স্বপ্নে বিভোব সেখানে জযসিংহ দূবদর্শিতাব দ্বাবা নিজেব স্বরূপকে উজ্জ্বল কবেছেন। জয়সিংহ মৃত্যুকালেও শিবজীকে আশীর্বাদ কবে গেছেন। প্রকৃত বাজপুতেব ঔদার্য এবং ক্ষমাগুণ তৎসঙ্গে যোদ্ধাব বীবত্ব জযসিংহেব মধ্যে এসে মিলেছিল। বমেশচন্দ্রেব পক্ষে এ চবিত্রেব কল্পনায বং চডানো সম্ভব ছিল না। টড যেমনভাবে এঁকেছেন তিনিও তাঁকে সেইভাবে প্রকাশ কবেছেন। শিবজীব প্রসঙ্গেব বিস্তৃতিব জন্য জযসিংহেব স্থান সংকুচিত হলেও আমাদেব মনে তাব প্রভাব চিবস্থাযী।

সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক একটি প্রেমোপাখ্যান মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে স্থান পেযেছে। বঘুনাথ হাবিলদার ও সবযুবালাব প্রেমদৃশ্যটি ইতিহাসেব বাজপথ অনুসবণ কবে নি। এই প্রেমদৃশ্যেব সার্থকতাও বেশি নেই। তবে রাজপুত রমণীব প্রেমেব একাগ্রতা, অবিচল নিষ্ঠা সবযুবালাব মধ্যে দেখা যায়। ইতিহাসেব ঘটনাবলীই তাদেব জীবনে বেদনাব সঞ্চার কবেছে, পবিশেষে মিলনেব সবল পথে ঘটনাটিব পরিসমাপ্তি। সবযুবালাব প্রেমে আবেগ লক্ষ্যগোচব হয।

আওবঙ্গজেবেব ভূমিকাও সুপরিস্ফুট। মাধবীকঙ্কণে এবং মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে বমেশচন্দ্র আওবঙ্গজেবেব ছলনা, ক্রূরতা কুটিলতাকে ফুটিযে তুলেছেন। এতে ইতিহাসেব অনুগতি আছে পূর্ণমাত্রায।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে স্বদেশীপ্রেরণা ছিল। বমেশচন্দ্র নিজে 'এনসাই-

ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় সে কথা বলেছেন। আনন্দমঠের আদর্শে রচিত রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসে সেই স্বদেশী-প্রেরণার বীজ দেখতে পাই।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রমেশচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত। পূর্বের উপন্যাস দুটিতে পরিচ্ছেদের কপালটুকি উদ্ধৃতি ছিল ইংরেজ কবির কবিতাংশ। এ উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হয়েছে বাঙালি কবির রচনা।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

রমেশচন্দ্র 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে' তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বলেছেন:

'পাঠক। একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।'

বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের এইটি ধ্রুবপদ। প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ভূদেব নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ প্রচার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের লক্ষ্যের একটা মিল দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য নীতিজ্ঞান প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় এ বোধও তাঁর ছিল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টিস্ট সত্তা এই নীতিজ্ঞানকে যথাসম্ভব অন্তঃশীলা করবার চেষ্টায় রত। রমেশচন্দ্রের রচনায় নীতিপ্রচার কিছুটা অতর্কিত, কিছু পরিমাণে অবারিত। এই কারণে উপন্যাসগুলির মধ্যে বার বার একই প্রসঙ্গের অবতারণায় পাঠক ক্লান্তি বোধ করে। 'বঙ্গবিজেতা' থেকে 'জীবন-সন্ধ্যা' পর্যন্ত রাজপুত ঐশ্বর্যের স্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে প্রোজ্জ্বল করবার বাসনা লেখকের মধ্যে প্রবল। এ প্রবলতা অনেক সময়ে সাহিত্যের ঔচিত্য-বোধকে নষ্ট করে দিয়েছে। 'মাধবীকঙ্কণে,' 'জীবন-প্রভাতে', 'জীবন-সন্ধ্যা'য় চারণের গীতগুলি একঘেয়েমি দোষে পাঠকের মনকে পীড়িত করে। গীতগুলি উচ্চভাবপূর্ণ, আবেদনের নিবিড়তায় এবং গভীরতায় মর্মস্পর্শী সন্দেহ নেই, কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাবে সাড়া জাগাতে পারে না। এমন-কি টডের বৃহদায়তন রাজস্থান গ্রন্থে রাজপুতজাতির গৌরবগাথাগুলি একই খাতে প্রবাহিত। সেই জহরব্রত, সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই রাজপুত-মোগল-বিরোধ। সুখপাঠ্য হলেও মানবজীবনের বিভিন্নমুখী লীলাবৈচিত্র্য টডের

রাজস্থানে নিতান্তই কম। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে একই বর্ণনাব রোমন্থনের জন্ত মনে হয় **লেখক আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে বন্দী**। মাঝে মাঝে দু-একটি সূক্ষ্ম ঘটনা কল্পনাবলে সৃষ্টি করলেও লেখকের ইতিহাসের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্য উপন্যাসের প্রাণধর্মকে বিচলিত করেছে। এই ত্রুটি 'জীবন-সন্ধ্যা'তে অতিমাত্রায় দেখা দিয়েছে।

রমেশচন্দ্রের ত্রুটির কথা মনে রেখেও এ কথা বলা যায় যে 'জীবন-সন্ধ্যা'তে লেখক অন্য প্রসঙ্গ অবতারণায় কম কৃতিত্বেব পবিচয় দেন নি। সেইটি হচ্ছে গৃহবিবাদ। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে লেখক রাজপুতজাতিব দুর্বলতার চিহ্নটিকেও ধবতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার ইঙ্গিতটিকেই রমেশচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে পবিস্ফুট কবেছেন। সম্ভবত তিনি এই গৃহবিবাদের বিষময় প্রক্রিযা সমসামযিক বাঙালিসমাজকে জানাতে চেযেছেন। কারণ দেশেব কল্যাণচিন্তা বমেশচন্দ্রেব আজীবন সাধনা, দশেব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই তাঁব সাহিত্যপ্রচেষ্টাব লক্ষ্য।

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' বাব হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। বঙ্গবিজেতায় টোডবমল্লেব কাহিনী অনুসৃত, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে সুরেন্দ্রনাথের বীবত্ব; মাধবীকঙ্কণে যশোবন্ত সিংহেব প্রসঙ্গ উত্থাপিত, তথাপি মূল আকর্ষণ নবেন্দ্রনাথ-হেমলতা প্রসঙ্গ; জীবন-প্রভাতে শিবজীই কেন্দ্রীয় এবং নাযক চবিত্র। সুতরাং বাজপুত-কাহিনী রমেশচন্দ্র এখনও লেখেন নি। অথচ তাঁব মতে আধুনিক যুগেব সূত্রপাত রাজপুত জাতিব অভ্যুত্থানে। জীবন-সন্ধ্যাতে বমেশচন্দ্র সে চেষ্টায় ব্রতী হলেন। ঐতিহাসিক উৎস তিনি নিজেই গ্রন্থশেষে দিযেছেন। রাণা প্রতাপ সম্বন্ধে টডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষণীয়। তিনি হলদীঘাটের যুদ্ধকে থার্মপলির যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টড মনে করেন থুকিডিডেসের মতো ঐতিহাসিকের অভাবেই প্রতাপের কাহিনীটি কেবলমাত্র স্থানীয় ইতিবৃত্তে সীমাবদ্ধ, উপযুক্ত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটলে রাজপুত বীরের এই কাহিনীটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেতে পারত। আকবর কৌশলে অনেক রাজপুত বীরকেই নিজের পক্ষভুক্ত করতে সমর্থ হন। মানসিংহ এঁদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু প্রতাপ কখনও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। অন্য দিকে প্রতাপের সাহায্যার্থে অন্যান্য রাজপুত বীররা মিলিত হন। রমেশচন্দ্র প্রতাপের বীরত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজপুত জাতির 'স্বামীধর্মে'র প্রশংসা করেছেন এবং সম্ভবত তাঁর উপন্যাসের অন্তর্নিহিত শিক্ষাটিও তাই। তা না হলে সমবেত-

ভাবে রাজপুত জাতির 'স্বামীধর্মে'র প্রতি আস্থা স্থাপন দৃশ্যটি রমেশচন্দ্র বিস্তৃতভাবে বলতেন না। দ্বিতীয়ত এ কথা পরিষ্কার যে প্রত্যেক চরিত্রের বীরত্বের উৎসও এই 'স্বামীধর্মে'র আনুগত্যের মধ্যে। এমন-কি কৃচ্ছ্র সাধনা, লাঞ্ছনাভোগও একই উৎস হতে উৎসারিত। রাজপুত নায়কদের অন্তর্বিরোধের তিক্ত দিকটি রমেশচন্দ্র বিস্তৃতভাবে এই উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন। তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহের কলহটি আসলে রাজপুত জাতির চিরন্তন বিরোধেরই জের। রমেশচন্দ্র উপন্যাসের একস্থানে জ্ঞাতিবিরোধের বিষময় ফল সম্বন্ধে বলেছেন :

'হায়। হায়। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই। জ্ঞাতিবিরোধের জন্য অদ্য রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু।'

এর পর রমেশচন্দ্র টডের রাজস্থান থেকে মানসিংহ-প্রতাপসিংহের কাহিনীটি সংকলন করেছেন। মানসিংহ মোগলদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, বর্তমানে মোগলের অন্নে আশ্রিত। সুতরাং মানসিংহ এবং প্রতাপসিংহের একাসনে আহার নিষিদ্ধ। এ বিরোধের মূল উৎপাটিত হলে রাজপুত ইতিহাস হত অন্যরূপ। কিন্তু বংশগত কৌলীন্যের কাছে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত হয়েছে। উপন্যাসের এই যেমন একটি দিক আছে, অন্য দিকে টডের ইতিহাসে নেই রমেশচন্দ্র এমন একটি উপকাহিনী যুক্ত করে জ্ঞাতিবিরোধ সত্ত্বেও প্রয়োজনবোধে রাজপুত যে ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে তাও উল্লেখ করেছেন। তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহ পরস্পরের শত্রু। মাতৃহারা তেজসিংহ দুর্জয়সিংহের জন্যই পর্বতবাসী, ভীলদের আশ্রিত। তাঁর অন্তরাগ্নি প্রতিশোধস্পৃহায় প্রজ্বলিত। তথাপি চারণীদেবীর আদেশে সাময়িক ভাবে বিরোধ ভুলে গিয়ে তিনি দেশের স্বার্থে আপনাকে নিয়োজিত করেছেন। সুতরাং এক দিকে বংশগত কৌলীন্যের মর্যাদা, অন্য দিকে জাতিগত স্বার্থরক্ষা রাজপুত জাতির এ-দুটি বিশেষ লক্ষণের উপর রমেশচন্দ্র জোর দিয়েছেন।

প্রতাপের কাহিনীতে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বিশেষ নেই। একটি জায়গায় রমেশচন্দ্র মূল সত্যের থেকে সরে এসেছেন। এ রূপান্তর সম্ভাবিত ঘটনার দিক থেকে সুন্দর। টডের রাজস্থানে আছে রাত্রিতে পর্বতকন্দরে কন্যার ক্রন্দন দেখে প্রতাপের ধিক্কার আসে। আজীবন যুদ্ধ করেও তিনি পরিবারের সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। এই কারণে আকবরের নিকট সন্ধিভিক্ষা করেন। উপন্যাসে রমেশচন্দ্র কাহিনীটির মধ্যে

উচ্চভাবপূর্ণ ঘটনাব আবোপ কবেছেন। অনুগত দেবীসিংহেব পুত্রের মৃত্যুর মধ্যেই প্রতাপ নিজেব ব্যর্থতা অনুভব কবেন এবং আকববের কাছে সন্ধিভিক্ষা কবেন। আবাব প্রতাপকে বমেশচন্দ্র কেবলমাত্র তাঁব আদর্শবাদেব যন্ত্ররূপেই ব্যবহাব কবেন নি। তা হলে মানসিংহ প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থাকতে পারত। বৈবীভাব বাজপুত জাতিব বৈশিষ্ট্য। প্রতাপও তাব থেকে মুক্ত নন।

উনবিংশ শতাব্দীব নবজাগ্রত জাতীযতাবোধকে ধববাব জন্যই তিনি উপন্যাস প্রণযন কবেছেন। বাজপুত জাতিব উদাহরণ তাই প্রযোজন। রাজপুত জাতিব শক্তির বন্ধ্রপথে দুষ্টগ্রহ প্রবেশ কবেছিল। পূর্বে এ বিষয়ের আলোচনা কবেছি। তেজসিংহ দুর্জযসিংহ কাহিনীটিকে বমেশচন্দ্র এবই জন্যে এত গুরুত্ব দিযে, এত বিস্তৃত ভাবে পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত কবেছেন। তেজসিংহ যখন তাঁব ভালোবাসাব ধনটিকেও হারালেন তখন আর জীবনেব প্রতি কোনো মায়া, কোনো মমতা থাকল না। তাঁব জীবনে এইটি হল চবমতম মুহূর্ত। দুর্জযসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাব এইটি উপযুক্ত সময। ভীল, বাঠোব সৈন্য নিয়ে দুর্জয়সিংহেব বিরুদ্ধে তিনি যাত্রা কবলেন। ভীষণ সমবে দুর্জযসিংহ পরাজয় বরণ করলেন। তেজসিংহ বহু সৈন্যক্ষয় কবে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু তেজসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ কবলেন বলেই কি বিজয়বার্তাটি পাঠকমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তাব কবে! নিঃসন্দেহে বলা যায় তেজসিংহেব বিজয়বার্তাব মধ্যে শোকের আর্তধ্বনিটিও করুণ, নিবিড়। বিষাদেব যবনিকা সেই মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত হল। রাজপুত ইতিহাসেব বীবত্বগবিমাব পশ্চাতে ভবিষ্যৎপতনেব সুবটি নিহিত হল।

'মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্যমহলে প্রবেশ করিল।'

রাঠোব ও চন্দাওয়াৎ কুলেব শৌর্যবীর্য বর্ণনা করা সত্ত্বেও বমেশচন্দ্র এই যুগকে কেন যে বন্ধ্যা বলেছেন তাব কাবণ সম্ভবত এখানে। ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টি রমেশচন্দ্রেব ছিল। এই কাবণে বাজপুত-ইতিহাসকে তিনি নিজের দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্কীর্ণ জাতীযতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি গ্রন্থবচনা করেন নি। আমাদেব দুর্বলতা-প্রদর্শনও তাঁর গ্রন্থবচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হলে জাতীয়তাবোধ গৌরবান্বিত হতে পারে।

তেজসিংহ-পুষ্পকুমাবীর কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষীণ। এই কাহিনীতে দ্বন্দ্বসংঘাতের বিশেষ পরিচয়ও নেই। ভীলবালিকার

পত্রটি গভীব প্রাণাবেগে স্পন্দিত। তাব প্রেমের অভিব্যক্তি কোথাও মাত্রাতিবিক্ত নয়, বমেশচন্দ্র এই প্রেমকে বিকশিত কববাব সুযোগ দেন নি। এর জন্য বমেশচন্দ্রকে বিশেষ দায়ীও কবা চলে না।

নারীচবিত্রের মধ্যে পাচ্ছি পুষ্পকুমাবী, ভীলবালিকা, রাণা প্রতাপসিংহের মহিষী। ইতিহাসে প্রতাপসিংহের মহিষীর বিশেষ পবিচয় নেই। বমেশচন্দ্র কল্পনাবলে এই চবিত্রটি অঙ্কন কবেছেন। এব মধ্যে আদর্শবাদেব ছাপই সুস্পষ্ট। তেজসিংহ কর্তৃক উদ্ধাব পেয়ে রানী পর্বতকন্দরে আশ্রয় পেলেন। সেখানে পুষ্পকুমাবীও ছিল। চাবণীদেবীব অনুবোধে বানী কতকটা আশ্বস্ত হলেন। চাবণীদেবীব বানীকে আশ্বাস দান এবং তেজসিংহেব বীবত্বকথনের সময় পুষ্পকুমাবীব উদ্বেলিত হৃদয সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আব একটি কথা। বঙ্কিমচন্দ্রেব আনন্দমঠ তখনও বাব হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে স্পষ্টত ব্রিটানিযা দেবীব আবির্ভাবকে ঘোষণা কবেছেন। বমেশচন্দ্রেব উপন্যাসেও এব ব্যতিক্রম নেই। মহারানী চারণীদেবীকে প্রশ্ন করলেন—'তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয় বিজয'? উত্তবে চাবণীদেবী বললেন—

'মহারাজ্ঞি। আমার বয়স অধিক হইযাছে, নয়ন ক্ষীণ, ভবিষ্যৎ আকাশ যতদূর দেখিতে পাই, মেওযার তমসাচ্ছন্ন, রাশীকৃত্ত মেঘের পব রাশীকৃত মেঘ, অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার। রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে, তৎপব বাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি। মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তবঙ্গ আসিযা মেওয়ার ও সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। এ কি প্রলয় উপস্থিত! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, আর দেখিতে পায় না।'

এ ভবিষ্যৎবাণী কোনো চমকের সৃষ্টি কবে না। কিন্তু লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে কথা বলতে চেয়েছেন তাব পূর্বাভাস এখানে পাচ্ছি। শ্বেত তবঙ্গ বলতে যে ইংবেজদেব কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রেব বেলায়ও বটে বমেশচন্দ্রেব ক্ষেত্রেও ইংবেজ শাসনকে কখনও কুনজবে দেখা সম্ভব ছিল না। ববং এই দুই চিন্তানায়কের এ বিষয়ে অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাই। তাঁদেব দৃষ্টিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া বাতুলতা। কেননা যথার্থ প্রগতিশীলতা বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই ইংরেজ-বিবোধিতাই একমাত্র লক্ষণ ছিল না। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা যে নূতনের বাণী নিয়ে এসেছিল তাকে স্বীকরণের মধ্যেই জাতির উন্নতি নিহিত—এই ধাবণাই চিন্তানায়কেরা পোষণ করতেন। রমেশচন্দ্র যে অন্ধভাবে ইংবেজশাসনের স্তবস্তুতি করেন নি তাব পরিচয় তাঁর অন্যান্য অভিভাষণে, লেখায় পেয়েছি। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। শুধু এইটি মনে রাখা কর্তব্য যে

রমেশচন্দ্র ইংরেজের শাসনকে বোঝা মনে করেন নি, যথার্থ উন্নতির সোপান মনে করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেছেন—

'It may be England's high privilege to restore to an ancient nation a new and healthy life ** if the science and learning, the sympathy and example of modern Europe help us to regain in some measure a national conciousness and life, Europe will have rendered back to modern India that kindly help and sisterly service which India rendered to Europe in ancient days—in religion, and in civilisation.'

সুতরাং রমেশচন্দ্র যখন চারণীদেবীর ভবিষ্যৎবাণী উপস্থিত করেন তখন বিস্মিত হবার কিছু নেই।

'জীবন-সন্ধ্যা'র কাহিনীর দুর্বলতার কথা আগে বলেছি। রমেশচন্দ্রের জীবনীকার J. N. Gupta তাঁর *Life and Work of Ramesh Chunder Dutt* গ্রন্থে বলেছেন—

'Mr. Dutt's novels though they abound in stirring scenes, moving interests, and fully developed dramatic situations, yet fail to take rank as works of art because of their lack of organic fusion.'

এ কথা ঠিক প্লট-নির্মাণে রমেশচন্দ্র পারিপাট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। 'জীবন-সন্ধ্যা'তে lack of organic fusion আরও বেশি। কতগুলি খণ্ড চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাণা প্রতাপসিংহের যেটুকু পরিচয় পাই তার মধ্যে কেবল কয়েকটি যুদ্ধচিত্র, আর দারিদ্র্যের বর্ণনা প্রধান। চরিত্রটির প্রতি রমেশচন্দ্রের সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু অতিকথনে তা বাষ্পাকুল। খান-খানানের বর্ণনার (টডের রাজস্থানে এর উল্লেখ আছে) এবং অন্যান্য রাজপুত চরিত্রের সপ্রশংস দৃষ্টির সাহায্যে প্রতাপ চিত্রিত। এতে নাটকীয়তার ন্যূনতম অবকাশও ছিল না। রমেশচন্দ্র নিজে প্রতাপ সম্বন্ধে বলেছেন—

'প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরদিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আকবরশাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই। প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে।'

উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর চরিত্র প্রতাপসিংহের কাহিনী তাই দ্বন্দ্বমথিত নয়। একবার মাত্র তাঁকে ভাবাকুল করেছিল। সেইটিই তাঁর চরিত্রের আকর্ষণীয়

বিষয়। সে যাই হোক, গ্রন্থকার কাহিনীগুলির ঐক্যসাধন করতে পাবেন নি। উপাদানের বহুলতা লেখকের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে আমরা কতগুলি বীরচরিত্রের মহৎভাব দেখতে পাই, যুদ্ধের বর্ণনা শুনি, ফিউডাল দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের চিত্তদীর্ণ আখ্যান পাই, পুষ্পকুমারীর গোপনপ্রদেশের চকিত চমক লাভ করি, কিন্তু গল্পের শরবৎ ঋজু গতি সেখানে অনুপস্থিত।

গল্পরসের ব্যাঘাত ঘটলেও এই উপন্যাসে যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি সত্যিই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি প্রধানত অস্ত্রের নামে সৈন্যবাহিনীর বর্ণনায় নীরস হয়। তা ছাড়া বাঙালির মন্থর জীবনে যুদ্ধ-বর্ণনার অবকাশই বা কোথায়? রমেশচন্দ্রের পক্ষে কৃতিত্বের কথা এই যে তিনি বাঙালির সেই কলঙ্ক অনেকখানি মোচন করেছেন। মধুসূদন যেমন প্রকৃত বীরকাব্যের আদর্শে যুদ্ধের কোদণ্ডটঙ্কারকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন, রমেশচন্দ্রও বিভিন্ন যুদ্ধ-বর্ণনায় পরিবেশ সৃষ্টির চমৎকারিত্বে এবং অস্ত্রের শিঞ্জিনীর মধ্যে মানবীয় ভাবাবেগের পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহের যুদ্ধ-বর্ণনাটি এই দিক থেকে সার্থক। এ যুদ্ধের জন্য পাঠকের মনেও অদম্য আগ্রহ এবং ভয়কম্পিত হৃদয়ের দুরু দুরু ধ্বনি শোনা যায়। কেননা তেজসিংহের যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাঁর হাহাকার, তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহাকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যার ফলে যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে পাঠক পূর্বাহ্নেই একটা ধারণা করে নেয়। প্রকৃত যুদ্ধের জন্য সাগ্রহে পাঠক অপেক্ষা করে। রমেশচন্দ্রও যুদ্ধ-বর্ণনার ফাঁকে বীরদ্বয়ের উত্তাপ-উত্তেজনাকে অনুভব করেছেন ও তা পাঠকের হৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন।

তা ছাড়া 'জীবন-সন্ধ্যা'তে রমেশচন্দ্র স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশিত করেছেন। তেজসিংহ ভীলদের আশ্রিত। ভীলদের পার্বত্যপ্রদেশের একটি সুন্দর চিত্র রমেশচন্দ্র অঙ্কন করেছেন। এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ঐতিহ্য, রাজপুতদের সঙ্গে ভীলদের সম্বন্ধনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। রাজপুত সৈন্যদের শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই না, কিন্তু দু-একটি স্থানে তারও স্বল্প আভাস আছে। পরিবেশ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রমেশচন্দ্র 'জীবন-সন্ধ্যা'তে রাজপুত জাতির পতনের কথা বিশেষ বলেন নি। তথাপি এর নাম দিয়েছেন 'জীবন-সন্ধ্যা'। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেবারের স্বাধীনতার জন্য অন্য কোনো যোদ্ধা আর এত শ্রম স্বীকার করেন নি।

দ্বিতীয়ত জ্ঞাতিবিরোধ। এই জ্ঞাতিবিবোধ বিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাই রাজপুত গৌববের সন্ধ্যা।

রমেশচন্দ্রেব জীবনী পাঠে জানতে পাবি মারাঠাদের কাহিনী নিয়ে তিনি আব একটি উপন্যাস রচনা কববাব বাসনা কবেছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। আমাদেব মনে হয় 'জীবন-প্রভাতে'র পব আর মহারাষ্ট্র-কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা কববাব সার্থকতা বমেশচন্দ্র দেখেন নি। কারণ তাঁর বক্তব্য 'জীবন-প্রভাতে' সূত্রাকাবে উল্লিখিত। রমেশচন্দ্র যে ভীল ও রাজপুতদেব মধ্যে সম্বন্ধনির্ণয় কবেছেন সেইটি বিস্তৃত হযেছে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' গ্রন্থে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা থেকে 'বিদায়' নেবার সময় স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মর্মকথাটি বলেছেন। নবীন লেখকদের ভারতীর আসরে টেনে এনে তিনি ভারতীগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে দেশবাসীর আগ্রহ জাগানো ভারতীর মূল উদ্দেশ্য ছিল। দেশচর্চার এই ব্রত স্বর্ণকুমারী সযত্নে পালন করেছেন। উপন্যাস রচনায়ও তাঁর এই মনোভাব আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে রাজস্থানের ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত ইতিবৃত্তের মধ্যে তিনি নিজের কল্পনা সংযোগ করেছেন। উপন্যাসগুলিতে দুটি বস্তু প্রধান। প্রথম দেশ-মাতৃকার সেবা, দ্বিতীয় আদর্শ রাজার আচার আচরণে নিবৃত্তিপথের সাধনার কথা। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের সমাজের এই দুই শিক্ষাই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক নন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় যে ইতিহাস জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এইটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে তিনি 'দীপনির্বাণে'র ভূমিকায় এবং মিবাররাজের সূচনায় ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণ সাহিত্যের পক্ষে হয়তো অপরিহার্য নয়। ওয়াল্টার স্কটের আদর্শে স্বর্ণকুমারী অনুসরণ করেছিলেন। স্কট উপন্যাসের ভূমিকায় বিষয়বস্তুর উৎস ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতেন।

স্বর্ণকুমারীর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পুরোমাত্রায়। সে কথা যথাস্থানে বলেছি। চরিত্রনির্মাণে এবং রচনারীতিতে তিনি ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে অল্প বয়সেই প্রমোশন পেয়ে ভারতীর আসরে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন সে কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংরেজি উপন্যাস তখন উৎসাহের সঙ্গে বাড়িতে পড়া হত। স্বর্ণকুমারী সে রস থেকে বঞ্চিত হন নি নিশ্চয়ই। সেই কারণে স্কটের উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্বর্ণকুমারীর লেখায়ও দেখা যায়।

দীপনির্বাণ

'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালে (১৪ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। তখন রমেশচন্দ্রেব 'বঙ্গবিজেতা' বাব হয়েছে। বঙ্গবিজেতায় ঐতিহাসিক উপন্যাসেব সুবটি মোটামুটি ধ্বনিত হয়েছিল। বঙ্কিমের মতো কল্পনাশক্তি না থাকলেও তথ্যনিষ্ঠা যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান এই সত্যটি রমেশচন্দ্র বুঝেছিলেন। স্বর্ণকুমাবী দেবীও এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। দীপনির্বাণ বচনাব সময় লেখিকার বয়স মাত্র একুশ। সুতরাং উপন্যাসটির মধ্যে প্রৌঢ জীবনেব অভিজ্ঞতা আশা করা অন্যায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত উক্তি থেকে জানতে পাবি ঠাকুববাড়ির সাহিত্যিক পরিবেশ স্বর্ণকুমাবীর উপব প্রভাব ফেলেছিল। এমন-কি এক সময়ে তিনি প্রমোশন পেয়ে জ্যোতিবিন্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনায় যোগ দিতেন। সুতবাং এই বইটিতে কেবল কাঁচা হাতের বচনাব স্বাক্ষর রয়েছে এইটি বলা ঠিক নয়। বচনাকৌশল হযতো তেমন উচ্চশ্রেণীর নয়, কিন্তু তখনকাব দিনের উপন্যাসের বিচাবে 'দীপনির্বাণ' নিতান্ত নগণ্য রচনা নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটিব যে সমালোচনা বাব হযেছিল তাতে বুঝতে পারি সেকালেব শিক্ষিত বাঙালিব কাছে বইটি সমাদব পেযেছিল।

স্বর্ণকুমাবীব জীবনে এই সমযে স্বদেশী আন্দোলনেব ঢেউ কতখানি পৌঁছেছিল জানি না, কিন্তু হিন্দুমেলাব আঁচ তাঁকেও স্পর্শ কবেছিল। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাব অবসব এখানে নেই। কিন্তু হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র কবে যে সাহিত্যপ্রেবণা জেগেছিল সে কথা তো আমবা সকলেই জানি। জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁব জীবনস্মৃতিতে বলেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকেই জাতীয়তাব সূত্রপাত। সেইটি দেখা দিয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায়। সুতবাং জাতীয়তার উদ্বোধনের একটি অঙ্গ ছিল প্রাচীন শৌর্যবীর্য-গাথা উদ্ধারে, তাদের নব পরিবেশনে। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে তাকেই নূতন কবে অনুভব করা গেল। স্বর্ণকুমারী দেবী এ 'ন্যাশন্যাল' জোযাবে নিজেকে যুক্ত কবেছিলেন। কর্মে কতটা জানি না, কিন্তু চিন্তায় তিনি এঁদেরই সগোত্র। 'দীপনির্বাণ' তার প্রমাণ। পরাধীনতার বেদনা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও স্পর্শ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি উপহার দিতে গিয়ে লেখিকা তাঁর অন্তরের বেদনাকে আমাদের গোচর করেছেন।

'আর্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যাথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার।
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল।'

অতএব আর্য-অবনতি কাহিনী রচনা করা লেখিকার উদ্দেশ্য। জাতীয়তা-বোধ উদ্বুদ্ধ করাই লেখিকার কাম্য।

লেখিকার বিষয়বস্তু নির্বাচনে মৌলিকতার অবসর কম। টড সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের যুক্ত অভিযানকে অভিনন্দিত করেছেন। টডের বর্ণনায় পাই—

'What nation on earth would have maintained the semblance of civilisation, the spirit or the customs of their forefathers during so many centuries of overwhelming depression, but one of such singular character as the Rajpoot. Though ardent and reckless, he can, when required, subside into forbearance and apparent apathy, and reserve himself for the opportunity of revenge Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind of a people withstanding every outrage barbarity can inflict, or human nature sustain, from a foe whose religion commands annihilation. Bent to the earth, he rises buoyant from the pressure, and makes calamity a whetstone to courage'

বিদেশীর এই শ্রদ্ধা তখনকার যুগে বিরলদৃষ্ট। স্বর্ণকুমারীকে টডের এই উক্তি প্রভাবিত করবার সম্ভাবনা।

গ্রন্থে উল্লিখিত সমরসিংহ, কিরণসিংহ, কল্যাণ, পৃথ্বীরাজ, চাঁদকবি (কবিচন্দ্র) ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সমরসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করেছেন টড। তখন হিন্দুদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদও পুরোমাত্রায়। বিদেশী আক্রমণেও জয়চন্দ্রের চৈতন্যোদয় হয় নি। কুলমর্যাদা এবং ঈর্ষা একে অপরের উন্নতির প্রতিবন্ধক ছিল। সমরসিংহের শৌর্যবীর্যের প্রসঙ্গ চাঁদকবির বর্ণনায় পেয়েছি। সমরসিংহ ছিলেন পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি। সেইটি 'দীপনির্বাণে' অনুল্লিখিত। এর কারণ লেখিকা কিছু দেন নি। সম্ভবত আত্মীয়তার সূত্রে পৃথ্বীরাজকে সাহায্যদান একটি সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা। দেশমাতৃকার সেবার জন্যই যে সমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা এইটি দেখানোই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল। সমরসিংহকে আমরা গ্রন্থে কেবল রাজা রূপেই দেখি না তাকে যোগীন্দ্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

'The style of address and the appeal of Samarsi betoken that he had not laid aside the office and ensigns of 'Regent of Mahadeva'. A simple necklace of the seeds of the lotus adorned his neck, his hair was braided, and he is addressed as Jogindra or Chief of ascetics.'

এই তথ্যটি লক্ষ্য কববাব মতো। যা ছিল কেবলমাত্র প্রশংসা ও শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন তাব পশ্চাতে লেখিকা একটি গূঢার্থ আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থেব প্রাবম্ভে কিবণসিংহেব জন্ম, তাব নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ইত্যাদি কাহিনীর উদ্‌ঘাটনে যে নূতনত্ব সূচিত হয়েছে তাব উৎস এই তথ্যটি। যোগীন্দ্রনাথের সার্থকতা স্বর্ণকুমাবী যে ভাবে দেখেছেন তা বাস্তবানুগ। কল্যাণ-বিজয়-উষাবতী, কিবণ-শৈলবালা, চাঁদকবি-প্রভাবতী লেখিকাব সংযোজন। গ্রন্থেব মধ্যে আব যে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধাবণ কবেছেন লেখিকা উপক্রমণিকায় (এলিযট, এলফিনস্টোন, জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি গ্রন্থ-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিযে লেখিকা তাঁব যুক্তিকে সমর্থন কবেছেন)।

দীপনির্বাণ উপন্যাসেব কাহিনী বিশ্লেষণ কবলেই বোঝা যাবে যে এব মধ্যে ঘটনাব ভিড অত্যন্ত বেশি। একটাব পব একটা ঘটনা সন্নিবেশ কবে লেখিকা উপন্যাসেব মধ্যে চমৎকাবিত্ব আনতে চেয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি ঘটনাব উপর গুরুত্ব আবোপ ঠিকমত কবতে পাবেন নি। এই মাত্রাবোধেব অভাব থাকাতে উপন্যাসটিব মধ্যে কাহিনীটি ঈষৎ শিথিলবিন্যস্ত—লক্ষ্যচ্যুত। কিবণেব কাহিনীব অতিবিস্তৃতি আমাদেব আবও বেশি পীডিত কবে। কেননা গ্রন্থেব মূল ঘটনাব সঙ্গে তাব যোগ খুবই ক্ষীণ। গ্রন্থেব আবম্ভে মনে হয কিবণই বুঝি লেখিকাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু দিল্লীদববাবে এসে স্বর্ণকুমাবী দেবী বালক কিবণ এবং বালিকা শৈলবালাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হযেছেন। পৃথ্বীবাজেব চবিত্র অঙ্কনেও লেখিকা বাককুণ্ঠ। এতে অবশ্য দোষেব কিছু হত না যদি কল্যাণ-বিজয়-উষাবতীর দ্বন্দ্বকে একটা জটিল ঘটনাবর্তেব মধ্যে ফেলে স্বর্ণকুমাবী মানবজীবনেব খাঁটি সুবটি ধ্বনিত কবতে পাবতেন। কল্যাণেব প্রেমেব তীক্ষ্ণতা ও দুর্নিবার গতি অস্বীকাব কববাব উপায নেই। কিন্তু তাব হৃদয়েব উচ্ছ্বাসই কেবল আমরা শুনি এবং তাও যেন কষ্টকল্পিত। অনেকটা বইয়েব জগতের প্রেম বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে মানবমনেব যে সূক্ষ্ম জটিলতা বিশ্লেষণ কবেছেন, সেই জীবনকে এঁবা কেউ গ্রহণ কবেন নি। মোটামুটিভাবে দুর্গেশনন্দিনীর প্রেমচিত্রই স্বর্ণকুমারী দেবীকেও আদর্শরূপে গ্রহণ কবতে দেখি। উঁচুসুবে বাঁধা এই প্রেমবর্ণনা টাইপ-চরিত্রেব আভাস দেয়। কল্যাণ যত সহজে উষাবতীর

প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে এবং পুনরায় ফিরে পেয়েছে তা কেবলমাত্র এই-জাতীয় উপন্যাসেই সম্ভব। অবশ্য মনোবিকলনের কৌতূহল ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেক সময়েই ইঙ্গিতে আভাসে, সাঙ্কেতিক সূত্র ধরে বিবৃত হয়। এখানে সেই পরিচিত রূপটিরও একান্ত অভাব দেখা যায়। গোলাপও ঘটনা সংঘটিত করবার যন্ত্র মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা কেবলমাত্র দেবেন্দ্রের জন্যই কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু ঘটায় নি। সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে তার নিজের ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং অন্তরাবেগের সুরটি দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু গোলাপের মধ্যে আমরা তেমন কিছু দেখতে পাই না। সে যত সহজে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ঠিক তত সহজেই সত্যের কাছে এসে দাঁড়ায়। এইটি যে লেখিকার সম্পূর্ণ আরোপিত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

গ্রন্থের মধ্যে আকস্মিক ঘটনার ছড়াছড়ি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে আকস্মিকতার স্থান আছে। এবং ঘটনার বহুলতাও অনপেক্ষিত নয়। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির মধ্যে এমন একটি প্রত্যয় ধ্বনিত করা প্রয়োজন যার ফলে ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে পাঠকের বিচারবুদ্ধি সায় দিতে পাবে। এই প্রত্যযের অভাবেই অনেক সময়ে রূপকথা এবং উপন্যাসের সীমারেখাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাগলিনীর মৃত্যু যদি সম্ভব তবে তিন বছরের শিশু কিরণের প্রাণরক্ষা-কি করে সম্ভব হল? কিরণের ব্যাঘ্র-শিকার, তেজসিংহের আকস্মিক আবির্ভাব এবং পলায়ন, কিরণ-শৈলবালা-প্রভাবতীর মিলন, বিজয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমস্তই আকস্মিক এবং আরোপিত। এই আকস্মিকতার পশ্চাতে বাস্তবতার ন্যূনতম দাবিও অস্বীকৃত হয়েছে। তবে এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে শৈলবালা-প্রভাবতীর সখিত্বের বিবরণটি মনোরম। বঙ্গবিজেতায় সবলা এবং অমলার সখিত্বের সঙ্গে শৈলবালা-প্রভাবতীর সখিত্ব তুলনা করা যায়। দুটি নারীর চপলতা, ছদ্ম অভিমান, সখিত্বের আন্তরিকতা কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের মধ্যে সুন্দর করে দেখান হয়েছে। ইতিহাসের রাজকীয় সমারোহের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে এসেই পাঠক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পরিচিত বাস্তবতার স্পর্শ পেয়ে পাঠক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। উপন্যাসটির অন্যতম আকর্ষণও এই সখ্যরসে। তবে প্রভাবতী-শৈলবালার ছদ্মবেশে পলায়নের মধ্যে একটা সুলভ রোমান্টিকতার লক্ষণ আছে।

'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এর মহত্ত্বকে অস্বীকার করা

১২

যায় না। উপন্যাসটিতে লেখিকার স্বদেশপ্রেরণা আন্তরিকতার সুরে দীপ্যমান। আর তখনকার গল্পখোর পাঠকের জন্যে হয়তো এ-জাতীয় সুলভ ঘটনার সৃষ্টির প্রয়োজনও ছিল। আরও একটা কথা। দীপনির্বাণে টডের রাজস্থানের কাহিনী থেকে বিশেষ বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও এর সমাদরের কারণ কি? মনে হয় তখনকার যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠক যে-জাতীয় ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষা করত, স্বর্ণকুমারী দেবী তা বুঝেছিলেন। পাঠক গল্প-উপন্যাসকে তলিয়ে বোঝবার অবকাশ পায় নি। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসের যে সমালোচনা বেরিয়েছিল তার প্রশংসা সবটুকুই ব্যয়িত হয়েছে স্বদেশী প্রেরণার মহনীয় দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে। জাতির ইতিহাস জানবার আকাঙ্ক্ষা তখন এমনই প্রবল ছিল যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে কোনো কাহিনীকে পাঠক বরণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। আর্টের সূক্ষ্ম বিচার করবার অবসর তখন কম। লেখক-লেখিকারাও এজন্যে ইতিহাসের কোনো বিকৃতি না ঘটিয়ে কল্পনা যোগান না দিয়ে পরিচিত তথ্যকেই গল্পাকারে উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যাবে যবন সৈন্যদের উপর লেখিকা সুবিচার করেন নি। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণটি কি তা জানা না থাকলেও লেখিকা সেই সূক্ষ্ম রাজনীতির মধ্যে যান নি। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য লেখিকার উপরে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু তখনকার পাঠকসমাজের কাছে লেখিকার বিবরণই ঐতিহাসিকের বিবরণের অপেক্ষা সঙ্গত এবং অনুকূল মনে হয়েছে। কেননা তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের পুষ্টিসাধন করেছে এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিধর্মী শত্রুর মধ্যে কোনো উন্নত গুণ থাকতে পারে এটা তারা আশা করে নি। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে লেখিকা আসলে যুগের আনুগত্য স্বীকার করেছেন, যুগধর্মকে লঙ্ঘন করে অন্যতর চিন্তার আশ্রয় নেওয়া তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয় নি। কেবলমাত্র স্বদেশী প্রেরণাটিকেই যথাযথরূপে পরিবেশন করা লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল এবং সে পথে তিনি সাফল্যও পেয়েছিলেন। দীপনির্বাণ সম্বন্ধে এইটিই প্রশংসনীয় বিষয়।

মিবাররাজ

স্বর্ণকুমারী 'মিবাররাজ'কে (১৮৮৭) ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটি একটি বড়ো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসের

জটিলতা, ঘটনার ভিড, অন্তর্দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মতা এই বইটিতে নেই। 'দীপনির্বাণ' রাজপুত জাতির নির্বাণের কাহিনী, 'মিবাররাজ' রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস। গ্রন্থটিতে ভীল-রাজপুত সম্বন্ধটিও সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। এর আগে রমেশচন্দ্রের 'জীবন-সন্ধ্যা'তে ভীল-রাজপুত সম্বন্ধটি চিত্রিত হয়েছিল অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ভীল-রাজপুত কাহিনী অন্যান্য বস্তুর মধ্যে একটি, 'মিবাররাজে' সেইটিই প্রধান। টডের রাজস্থান-কাহিনী লেখিকার অবলম্বন। গ্রন্থশেষে লেখিকা যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাও টড থেকে গৃহীত। বাপ্পা এবং গুহা যে পৃথক ব্যক্তি এবং মিবারের প্রথম শাসনকর্তা যে গুহা এইটিও লেখিকা তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রাজপুত জাতির সঙ্গে ইরানীয়দের কোনো সম্বন্ধ নেই এইটিও স্বর্ণকুমারীর সিদ্ধান্তের অন্যতম বিষয়। লেখিকার উক্তি থেকেই জানতে পারছি 'বান্ধব' পত্রিকায় গুহা এবং বাপ্পার জীবনের অনেক ঘটনার সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয় উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি।

কাহিনীটি এই। ভীলরাজ মন্দালিকের স্নেহে মমতায় গুহা লালিত হয়েছিল। গুহার পরিচয় ছিল ব্রাহ্মণসন্তান বলে। গুহা দিদি সত্যবতীর কাছে নিজের পরিচয় জানতে পারলে। পরে মন্দালিকপুত্রের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে গুহা ভ্রমক্রমে মন্দালিককেই নিহত করলে। মন্দালিকপুত্র আত্মবিসর্জন করলে।

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভীলদের বর্ণনায়। অল্প কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে ভীলদের সরলতা, কর্তব্যজ্ঞান, প্রভুভক্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজপুত এবং ভীলদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ববিরোধ সেইটিও মোটামুটি সুঅঙ্কিত। ভীলদের সংলাপ-রচনায় লেখিকা যে বিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন সেইটি তাঁর গভীর বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয়। যদিও এ বিভাষা অনেকটা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের তথাপি এই ভাষা ব্যবহারের মধ্যে আদিম জাতির প্রাণস্পন্দনটি ধরা পড়েছে। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এই সংলাপ-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'র গোহা প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথের কবিত্বময় ভাষায় সে কাহিনী যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছে স্বর্ণকুমারীর মধ্যে তা নেই সত্য, কিন্তু তিনিও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মন্দাকিনীপ্রবাহ বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর নিজস্ব লেখার গুণে।

কাহিনীর পরিসর ক্ষুদ্র। কিন্তু বাৎসল্যরস ও সখ্যরসের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা আন্তরিকতায় উজ্জ্বল, নিবিড় উপলব্ধিতে তা স্নিগ্ধশ্রী।

হুগলীর ইমামবাড়ি

'হুগলীর ইমামবাড়ি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ৮ই জানুয়ারি ১৮৮৮ সালে। স্বর্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক পুস্তক 'গাথা' ইত্যাদি এর আগেই বার হয়ে গেছে। 'মিবারবাজে'র পর 'হুগলীর ইমামবাড়ি'তে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাই। এর পূর্বাভাস অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ছিল। অর্থাৎ নীতিপ্রবণতা স্বর্ণকুমারী দেবীব পরবর্তী উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। 'হুগলীর ইমামবাড়ি' থেকেই স্বর্ণকুমারী দেবী নবনাবীর দ্বৈতলীলার মধ্যে, রাজনীতিব চক্রান্তে, বাজ্যশাসনে শাস্ত্রপ্রদর্শিত নির্দেশ খুঁজে বেড়িয়েছেন।

গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে প্রমথনাথ মিত্রেব মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে। তবে গ্রন্থকর্ত্রী প্রমথনাথ মিত্রকে আদ্যন্ত অনুসরণ কবেন নি। কিংবদন্তী থেকে উক্ত গ্রন্থেব বিপবীত মতবাদও পেযেছিলেন। কিংবদন্তীকে সাক্ষ্য মেনে লেখিকা কাহিনীর জাল বুনেছেন।

গ্রন্থটি মসীনেব জীবনী নয়, ববং তাব ধর্মবোধেব কযেকটি দিক মাত্র এখানে দেখানো হয়েছে। আসলে গ্রন্থেব মূল বিষয় মুন্না-খান জাহান খাঁ-সলেউদ্দীনকে কেন্দ্র কবে আবর্তিত হয়েছে। মসীন এ-সকলেব নিবপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র। ভগ্নীব কষ্টে সে ব্যথিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো ব্যাপাবে সে লিপ্ত নয।

মসীনের ভগ্নী মুন্না অবিবাহিত। পিতা মতাহাব সেকালেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি একমাত্র কন্যা মুন্নাকে সৎপাত্রে দিতে চেয়েছেন। সুখী পরিবাবে যেমন হয় সেবকম মতাহাবের বাসনা ছিল রূপে গুণে ধনে একটি সচ্চবিত্র যুবকের কাছে কন্যাকে সমর্পণ কবা। অনেক নবাব মুন্নাব পাণিপ্রার্থী হলেও মতাহার বাজী হন নি। অবশেষে তিনি পারস্যেব রাজপুত্র সলেউদ্দীনেব সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। অতিসতর্কেবও ভুল হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। মতাহার যাকে সর্বাংশে গুণবান মনে করেছিলেন সে আসলে মদ্যপ। কেবলমাত্র বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করা সলেউদ্দীন পরমার্থ মনে কবে। মুন্নার নিষেধ বাধা এ ক্ষেত্রে স্বামীকে ফেবাতে পারলে না। মোসাহেব-পরিবৃত সলেউদ্দীন স্ত্রীকে দাসীরূপেই বিবেচনা করে। মুন্না জীবনে কষ্ট পেলেও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য কবে না। মতাহাব ভুলের জন্য অনুতাপ করেন। কিন্তু অনুতাপে তিনি সলেউদ্দীনকে ফেরাতে পারেন না। সলেউদ্দীনের এই স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতাব জন্য পরিবারে অর্থকষ্ট দেখা দিলে মুন্না স্বামীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহে

ব্যস্ত হল। কিন্তু অর্থ ফুরিয়ে আসে, দারিদ্র্য দেখা দেয়, বিলাসব্যসন তখন প্রচণ্ড বিদ্রূপের মতো মনে হয়। সলেউদ্দীনের মোসাহেববা মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নানা কুপরামর্শ দিতে থাকে। মসীন এ ব্যাপার দেখে। বাইরে অপরের দুঃখে সাহায্য করে। অভাবমোচনেব চেষ্টা করে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়, কিন্তু অন্তঃপুবে সে একান্ত অসহায়। দুঃখেব উৎপত্তি, তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে। ওদিকে সলেউদ্দীন অর্থকষ্ট সহ্য কবতে পাবলে না। সে নবাবকন্যাকে বিবাহ করে চলে গেল। প্রচণ্ড দুঃখ সহ্য কবেও মুন্না স্বামীকে আশ্রয় কবেছিল। সলেউদ্দীন চলে যেতে সে সেই আশ্রয়ও হাবালো। মুন্নারই দুঃখে ইতিপূর্বে পিতা মতাহার তীর্থযাত্রায় বেবিয়েছিলেন। মসীন ভগ্নীর দুঃখে বিচলিত হল। কিন্তু তার কববাব কিছু নেই।

পলাশিব যুদ্ধ তখন সমাপ্ত। মীবজাফব সিংহাসনে। এই সময়ে বাংলার আশা ভবসা সবই নির্বাপিত। ইংবেজ এবং নবাব উভয়েই নিজেব স্বার্থসাধনে ব্যস্ত। উভয়েব প্রলোভনে নিবীহ প্রজাকুল সর্বস্বান্ত। বিচাবেব আশা তখন নেই। ফৌজদারও তাব স্বেচ্ছাচাবিতায় নিমগ্ন। বিধিবিধান শাসনশৃঙ্খলা রাজ্য থেকে নির্বাসিত। খাঁ জাহান খাঁ এই সময়ে হুগলীতে প্রবল। তাঁর অত্যাচার প্রবাদবাক্যে পবিণত হয়েছে। তাঁব দববারে বিচাবেব নামে প্রহসন। সেলাম আর সেলামীই বাজসম্মান লাভের একমাত্র উপায়। এই অবস্থায় প্রজাদের অসন্তোষ কি পবিমাণ তা সহজেই অনুমেয়। খাঁ জাহান খাঁ পূর্বেও মুন্নাব পাণি-প্রার্থী ছিলেন। অবক্ষিত মুন্নাব চিত্তজয়ে খাঁ জাহান খাঁ সচেষ্ট হলেন। সকলের পবামর্শে তিনি মুন্নাকে বিবাহ কবতে চাইলেন। কিন্তু মুন্না স্বামীকে হারিয়েও স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। খাঁ জাহান খাঁর অনুরোধ উপেক্ষিত হল। উপেক্ষা প্রত্যাখ্যান খাঁ জাহান খাঁকে উত্তেজিত করলে। সহজ পথ পবিত্যাগ করে এবাবে তিনি বলের আশ্রয় নিলেন। মুন্নাকে অপহবণ করাই তাঁব উপযুক্ত মনে হল। মসীনের শুভাকাঙ্ক্ষী ভোলানাথের চেষ্টা সত্ত্বেও মুন্নাকে রক্ষা করা গেল না। মুন্নাকে রাজপরিবাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবাব পথে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর চেষ্টায় দস্যুবা মুন্নাকে ফেলে ময়না দাসীকে রাজসমীপে উপস্থিত কবলে। খাঁ জাহান খাঁ দেখে চমকিত হলেন। নিজের উদগ্র লালসার ভীষণ পরিণাম সন্ন্যাসীর কথায় বুঝতে পারলেন। মুন্না বিপদমুক্ত হয়ে নৌকা করে সলেউদ্দীনের কাছে গিয়ে স্বামীসেবার অনুমতি চাইলে। সলেউদ্দীনের কাছে মুন্নার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। প্রত্যাখ্যাত মুন্না হুগলীর ইমামবাড়িতে

ফিরে এল। মসীন বহুপূর্বেই পিতাব সংবাদের জন্যে করাচী গিয়েছিল। সেখানে পিতার সাক্ষাৎ পেলে। কিন্তু মতাহাব তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্বে একটি কবচ তিনি মুন্নাব জন্য মসীনকে দিলেন। সে কবচ দানপত্র। এই অর্থে হুগলীতে পবে নানা জনহিতকর কার্য সংঘটিত হয়েছিল।

নানা ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জোববা ছাড়িয়ে যে-কাহিনী আহৃত হল তাব মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই। ইতিহাস-অনুমোদিত জীবনীগ্রন্থও 'হুগলীব ইমাম-বাড়ি' নয়। গ্রন্থটিকে লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি কবেছেন। সে দাবিও মেনে নেওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীব ঘটনা বলে সেই সময়ের বাংলার সমাজমানসের চিত্র পাঠকেব কাছে অপেক্ষিত ছিল। লেখিকা সে দিকে বিশেষ নজব দেন নি। কযেকটি খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে আমবা সে যুগের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই। খাঁ জাহান খাঁব রাজদববাবের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালিপনা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। জনসাধাবণের বিপন্ন অবস্থার চিত্রটি পাই চুড়িওয়ালিব করুণ দৃশ্য চিত্রণে। ভোলানাথ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র। এ-চবিত্র অঙ্কনে লেখিকা সম্ভবত শ্রীকণ্ঠ সিংহেব আদর্শ অবলম্বন কবেছিলেন। কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেব বসন্তরায়ও এই জাতীয় চরিত্র। যদিও ভোলানাথ বসন্তবায়েব মতো এত উন্নত চবিত্র নয় তথাপি তাব মসীনের জন্যে উৎকণ্ঠা, মুন্নাব বিপদে সমবেদনা প্রকাশ প্রশংসাব উদ্রেক কবে। ভোলানাথ আইনেব মারপ্যাচ বোঝে না। স্বামী থাকতে স্ত্রীব দ্বিতীয়বাব বিবাহ তাব কাছে অসম্ভব বলে ঠেকেছে। ভোলানাথেব সংগীতপ্রিয়তা অপর আর-এক গুণ। ভোলানাথ যখন অন্যায অবিচাব দেখেছে, নিপীড়ন নিষ্পেষণ প্রত্যক্ষ কবেছে তখন সেইটি সে প্রসাদী গানের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছে। এই গানগুলিব মধ্যে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস শুদ্ধ হয়ে আছে।

মসীন-মুন্নার ভ্রাতাভগ্নীব স্নেহবিজড়িত চিত্রটি মনোহব। মসীন চবিত্রটি নিষ্ক্রিয। তাব মধ্য দিয়ে লেখিকা নিবৃত্তিপথেব জয় দেখতে পেয়েছেন।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় লেখিকা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যে লেখিকাব ছিল তাব প্রমাণ 'পৃথিবী' গ্রন্থ (১৮৮২)। স্বর্ণকুমারী দেবী মুসলমান-সমাজের চিত্র অঙ্কনে সাহসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক না হলেও প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয়। আমাদেব মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ভাসা-ভাসা, প্রায়ই প্রাথমিক পর্যায়ের। এজন্য মুসলমান-সমাজ সাহিত্যে বিস্তৃত আসন লাভ

করতে পারে নি। স্বর্ণকুমারী দেবী অবশ্য মুসলমান-সমাজেব বৈশিষ্ট্য ফুটিযে তুলতে সর্বদা সার্থক হন নি। মুন্নার চিত্রে মুসলমানী বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই। অবশ্য ইঙ্গিতে তিনি সমাজবৈশিষ্ট্যটি ধববার চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাসীর চরিত্র রোমান্সের আদর্শে পরিকল্পিত। তিনি একপ্রকার অশবীরী। কিন্তু গল্পের মোড় ফিরানোতে তাঁব দায়িত্ব অপরিসীম। এইটি উপন্যাসের ত্রুটি বলেই মানব।

এ উপন্যাসটিতেও দৈব ঘটনার প্রতি লেখিকাব পক্ষপাত দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিব ভাবটি ঠাকুববাড়ির উদাব পবিবেশেব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ্রোহ

'বিদ্রোহ' প্রকাশিত হয় ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ (৯ই আগস্ট ১৮৯০) বঙ্গাব্দে। 'মিবাববাজে'র আকস্মিক সমাপ্তিতে লেখিকার অতৃপ্তি ছিল। এই গ্রন্থে স্বর্ণকুমারী মৌলিক প্রতিভাব পবিচয় দিয়েছেন। বিদ্রোহেব ঐতিহাসিক তথ্য 'বাজস্থান' থেকে সংকলিত।

গুহাব বংশধব নাগাদিত্য। নাগাদিত্যেব কাহিনী এই উপন্যাসে গৃহীত। ইদব বাজ্য এখন ঐশ্বর্যময়। রাজপুত গরিমাব তখন পূর্ণ প্রতাপ। নাগাদিত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পূর্বপুরুষেব ঐতিহ্য, বীর্যমহিমা তাঁকে উদ্দীপিত করত। তিনি সর্বাংশে গোহার (গ্রহাদিত্যেব) পদাঙ্ক অনুসবণ কবতেন। নিজেকেও দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য বলে পবিচয দিতেন। আবাব গ্রহাদিত্য যেমন ভীলদেব প্রীতির দ্বাবা বশে বেখেছিলেন, নাগাদিত্যও প্রীতিব বিনিময়ে ভীলদেব ভালোবাসা চেয়েছিলেন। এদিকে মন্ত্রী-পুবোহিত-বিদূষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ-সাধনেব জন্য উন্মুখ। নির্বোধ বিদূষক চাটুকাবিতায় বাজাব তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত, গণপতি ঠাকুব দাক্ষিণ্যেব প্রত্যাশায় শাস্ত্রবিক্রয়ে আগ্রহী, মন্ত্রী আপন প্রভুত্ব রাখার জন্য বিভেদ-দলাদলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নাগাদিত্যের সঙ্গে তাদেব প্রকাশ্য বিবোধ না থাকলেও তাঁর সঙ্গে তাদেব ঐকমত্যও ছিল না। এই সমস্ত অকর্মণ্য পারিষদবৃন্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য রাজার কাছে অগোচর ছিল। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসের প্রধান ঘটনা রাজপুত-ভীলদের বৈর মনোভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

ভীলরাজ্যে রাজপুত জাতি বিদেশাগত, সুতরাং বৈরীভাব স্বাভাবিক। বিদেশাগতের কাছে স্বদেশবাসীর কোনো মূল্য স্বীকৃত নয়। স্বাধীনতাপ্রিয়

রাজপুত জাতি পরাধীন ভীলদের সম্বন্ধে ঘৃণা এবং উপেক্ষার ভাব পোষণ করত পুবোমাত্রায়। এই অবস্থায় সম্প্রীতির আশা বৃথা। ভীলরাজ্যে গিয়ে তাদের শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে, ঘরবাড়ি তছনছ করে রাজপুতেরা আনন্দ পেত। এমনি কবে বিজেতার বিজিতের উপরে অত্যাচারের কাহিনীই রচনা কবেছে রাজপুত-ভীলদেব ইতিহাস। দীর্ঘকাল ধবে অত্যাচার-নিপীডনেব বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি ভীলদেব ছিল না। ওদিকে গুহাব শত্রু মন্দালিকের বংশধব এখনও বেঁচে। ক্ষোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ নিয়ে এখনও তাবা প্রতিশোধেব স্পৃহায় দিন গোনে। জঙ্গু মন্দালিকের উত্তবাধিকারী। জঙ্গুব জীবনের ইতিহাস বিচিত্র। লেখিকা স্তরে স্তবে সেই জীবনেব কাহিনী উদ্‌ঘাটন কবেছেন। জঙ্গুব পিতামহ চিন্তন মন্দালিকের শোচনীয মৃত্যুব কথা ভুলতে পাবে নি। বাজপুত থেকেই তাবা রাজ্যবঞ্চিত। এই চিন্তা চিন্তনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। কিন্তু তার পুত্র আশাদিত্যেব সেনাপতি হয়ে চিন্তনেব প্রতিশোধস্পৃহাকে ব্যর্থ কবে দেয়। পুত্রকে উত্তেজিত করবাব সকল আশা যখন নির্মূল তখন সে পৌত্র জঙ্গুকে বাজপুত জাতিব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবতে লাগল। প্রতিহিংসা যখন জঙ্গুব মধ্যে ধূমায়িত তখন একটি ভীলকন্যা ক্ষত্রিয়েব গৃহে স্থান পায়। জঙ্গু এব বিচার চাইলে। বিচার চাওয়া অবশ্য বৃথা। ক্রোধে জঙ্গু বর্শা নিক্ষেপ কবল। দৈবক্রমে রাজা বেঁচে গেলেন। পিতা রাজপুত-সহায়ক বলে জঙ্গুব প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে নির্বাসন স্থিব হল। পিতা জীবিত, অতএব জঙ্গুব পক্ষে কিছু কবা অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বৎসব পর জঙ্গু যখন ফিবে এল তখন তাব একটিমাত্র সংকল্প—রাজপুত জাতির ধ্বংস। সে ভীলদেব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। নিজের অসন্তোষ, উত্তাপ-উত্তেজনা ভীলদের মধ্যে সঞ্চারিত কবে দিলে। বলা বাহুল্য, রাজপুত জাতি সম্বন্ধে ভীলদের মধ্যে পূর্ব থেকেই অসন্তোষ ছিল। অতএব জঙ্গুব উৎসাহে তারা তাদেব উত্তবাধিকার ফিরিয়ে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হল।

কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুব পবিহাস। জঙ্গুর পুত্র জুমিযা পিতাব সহায়তায় রাজী হল না। নাগাদিত্যেব সে প্রিয়পাত্র। উপকাবীব উপকার স্বীকার করা সে জীবনের ব্রত বলে জানে। জঙ্গুব আকুল আবেদনে সে সাড়া দেয়, কিন্তু প্রতিশোধেব সম্মুখীন হয়ে জুমিযা পশ্চাদপসবণ করে। দ্বিতীয় গ্রহাদিত্যের মৃত্যুকামনায় তার রক্তস্রোত উষ্ণ হয, কিন্তু নিজের হাতে দণ্ড তুলে নিতে পারে না। জুমিয়ার এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব জঙ্গুর দৃষ্টি এড়ায় না। শেষ পর্যন্ত জুমিয়া

পিতার কাছে ক্ষমা চাইলে। জঙ্গু পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিশ্চেষ্ট রইল না। পুত্র জংলাকে রাজাকে নিহত করবার ভার দিলে। এ ভাবে ঘরে-বাইরে সে তার তীব্র বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিদ্রোহের স্থচনা কবে দিলে। কিন্তু ভীলদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও সংহতি ছিল না, অত্যাচাবেব জ্বালা অনুভব করলেও অন্তর্বিবোধে তাবা জর্জবিত। জংলা জঙ্গুব পুত্র হলেও কাপুরুষ দুর্বল। তথাপি সে নাগাদিত্যকে মাববার চেষ্টা কবলে। বর্শা ছুঁডে ভয়ে পালিয়ে এল। এ-যাত্রা রাজা অক্ষত রইলেন। জঙ্গুর আশা-ভবসা নির্বাপিত হল। সে বৃদ্ধ, তার আব করণীয় কিছু বইল না, কেবল অতৃপ্তি নিয়ে বসে রইল। রাজাব বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহেব সংবাদ দেখতে দেখতে চার দিকে ছডিয়ে পডল। বিদ্রোহেব অপবাধে দুজন নিবপবাধ বন্দী হল। বিচার আবম্ভ হল। এ বিচাবে মন্ত্রীপরিষদ ভীলদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন কবলেও রাজা নাগাদিত্য তা মেনে নিতে পারলেন না। কাবণ তিনি সমদর্শী হতে চান। বাজাব এই ব্যবহাবে পুবোহিত হবিতাচার্য এক দিকে যেমন খুশি হলেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁব আশঙ্কাও জাগল।

হবিতাচার্য বাজপুবোহিত। তিনি এতদিন ইদব বাজ্যে ছিলেন না। তিনি গণনায জেনেছিলেন বাজাব ভবিষ্যৎ অশুভ। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পাবলেন ইন্দ্রিয়-অসংযমই বাজাব পক্ষে কাল হযেছে। সংযমই রাজত্বেব স্থায়িত্ব দেবে, অসংযম বাজাব মৃত্যু ঘনিয়ে আনবে। স্থতরাং রাজাকে সর্বতোভাবে সংযম শিক্ষা দেবাব উদ্দেশ্যে হরিতাচার্য ইদবে ফিবে এলেন।

এব পব ঘটনার গতি অন্য দিকে মোড নিয়েছে। নাগাদিত্যের হৃদয়-বিশ্লেষণ, তাঁব চিত্তচাঞ্চল্য, রানীব আশঙ্কা-সংশয় উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার কবেছে। জুমিয়াব কন্যা স্থহারমতি। নদীতীবে তাকে জুমিয়া কুড়িয়ে পেয়েছিল। রাজার যখন ষোডশ বৎসব মাত্র তখন এই কন্যা বালিকা। ধীরে ধীবে বালিকা পূর্ণযৌবনে পদার্পণ কবলে। বাজা স্থহাবের সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই স্নানের ঘাটে আসতে লাগলেন। ব্যাপারটি রাজ্যে বাষ্ট্র হল। বাজাব আচবণ হবিতাচার্যের দৃষ্টি এড়াল না। হবিতাচার্য রাজাকে সাবধান করে দেবাব জন্যে এগিয়ে এলেন।

হরিতাচার্য যে কেবল রাজাকে উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন তা নয়। তিনি অদৃষ্টকে আয়ত্তে আনতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যময় যে বিশৃঙ্খলা, পারিষদ-বৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা, গণপতি ঠাকুরের স্থূল চাটুকারিতা এই-সকলের সম্বন্ধেই ব্যবস্থা

নিতে চাইলেন। গণপতি ঠাকুরকেও তিনি সাবধান করে দিলেন। লোকমুখের রটনা রানী সেমন্তীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করল। ঈর্ষা জাগল, একটু ক্রোধও বটে। ভীলদের প্রতি সুবিচাব সকলেব মনে কাঁটা হয়ে বিঁধেছিল। তাকে অবলম্বন করে রাজাব সুহাবমতির প্রতি আসক্তির চিহ্ন বিকৃতির আকারে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা সেমন্তীর সংশয় উড়িয়ে দিলেন। কেননা পাপচিন্তা তাঁর মনে নেই। সেমন্তী আশ্বস্ত হল। ভীলযুবক ক্ষেতিয়া সুহারমতির রূপে মুগ্ধ, তাকে বিবাহ করবার জন্য সে ব্যগ্র। ওদিকে নাগাদিত্যেব সুহারমতির প্রতি প্রীতি প্রেমে রূপান্তরিত হল।

ক্ষেতিয়া জানতে পাবলে সুহারমতি রাজাব প্রতি আসক্ত। সুহারমতির উপেক্ষা ক্ষেতিয়াকে উত্তেজিত কবলে। হরিতাচার্য পুনরায় চিন্তিত হলেন। তিনি রানীর সংশয় পুনবায় জাগালেন। রুক্মিণীদাসীও রানীকে সাবধান করে দিয়েছে। রানী সন্দেহ-আশঙ্কা গোপন কবতে পারলে না। রাজাব কাছে সব নিবেদন করলে। রানীব এই আশঙ্কা রাজাকে বিচলিত করলে। রাজা প্রবল ক্রোধ নিয়ে কতকটা মোহগ্রস্তেব মতো নিকুঞ্জপথে বেবিযে পডলেন। সন্দেহ সংশয় ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে মুক্তি চাইছিল তাঁব মন। রানী সেমন্তীর অভিযোগ নাগাদিত্যকে সুহাবমতিব দিকে ঠেলে দিলে।

নাগাদিত্য এই দুই কোটিব আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবর্তিত। তাঁব মনে দেবাসুরের সংগ্রাম। এই সময়ে সুহারমতি জলে ঝাঁপ দিলে রাজা নাগাদিত্য তাকে উদ্ধাব কবলেন। বাজাব প্রেম গাঢ় হল। সুহাবমতির এই আচরণ ভীলসমাজ ভালো চোখে দেখলে না। ক্ষেতিযা রাজদত্ত ফুল সুহারমতিব কাছে থেকে চুরি করলে। ক্ষেতিয়া সরল বিশ্বাসে বুঝেছিল এই ফুলেব জন্যই সুহারমতিব বাজাব প্রতি আসক্তি। ফল হল বিপরীত। সুহারমতি ক্রোধে অপমানে ক্ষেতিয়াকে তিবস্কৃত করলে। এবাবে গণক উত্তেজিত করলে ক্ষেতিয়াকে সমস্ত কথা জম্বুকে জানাবার জন্য।

এদিকে বাজাবও মনে শান্তি ছিল না। রানী সেমন্তী বুঝতে পাবলে নাগাদিত্যেব চিত্ত সুহারের জন্যই উৎকণ্ঠিত।

গৌবীপূজাব সময় শ্রেষ্ঠ সুন্দবী নির্বাচিত হয়। রানী সুহারকেই সুন্দরী নির্বাচিত কবলে। রাজা সুহাবমতির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। রানীর মুখে করুণ হাসি দেখা দিল। রানী সেমন্তী রাজার সুখে নিজেকে কথঞ্চিৎ ধন্য মনে করলে

ক্ষেতিয়াব কাছে জন্মু সমস্ত ঘটনা শুনতে পেলে। জুমিয়াব কন্যাব ধর্মনাশ আশঙ্কায় জন্মুকে আবার উত্তেজিত কবে তুলল। এতদিন সে জুমিয়াকে উত্তেজিত কবতে পারে নি। এবার কন্যার ধর্মনাশে নিশ্চয়ই জুমিয়ার প্রতিশোধেব আকাঙ্ক্ষা জাগবে এই আশায় জন্মু রাজরক্ত চাইলে। জুমিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল। জন্মু বললে, 'রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, কাঁদুবার কাল এডা নয়।' জুমিয়ার প্রশ্ন 'রক্ত! রক্তে কি এ কালী ধুইতে পাববে।' জন্মুব উত্তর—

'হঁ রক্ত, রক্ত সেই পাষণ্ডের রক্ত দিউ এ কালী ধুই ফেল।'

কিন্তু জুমিয়া জানে এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের কন্যা। অতএব বাজা যদি বিবাহে রাজি না হয তবে জুমিয়া এ অপমানেব প্রতিশোধ চাইবে। বাজাও সুহারমতিকে বিবাহ কবতে চাইলেন। এমন-কি ক্ষত্রিয়েব ভীলকন্যা বিবাহ আইনসিদ্ধ কববাব জন্যে তিনি নববিধান জাবী করতে চাইলেন। এমন সময়ে জুমিয়া সুহারমতিব জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে দিলে। রাজা সেইদিনই বিবাহেব উদ্যোগ কবলেন। সৈন্যসামন্তসহ বাজা বিবাহসভায এলেন। বানী নিজে উদ্যোগী হয়ে সুহাবমতিকে বিবাহসভায় নিয়ে এল। এমন সময়ে হবিতাচার্যেব কথায় জানা গেল সুহাবমতি ব্রাহ্মণকন্যা। জুমিযাব কাছে প্রমাণ দিলেন হবিতাচার্য। জুমিয়া বুঝতে পারলে সুহাবমতি বাজাব ধর্মপত্নী হতে পাবে না। সুতবাং বিবাহে সম্মতি দেওয়া তাব পক্ষে অসম্ভব। বাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, জুমিয়াও। যুদ্ধ বাধল। জুমিযাব বর্শা নিক্ষেপে বাজাবানী আহত হলেন। জুমিয়াব অনুশোচনাব অন্ত বইল না। মৃত্যুপথযাত্রী বাজা বললেন, 'আমাব অনুরোধ, তুমি মরিও না। আমাব শিশুসন্তান বহিল—তাহাকে বক্ষা কব'। জুমিয়াব সাহায্যে হবিতাচার্য শিশুসন্তানকে বক্ষা কবলেন। জুমিযা বাজপবিবাববর্গ রক্ষাব জন্যে ভীলদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবলে। নিজে মৃত্যু ববণ কবলে। সুহারেব স্নেহে মমতায় রাজপুত্র বাপ্পা বইল।

'বাপ্পা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইঁহারই (হরিতাচায) নিকট দীক্ষিত হইযাছিল এবং ইঁহারই প্রসাদে নানা বিপদোত্তীর্ণ হইযা মিবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।'

'মিবাবরাজে' বিদ্রোহের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল।

'বিদ্রোহে'র বাজা নাগাদিত্য রানী সেমন্তী এবং সুহারমতির উপর বিষবৃক্ষের প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। রাজা নাগাদিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র নগেন্দ্রের প্রভাবই নয় সীতারামেব প্রভাবও দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীব রূপবাশিতে মুগ্ধ হয়ে সূর্যমুখীর স্নেহ-প্রেমকে ভুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথেব কুন্দনন্দিনীর প্রতি

আসক্তির স্তরগুলিকে যেভাবে ভাঁজে ভাঁজে খুলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবীও সেই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনিও নাগাদিত্যের অন্তরের দ্বন্দ্বমথিত চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বিশ্লেষণ সর্বদা দেখতে পাই না। কিন্তু লেখিকা এই বিশ্লেষণের সাহায্যে নাগাদিত্যের চবিত্রটিকে রোমান্সের স্তর থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে স্থাপন কবেছেন। বঙ্কিমেব রচনাশক্তি লেখিকার অনায়ত্ত হলেও নাগাদিত্যের বর্ণনায় লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রানী সেমন্তী সূর্যমুখীব অনুরূপ। প্রবল আত্মমর্যাদা এবং অভিমান সেমন্তীর সহজাত। সূর্যমুখীর মতোই সেও স্বামীব ইন্দ্রিযবৈকল্যেব প্রতিটি স্তর অনুধাবন করেছে। মনেব আগুনে দগ্ধ হলেও সহজাত উদারতায় কিছু বলতে সক্ষম হয় নি। ভীল-কন্যাব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবে সে বাজাকে বিচলিত কবেছে সত্য, কিন্তু নিজেও তার জন্য কম অনুতপ্ত হয় নি। পবিশেষে সেমন্তী যখন বুঝেছে রাজার চিত্ত অন্য আধাবে স্থাপিত, তখন সূর্যমুখীব মতো সে-ই উদ্যোগী হয়ে সুহাবমতিকে বিবাহ-সভায সাজিযে এনেছে। এমন-কি কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথেব মানসিক বিক্ষোভেব সময গৃহের অবস্থাব যে বর্ণনা পাই 'বিদ্রোহে' তাই অতিপল্লবিত হয়েছে। সুহারমতি কুন্দনন্দিনীব অনুরূপ।

স্বল্পপরিসবে হলেও রুক্মিণী চবিত্রটি সুপবিস্ফুট। বানীব জন্য তার ভালোবাসা অকৃত্রিম। বানীব সন্দেহ-উদ্রেকে যদিও সেও অংশত দাযী তথাপি তার মধ্যে কোনো দুবভিসন্ধি ছিল না।

'বিদ্রোহ' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হযেছে ভীলদেব বর্ণনা। ভীলরা পব-পদানত। পদানত জাতিব মনোভাব বিশ্লেষণে লেখিকা আশ্চর্য শক্তিমত্তার পবিচয় দিয়েছেন। এক দিকে জন্সুব ঈর্ষাদিগ্ধ অন্তঃকরণে অধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ, অন্য দিকে ভীলদেব মধ্যেই আত্মবিবোধ ক্ষুদ্র দলাদলি সংকীর্ণতা অতি সুন্দবভাবে চিত্রিত। জংলা বাজা সাব্যস্ত হলে যে দ্বন্দ্ববিবোধের ছবি পাই সেইটিই অধীন জাতির দুর্বলতম অংশ। আবার অন্য দিকে অধীন জাতির মধ্যে অবমাননা এবং লাঞ্ছনা সত্ত্বেও এবং অত্যাচাব-প্রপীড়িত হয়েও যে নিশ্চেষ্ট অবস্থা দেখতে পাই তার বর্ণনা করেছেন লেখিকা একটি পরিচ্ছেদে। ভীলজাতি সাহসী, সংগ্রাম তাদের পেশা। কিন্তু দুশো-বছরের পরাধীনতার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্ধ বিশ্বাস, আনুগত্যপরায়ণতা। স্বর্ণকুমাবী সমসাময়িক কালের বেদনার প্রতিচ্ছবি ভীলদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন-বর্ণনায় প্রক্ষেপ করেছেন। ভীলদের চরিত্রে একটি আদিম সরলতা আছে। ক্রোধে তারা উন্মত্ত,

স্নেহে শান্ত। সবকিছুকে তারা অনায়াসে বিশ্বাস করে, আবার বিশ্বাস স্খলিত হলে বন্ধুকে উৎপাটিত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই আরণ্যক প্রকৃতি আদিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বর্ণকুমাবী সমবেদনাব সঙ্গে এই ভীলজীবন নিরীক্ষণ কবেছেন এবং তাঁর উপলব্ধি আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে জম্বু-কুম্মুর মিলন দৃশ্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। দুই বৃদ্ধের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন নানা স্মৃতির আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময়। তাঁদের স্মৃতি রোমন্থনে করুণ-মধুর। অবশ্য ভীলদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ করে সংলাপেব ভাষা সাঁওতাল জীবন এবং ভাষা-প্রভাবিত। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এই সাঁওতাল জীবন হয়তো লেখিকার বাস্তবদৃষ্ট। সে যাই হোক, এই বর্ণনা কিন্তু স্থানভেদের জন্যে অস্বাভাবিক হয় নি, বরং নিবিড় উপলব্ধির আনন্দে সঞ্জীবিত।

এই উপন্যাসে লেখিকা রাজার উপর প্রবৃত্তিব লীলা দেখেছেন। প্রবৃত্তিব প্রবল তাড়নায় রাজার সর্বনাশ ঘটেছে। উপন্যাসটিব এইটি ফলশ্রুতি। পববর্তী উপন্যাস 'ফুলের মালা'য় লেখিকা প্রবৃত্তিব উপর নিবৃত্তির জয়ঘোষণা কবেছেন।

ফুলের মালা

'ফুলের মালা' প্রকাশিত হয ১৮৯৫ সালে। এইটি স্বর্ণকুমারী দেবীব শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর আগে তিনি ইতিহাসাশ্রিত কতগুলি ছোটোগল্পও রচনা করেছিলেন। স্বর্ণকুমাবী যখন তাঁর শেষ উপন্যাস রচনা কবলেন, তখন এই ঐতিহাসিক উপন্যাসেব সমাদর খুব বেশি ছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তখন নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীও অভিজ্ঞতার প্রৌঢ় পরিণতিতে আসীন। 'ফুলের মালা'তে স্বর্ণকুমারী দেবী সার্থকতায পৌছে-ছিলেন। 'ফুলের মালা'র ইংবেজি অনুবাদ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মডার্ন রিভিয়্যুতে বার হয় ***The Fatal Garland*** নামে।

'ফুলের মালা'র কাহিনীর ভূসংস্থান বাংলাদেশ। সময়, রাজা গণেশের আমল। গিয়াসুদ্দীনের সময়ে রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ এই উপন্যাসের বিষয়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজা গণেশকে নিয়ে বাদবিতণ্ডার অন্ত নেই। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রধানত কোন বই অবলম্বনে গ্রন্থটি,

লিখেছিলেন তা বলা শক্ত। তবে সে যুগে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে স্টুয়ার্টের *History of Bengal* যে তাঁব প্রধান অবলম্বন ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণেব রচনাও হয়তো লেখিকা দেখেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যগুলিব একটা সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করা যাক।

স্টুয়ার্ট তাঁর *History of Bengal*-এ সেকেন্দর শাহের যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি করে তাঁর মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা এই। সেকেন্দর শাহের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর সতেরোটি সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র সন্তান গিয়াসুদ্দীন। প্রথম স্ত্রী গিয়াসুদ্দীনের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা কববার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আবম্ভ কবে এবং সেকেন্দব শাহকে গিয়াসুদ্দীনেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কববার চেষ্টা কবে। সেকেন্দর শাহ স্ত্রীব এই কপটতা এবং বৈব মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। গিয়াসুদ্দীন বিমাতার এই ষড়যন্ত্রেব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কবে। গিয়াসুদ্দীন একদিন শিকাবেব নাম কবে পালিযে যায় সোনাবগাঁও বা সুবর্ণগ্রামে। সেকেন্দব শাহ পুত্রকে বাধা দেবাব চেষ্টা কবেন। গিযাসুদ্দীনেব ইচ্ছে না থাকলেও তাবই অস্ত্রে সেকেন্দব শাহ আহত হন। গিযাসুদ্দীন পিতাব আহত হবাব সংবাদ শুনে—

'Hastened to his father's presence, and taking his head up in his lap, shed tears of repentance, and humbly besought the old man's forgiveness The king then opened his eyes, and said, "My business is finished , may your dominion be prosperous", after which his soul took its flight to the other world !'১

এই ঘটনাব অনুরূপ বর্ণনা পাচ্ছি বিযাজ-উস্-সালাতিনে। গিয়াসুদ্দীনেব বাজত্বকাল সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই তা স্বর্ণকুমাবী দেবী-বর্ণিত কাহিনীব সঙ্গে মেলে না। কাবণ গিয়াসুদ্দীনেব বাজত্বকালেব কেবলমাত্র কযেকটি শান্তিপূর্ণ সংস্কাবের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। স্টুয়ার্ট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *History of Bengal Vol. II*-তে গিয়াসুদ্দীনের বাজত্বের সংস্কারের কথাই বলা হযেছে। গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়বিচাবেব একটি ঘটনার উল্লেখ করে উভয় লেখকই গিয়াসুদ্দীনেব কৃতিত্বেব প্রতি ইঙ্গিত কবেছেন। সুতবাং স্বর্ণকুমারী দেবী যেভাবে গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র অঙ্কন কবেছেন তা ইতিহাসসম্মত নয়। তাঁর এই ইতিহাস-বিচ্যুতিব দিকটি পবে আলোচ্য।

রাজা গণেশকে নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। স্টুয়ার্ট গণেশকে বলেছেন কনিস। এইটি হয়তো পারসিক ঐতিহাসিকদের বানানবিভ্রাটের ফল।

১. J. N. Sarkar, *History of Bengal, Vol. II*

পাণ্ডুয়ার যুদ্ধটি ইতিহাসসম্মত। রাজা গণেশদেব was greeted by the Hindoos as the restorer of their religion; and sovereign of Bengal. কিন্তু রাজা গণেশ রাজ্যপ্রাপ্তির পর বিচক্ষণতার সঙ্গে মুসলমানদের বশে রাখেন। আফগান সেনাপতিদের তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত না করে তিনি তাদের নিশ্চয়তা দেন। রাজা গণেশ মুসলমানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন বলেই নিশ্চিন্তে রাজকার্য চালাতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকে সমাধিস্থ করতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাস-অনুযায়ী রাজা গণেশই গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর কারণ। যদুনাথ সরকার রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ রাজা গণেশকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসকরূপে চিত্রিত করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মশায় দনুজমর্দনদেব যে রাজা গণেশই তা প্রমাণ করেছেন। তবকত-ই-আকবরীতে পাচ্ছি সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর বাংলার জমিদার রাজ্য অধিকার করেন। এর পর তাঁর পুত্র জালালুদ্দীন রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরীতে আছে গিয়াসুদ্দীনের পৌত্রকে অন্যায়রূপে পদচ্যুত করে কংস রাজা হন। তারিখ-ই-ফিরিস্তাতে দেখা যায় সামসুদ্দীন ছিলেন রাজকার্যের অনুপযুক্ত এবং রাজা কংস প্রকৃতপক্ষে রাজার প্রভু হয়ে ওঠেন। সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর কংস রাজা হন। রাজত্বকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর খুব প্রীতির ভাব ছিল। গণেশের পুত্রের নাম পাচ্ছি জিতমল। কংসের মৃত্যুর পর তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে রাজা হন। রিয়াজ-উস্ সালাতিন অনুযায়ী সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দু জমিদার রাজা কংস ধীরে ধীরে সমস্ত বাংলাদেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। রাজা হয়ে তিনি অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এমনও দেখা যায় তিনি মুসলমান ফকিরের উপর অত্যাচারের দ্বারা নিজের বিপদ ডেকে আনেন। শেখ বদর-উল-ইসলামকে হত্যা করার অপরাধে সুলতান ইব্রাহিম তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজা কংস নিরুপায় হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁর পুত্র যদু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করবে এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি সে-যাত্রা মুক্তি পান। এর পরও রাজা কংস মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছেন। যদুনাথ সরকার আধুনিক বিচারে রাজা গণেশের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য যা পাচ্ছি স্বর্ণকুমারী দেবী তাকে

যথাযোগ্য ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।[১] অবশ্য কল্পনার আশ্রয়ও তিনি নিয়েছেন।

আগে বলেছি, সেকেন্দর শাহ ঠিক ইতিহাসের অনুরূপ নয়। গিয়াসুদ্দীনের চরিত্রও ইতিহাসসম্মত নয়। যদুর নাম উপন্যাসে যাদব। যদুর মুসলমান-ধর্ম গ্রহণের যে কারণটি লেখিকা দিয়েছেন তাও তাঁর নিজের। গণেশ-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা স্বাধীনচিন্ততার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নায়ক হিসেবে তাঁর সম্মান। এ চরিত্রটি পূর্ণবিকশিত নয়। রোমান্সের চরিত্র-অঙ্কনে যে বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায় এখানেও তা লক্ষিত হয়। গণেশ-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকার উদ্দেশ্য-প্রবণতা জয়ী হয়েছিল। ইতিহাসে রাজা গণেশকে যেভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে লেখিকা তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। বিবিস্তার বর্ণনাই লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। এখন সেই উদ্দেশ্যপ্রবণতাটি কি? ইতিপূর্বে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা ক্ষাত্রবীর্যের, স্বদেশহিতৈষণার এবং বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত বীর চরিত্রের বীরত্ব-উন্মাদনার পশ্চাতে নীতিকথনের আত্যন্তিক প্রকাশ ছিল না। যেমন মধুসূদনের মহাকাব্যে নীতিকথন অপেক্ষা চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই বৃহত্তর হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেইরকম রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যেও সেই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির লীলা দেখতে পাই। স্বদেশীপ্রেরণার প্রথম জোয়ারে যে উত্তেজনাবহুল প্রাণশক্তির পরিচয় দেখা যায় তারই প্রতীক ছিল সে-সমস্ত ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, সে উত্তেজনা যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন তাকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড করাবার প্রেরণা আসে। রাশ ধরে একবার দাঁড়াতে হয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা করতে হয়। এই কারণ পরবর্তী বীরচরিত্র কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই নিজেদের শক্তি ব্যয় করে না বরং সে শক্তিরই যথার্থ ব্যবহারে সমাজ নির্মিত হয়। অনুমান করি, স্বর্ণকুমারী দেবীর রাজা গণেশ চরিত্র অঙ্কনে এই অভিপ্রায় ছিল। তিনি গণেশ-দেবকে কেবল আদর্শ বীর রূপেই দেখতে চান নি বরং সকল ধর্মে সমদর্শী আদর্শ প্রজাপালক রাজা রূপেও দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজার আদর্শ তাঁর সামনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু হৃদয়ের উদ্দাম আবেগে বঙ্কিমচন্দ্রের অধঃ-পতিত সীতারামের দৃশ্য তাঁর সামনে ছিল। সীতারাম চরিত্রের অধঃপতনের পশ্চাতে এই নীতিহীনতা, হৃদয়ধর্মের প্রবলতা, প্রজাসুখ অপেক্ষা নিজের সুখকে বৃহৎ করে দেখা। সুতরাং স্বর্ণকুমারী দেবী রাজা গণেশদেবকে প্রজাপালক বীর

১. J. N. Sarkar, *History of Bengal, Vol. II*

আদর্শস্থানীয় রাজা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। গণেশদেবের সহায় ছিলেন সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনী নিবৃত্তিমার্গের পথিক। পুণ্যের দ্বারা পুণ্য অর্জন এইটিই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। গণেশদেবও পুণ্যের দ্বারা পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। শক্তিময়ীর প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাই তিনি বারবার নিষ্ঠুর সমাজশাসনকে মেনে নিয়েছেন। এইটি ভালো কি মন্দ সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র লেখিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এইটিই সঙ্গত বলে বোধ হয়। সাহেবুদ্দীনকে মুক্তি দিলে যুদ্ধবিগ্রহ এড়ানো যেত। হয়তো কূটনীতির দিক থেকে সেইটিই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু কূটনীতি অপেক্ষা ন্যায়ধর্ম বড়ো। রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাণীই গণেশদেবের সহায়। রাজনীতির অসিভাগে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের কোনো বিচারই সম্ভব নয়—এইটি গণেশদেব মানতে চান না। তাঁর মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতাও লক্ষণীয়। ইতিহাসও অনুরূপ সাক্ষ্য দেবে। রানী যখন সাহেবুদ্দীনকে গিয়াসুদ্দীনের হস্তে দিতে রাজাকে অনুরোধ করলেন, তখন

'কেন তোমরা তাদের দোষ দাও? হিন্দুজাতির যথার্থ গৌরব তাহাদের উদারতায়. যদি হিন্দু বলে গর্ব থাকে ত অন্য কাহাকেও ঘৃণা করো না। সকলকেই আত্মবৎ মান্য করো।'

অবশ্য গণেশদেবের চরিত্র অপরিস্ফুট, রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত। বিশেষত মাতার আদেশে শক্তিকে পরিত্যাগের পর রাজা যখন পুনরায় শক্তিকে বলেন তাকে তিনি হয়তো গ্রহণ করতেন তখন আমাদের বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। কারাগারে তাঁর শোকাবহ অবস্থাটি চরিত্রের উপযোগী নয়। এইটি আরোপিত বলে মনে হয়। শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, তার প্রতিশোধস্পৃহা ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে বেমানান নয়। তবে নিশীথরাত্রে সম্রাটগৃহ থেকে দিনাজপুরের শিবিরে আগমন এবং রাজার কাছে প্রণয়নিবেদন বাস্তবতার দিক থেকে সম্ভব বলে মনে হয় না। মুনশী-সর্দারের কথোপকথন বঙ্কিমচন্দ্রের রামা-শ্যামার সংলাপের অনুরূপ। নিরুপমা অপরিস্ফুট। সন্ন্যাসিনী রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী।

চণ্ডীচরণ সেন

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) যখন গ্রন্থরচনায় ব্রতী তখন রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সবগুলিই প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের সূত্রপাতও সে সময়ে। অথচ চণ্ডীচরণ রচনাকর্মে এই দুই সাহিত্যিকের প্রভাবমুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রেব উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও যোগান বেড়ে গেল। একদল সাহিত্যিক ইতিহাসকেই গল্পের আকারে রচনা করবার দায়িত্ব অঙ্গীকার করলেন। ইতিহাস ও উপন্যাসের ভেদরেখাটি তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। চণ্ডীচরণেব ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলিও মূলত ইতিহাস এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও বটে। এগুলিকে উপন্যাস বলতে অনেকেরই দ্বিধা জাগবে। সুখপাঠ্য ইতিহাসের প্রাচুর্য তখন ছিল না। সুতরাং চণ্ডীচরণ তাঁর উপন্যাসে 'স্থানে অস্থানে'[১] তথ্য পরিবেশন করে ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

চণ্ডীচরণ সেনের 'আংকল টমস কেবিন' (১৮৮৫) অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা জাগে। ইতিহাস পাঠে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নিষ্ঠার কথা কন্যা কামিনী বায় উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন। নানা লাইব্রেরিতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রবণতাও চণ্ডীচরণের ছিল।

তবে 'টম্‌কাকার কুটীর'ই তাঁর উপন্যাস রচনার আদর্শ ছিল।[২] টম্‌কাকার কুটীরে হেলির নিষ্ঠুরতা, টমের ধর্মপ্রবণতা, ইলাইজার দুঃখদারিদ্র্য, দাসদাসীদের উপর নির্যাতন লেখককে অভিভূত করেছিল। তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলিতে এব প্রভাব দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ মিসেস স্টো যেমন ধর্মযাজিকার (মিসেস স্টো ধর্মযাজকের কন্যা এবং পাদ্রীর পত্নী) মতো উপন্যাসে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন চণ্ডীচরণও ব্রাহ্মশিক্ষকের আসনে বসে উপন্যাসে ধর্মকথার আলোচনা করেছেন। টম্‌কাকার কুটীরের চরিত্রগুলির

---

১. কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী

২. ঐ

আকস্মিক মিলন চণ্ডীচরণের উপন্যাসেও অনুস্থত হয়েছে। দাসব্যবসাবিরোধী আইন প্রণয়নে টম্‌কাকার কুটীরের দান অনেকখানি। চণ্ডীচবণ অবশ্য সেরকম কিছু দাবি করতে পারেন না।

চণ্ডীচবণেব গ্রন্থ-রচনার অন্যতম উৎস তাঁর স্বদেশপ্রেরণা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যোগ ঘনিষ্ঠ। চণ্ডীচরণের উপন্যাসে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা না গেলেও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা তাঁর বচনাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় 'নন্দকুমারাদি লিখিয়া তিনি অচিরাৎ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন'।[১]

চণ্ডীচরণ ধনী ছিলেন না। তাঁর দারিদ্র্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। দারিদ্র্যেব প্রতিচ্ছবি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ইংরেজের অত্যাচারের মধ্যে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে এক দিকে অর্থশোষণ অন্য দিকে সেই শোষণে পিষ্ট মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি শুনি। ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভূতি ছিল বলেই উপন্যাসগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চণ্ডীচরণেব সঙ্গে রমেশচন্দ্রেব যোগ ছিল। চণ্ডীচরণের 'লঙ্কাকাণ্ড' (বিদ্রূপাত্মক কাব্য, ১৮৮৩) রাজরোষে পড়তে পারে বলে রমেশচন্দ্র আশঙ্কা প্রকাশ কবেছিলেন।

চণ্ডীচরণেব উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে কামিনী রায় বলেছেন, 'এই সকল পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসচর্চার সঙ্গে ধর্ম ও নীতিপ্রচার'।[২] চণ্ডীচরণ নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন—

'The religion which has been purchased by the tears of my father shall be strictly followed by me, at any cost and at any sacrifice.'

এই ধর্মনিষ্ঠা থেকেই সমাজসংস্কারের বাসনা চণ্ডীচরণের মনে জেগেছিল। সেই কারণে তিনি সমাজকে সংস্কারকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা ব্যক্তিগত কারণ-সম্ভূত।[৩] মানিকগঞ্জে থাকাকালীন তিনি দুর্নীতি-পরায়ণ বৈষ্ণবদেব ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে একখানি মুদ্রিত পত্র বার করেন।

চণ্ডীচরণের 'টম্‌কাকার কুটীরের'র অনুবাদ সাবলীল। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর

১, কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী

২, ঐ

৩, ঐ

মৌলিক রচনায় এই সাবলীলতার অভাব। এর কারণ বিশ্লেষণে কামিনী রায় বলেছেন,

'অনেকক্ষণ বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, শব্দ বাছিয়া লিখিবার জন্য তিনি সময় ব্যয় করিতেন না, এবং অপরকে এরূপ করিতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন।'১

চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলিতে কলাবোধের অভাব। উপন্যাস রচনাকালে তথ্যের কিছু অংশ থাকে নেপথ্যে, কিছু প্রকাশ্যে। চণ্ডীচরণের উপন্যাসে নেপথ্যেলোক নেই। চণ্ডীচরণ প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদান অবিকৃত রাখবার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। ফলে চণ্ডীচরণের রচনা উপন্যাসের ছাঁচে ইতিহাস। এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা উচিত।

মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা

চণ্ডীচরণের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা' ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। লেখক প্রকৃত তথ্যসন্নিবেশের ত্রুটি করেন নি। *Bolts on India*, মেকলের রচনাবলী, থর্নটনের *History of British Empire in India*, ক্লাইভের পত্রাবলী, *Calcutta Review*, সিয়ারল মুতখেরিন, ট্যাবেনের *Empire in Asia*, বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতাকে অবলম্বন করে চণ্ডীচবণ সেন এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

'আমার লিখিত টমকাকার কুটীর পাঠ করিয়া অনেকানেক সুশিক্ষিত লোক বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদিগের কর্তৃক আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন জাতির লোকই অপর কোন জাতির উপর কখনও এইরূপ ভীষণ অত্যাচার করে নাই। বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারেই জানেন না।'

পরে বলেছেন—

'সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।'

এই হৃদয়বিদারক কাহিনী মহারাজ নন্দকুমারে অঙ্কিত। ইতিহাসে এই

---

১. কামিনী রায়, প্রাচ্ছিকী

সময়টি Plessy Plunder নামে অভিহিত। পরিশেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, এদেশের মানুষের ইতিহাস-পাঠে অরুচি তাই ঘটনাকে উপন্যাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। এই মন্তব্যটিতে সংশয়ের অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহে ইতিহাস-পাঠের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সুতরাং লেখকের মন্তব্যটির লক্ষ্য অন্যরূপ। সম্ভবত তখন পর্যন্ত প্রকৃত ইতিহাস-পুস্তকের অভাবই লেখকের বক্তব্যের লক্ষ্য। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতিসুধা পরিবেশন করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

'মহারাজ নন্দকুমার' প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। গ্রন্থের নাম 'মহাবাজ-নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা'। চণ্ডীচরণ শেষোক্ত দিকটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক অবস্থা-বিশ্লেষণই লেখকের স্পৃহণীয়। এজন্য মহারাজ নন্দকুমারে নন্দকুমারের সঙ্গে যোগ নেই এমন সমস্ত ঘটনারই বেশি উল্লেখ দেখি। গ্রন্থের আরম্ভে এবং গ্রন্থেব শেষে নন্দকুমারের উল্লেখ আছে। কিন্তু অংশটি শিথিলবিন্যস্ত।

কেবলমাত্র দ্বৈতশাসনের কুফল দেখিয়েই লেখক ক্ষান্ত হন নি। সঙ্গে সঙ্গে বিধবানির্যাতন, রমণীনির্যাতন, বৈষ্ণবদের অনাচার এ সমস্তই সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এইগুলির সঙ্গে ইংরেজ শাসনের যোগাযোগ কেবল ক্ষীণই নয়, পরোক্ষ যোগ আবিষ্কার করাও দুরূহ। বাংলা নাটকের আদিপর্বে এই সামাজিক বৈষম্যকে নিয়ে নাট্যরচনার জোয়ার এসেছিল। লেখকের রচনাও এদেরই সগোত্র।

চণ্ডীচরণ সেনের গ্রন্থে প্রভুসম্মিত বাক্যের অভাব নেই। উপন্যাসটিতে কাহিনী কিছু নেই। তবে কতগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারে বর্ধিষ্ণু তন্তুবায় সমাজ বিপর্যস্ত হলে সভারাম তাঁতি কপর্দকহীন অবস্থায় একমাত্র কন্যা সাবিত্রীকে নিয়ে বাস করছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হল। অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আর্মানিয়ান বণিক ক্যারাপিট আরটুনের স্ত্রীর দয়ায় সাবিত্রী রক্ষা পেল। তার পর সে গেল তার ভাইকে উদ্ধার করতে কলকাতায়। এই যাত্রাপথের দীর্ঘ বিবরণ গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণবদের আখড়া, হিন্দুবিধবানির্যাতনের বর্ণনা একের পর এক উল্লিখিত। পরিশেষে নন্দকুমারের বিচারের দৃশ্য। মহাপুরুষ বাসুদেব শাস্ত্রীর উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে দেখি। লবণব্যবসায়ী ক্যারাপিট আরটুনের মর্মন্তুদ কাহিনীও কয়েকটি অধ্যায়ে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবপ্রাণতার বিশুদ্ধি ছিল না। নিন্দিত মর্কট বৈষ্ণব-সমাজ তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এই 'মর্কট বৈরাগ্য' চণ্ডীচরণের সমালোচনার স্থল হয়েছে। আখড়াগুলি তখন বৈষ্ণবদের ব্যভিচারের কেন্দ্র। সাবিত্রীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে সাধনসঙ্গিনী করার যে বীভৎস চিত্র লেখক দেখিয়েছেন তাতে আতিশয্য থাকলেও সত্যের বিশেষ অপলাপ আছে বলে মনে করি না। ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর ঘটনাটি যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। বিধবার করুণকাহিনী প্রকাশ করেছেন সুদক্ষিণার মৃত্যু বর্ণনায়। সামাজিক কৌলীন্য রক্ষা করবার জন্যে সুদক্ষিণার পিতা কন্যার হাতে বিষ তুলে দিতে দ্বিধা করেন না। তন্তুবায়, লবণব্যবসায়ীর দুরবস্থার যে চিত্র লেখক উপস্থাপিত করেছেন তা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। অর্থলোভ কোম্পানির কর্মচারীদের ধাপে ধাপে পঙ্কিলতার স্তরে নামিয়ে আনছিল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—

'It has been said that after Plessy the world was let loose upon the English Company's servants in India and they were let loose upon the world with all the persons that despotism could give. Clive set ball rolling. He substituted easy wealth for the slow return of commerce **Money! Money! and no time to be lost.'১

এ থেকেই সৃষ্টি হল মধ্যস্থ ব্যক্তি। এদের সাহায্যেই ইংরেজ শোষণযন্ত্র অব্যাহত গতিতে চলল। রামহরি, ছিদাম বিশ্বাস, মদন দত্তের ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা এখানে। চণ্ডীচরণ বলেছেন—

'তাহাদের (মুসলমানদের) অত্যাচার একপ্রকার অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতা মাত্র। কৌশল পরিপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ অত্যাচার, পণ্যদ্রব্যের একাধিকার সংস্থান পূর্ব্বক বাণিজ্যের মূলে কুঠারঘাত প্রদান, নানাবিধ চক্রান্ত দ্বারা প্রজাসাধারণের অর্থশোষণ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা মুসলমান রাজত্ব কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।'

এই কুপ্রথার বর্ণনাই গ্রন্থে আদ্যন্ত বিস্তৃত। পরাধীনতার বেদনা চণ্ডীচরণকে পীড়িত করেছিল। কিন্তু সেজন্য কেবল জাতিবৈরিতাকেই তিনি একমাত্র সমাধান মনে করেন নি।

'বঙ্গবাসীদিগের স্বার্থপরতা সম্ভূত কাপুরুষতা, বাঙ্গালীদিগের পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব ইংরাজদিগের এইরূপ অবৈধ সংস্থাপনের মূল কারণ।'

নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? অদৃষ্ট? নিয়তি? লেখক গ্রন্থের

---

১. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal, Vol.I*

প্রারম্ভে বলেছেন, হলধরের পুত্রকে গ্রহণ না করার জন্যই নন্দকুমারের পতন। এ ব্যাখ্যায় বিশেষত্ব কিছু নেই। চাকুরীজীবী বাঙালিজাতির প্রতি লেখকের উক্তি লক্ষণীয়।

'বাঙ্গালী জাতি চাক্‌রীর নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত চাক্‌রী বাঙ্গালীর প্রাণ, চাক্‌রী বাঙ্গালীর জীবনসর্ব্বস্ব, চাকুরী একমাত্র উপাস্য দেবতা।'

হিন্দু বিধবাদের উপর লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' এর প্রতিবাদও করেছিলেন। তবে এই ধারণাটি উপন্যাসে আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয় নি। নীলদর্পণের মতো উপন্যাসটিতে ঘন ঘন মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সুদক্ষিণা, শ্যামা, সাবিত্রী, ক্যারাপিট আবটুনের পত্নীর কাহিনী-বর্ণনা একরূপ।

মহারাজ নন্দকুমারে যে-সমস্ত চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাই তাদের বংশধর লেখকের পরিচিত ছিল। সুতরাং মহারাজ নন্দকুমারে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে বলে অনুমান করি। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ অনেক সময়েই চণ্ডীচরণের রচনাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। সাবিত্রীর পলায়নের দৃশ্যটি আঙ্কল টমস কেবিনের ইলাইজার পলায়নের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনা যে 'টমস কেবিনে'র আদর্শে রচিত সে কথা বলার অবসর রাখে না।

উপন্যাস হিসেবে মহারাজ নন্দকুমার ব্যর্থ রচনা হলেও এই উপন্যাসই ইতিহাস-চর্চার পথটিকে সুগম করে দেয়। তা ছাড়া স্থূলতা লক্ষিত হলেও বর্ণনার বাস্তবতা সে-যুগের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। বইটি যে সেকালে পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ আছে।

আরো একটি কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট কদর। বাংলার বাণিজ্যের দুর্গতি চণ্ডীচরণের বইতে দেখি। বাংলার বাণিজ্যের এই দুরবস্থাই হয়তো অনেককে ব্যথিত করেছিল। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রেরণাও কেউ কেউ পেয়েছিলেন চণ্ডীচরণের বই পড়ে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

'মহারাজ নন্দকুমারে'র পর চণ্ডীচরণ লিখলেন 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' (১৮৮৬)। 'মহারাজ নন্দকুমারে'র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের উল্লেখ আছে।

গঙ্গাগোবিন্দের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বন করে এ উপন্যাসটি রচিত। ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনই চণ্ডীচরণের মূল লক্ষ্য ছিল। দেশে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিহাসবোধের অভাব দেখে লেখক খেদ প্রকাশ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। একই সময়ের ঘটনা বলে মহারাজ নন্দকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঘটনাগত মিল দেখা যায়। তবে মহারাজ নন্দকুমারে দেশের ভেদবৈষম্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখি আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে অত্যাচাব নিপীড়নের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। অবান্তর বিষয় যথাসাধ্য পরিহার করবাব চেষ্টা আছে এই উপন্যাসে। মহারাজ নন্দকুমারে কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি নেই, চরিত্রচিত্রণও উল্লেখযোগ্য নয়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে এ দোষ কিছুমাত্রায় পরিহার করা হয়েছে।

লেখক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন বার্কের বক্তৃতাবলী, পিটার্সনের রিপোর্ট, গ্রেজিয়ারের বিবরণ, হেস্টিংসের বিচারের দলিল-দস্তাবেজ, গুডল্যাড সাহেবের রিপোর্ট এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে লিখিত ইংরেজ কর্মচারীদের পত্রাবলী থেকে।

লক্ষণীয়, লেখক যে রংপুরের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন তার ইতিহাস ইতিপূর্বে কবি রতিরামের 'জাগ গানে'র রাস অংশে পেয়েছি। রতিরাম বলেছেন, 'রাজার পাপেতে হৈলো মুলুক আকাল। শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল'। দেবীসিংহকে কবি এইভাবে এঁকেছেন—

'কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং ॥
যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভুষণ বাহন ॥'১

চণ্ডীচরণের প্রধান উপজীব্য রংপুরের বিদ্রোহ। রংপুর অঞ্চলে দেওয়ানের এবং দেবীসিংহের অত্যাচার গ্রন্থটিতে বিস্তৃত হয়েছে। মহারাজ নন্দকুমারের সাফল্যে লেখক উৎসাহ বোধ করেছিলেন। ভূমিকায় বলেছেন, 'বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিবার বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছে'। একটু পরে বলেছেন, 'এই উপন্যাসের উল্লিখিত প্রায় সমুদয় ঘটনাই সত্য'।

---

১. ঘটনার ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা' গ্রন্থে।

চণ্ডীচরণ সেন গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ের শিরোনামায় নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি গ্রন্থে সিরাজদ্দৌলা, রেজা খাঁর পাপাচরণের কথা বলেছেন, ইংরেজ কলঙ্ককালিমাকেও বিস্তৃত করেছেন। নবীন-চন্দ্রের কাব্যে এতটা ইংরেজ সমালোচনা পাই না।

উপন্যাসের নাম 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ'। কিন্তু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বর্ণনা প্রধান নয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রায়ই নেপথ্যে থেকে গেছে। বার্কের উক্তি সত্য হলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নিয়ে একটি চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল।[১] ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের অনেক সৎকার্যের বিবরণও আছে।[২] সম্ভবত লেখক সেজন্য এই ইতিহাসকে অবিকৃত রাখবার জন্যে দেওয়ানের অনুশোচনার অংশটিকেই প্রধান করেছেন।

সত্যবতী রোমান্টিক চরিত্র। তার মধ্যে একটা অসামান্যতার ছাপ আছে। তার নানকুতে রূপান্তর কতকটা অবিশ্বাস্য ঠেকে। কমলাদেবীর চরিত্রে দেবী চৌধুরানীর ক্ষীণ আভাস লক্ষিত হয়।

বিদ্রোহকে লেখক কেন বিস্তৃত করেন নি তা বলা দুষ্কর। তবে বিদ্রোহের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তিনি আস্থাবান।

'এই ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ যাঁহারা সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে। ভাবী বংশাবলী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া অর্চনা করিবেন। এই অনিত্য দেহ সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ যাঁহারা বিসর্জন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা।'

এ দেবসদৃশ মানবের বিদ্রোহ গ্রন্থে নেই। নীলদর্পণ নাটকে যেমন অত্যাচারের দিকটি একতরফা হওয়াতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার তীব্রতা হারিয়েছে, সেরকম চণ্ডীচরণের রচনায়ও প্রতিপক্ষের নীরব সহনশীলতা ঘটনাটিতে বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম হয়েছে।

দেবীসিংহের কারাগারের বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাস্তবতা লক্ষণীয়। লেখকের সমালোচনা তীব্র হলেও আন্তরিকতায় তা আমাদের স্পর্শ করে।

'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিক অর্থের প্রয়োজন। কৃষককে সর্বস্ব প্রদান করিতে হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে, ধর্মশিক্ষা প্রদানার্থ অতি উচ্চ বেতনে বিশপ নিযুক্ত করিতে হয়, রাজস্ব-

---

১. বার্ক বলেছেন,'...a name at the sound of which all India turns pale—the most wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever... rank servitude of that country.'

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ

আদায় নিমিত্ত গুড্‌ল্যাডের স্থায় উপযুক্ত কালেক্টর এবং দেবীসিংহের ন্যায় উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়। শান্তিরক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করিতে হয়, কৃষক তাহার যথাসর্বস্ব প্রদান করিয়া ইহার ব্যয় বহন না করিলে দেশ শাসনের ব্যয় কিরূপে চলিবে? কৃষক কেবল অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া অর্থসঞ্চয় করিবে, কিন্তু তাহার শ্রমোৎপন্ন ফলে তার নিজের কোন অধিকার নাই।'

পরে বলেছেন—

'সংসারে এই যদি ন্যায়বিচার হয়, তবে চোরকে কেন নিন্দা করি? যদি বিচারক, শান্তিরক্ষক এবং ধর্মশিক্ষার্থ লর্ড বিশপ ইত্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, প্রজাদিগকে একেবারে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে সে বিচারক, সে শান্তিরক্ষক, সে লর্ড বিশপ নিযুক্ত না করিয়া, প্রজাদিগকে চোর ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিলেই তো ভাল হয়।'

আমাদের মনে হয় এই ইংরেজ সমালোচনাই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। রানী ভবানীর চকিত পরিচয় উজ্জ্বল। রানী ভবানীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রেমানন্দের পত্রে শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব ব্যক্ত। প্রেমানন্দের পত্র আংকল টমস কেবিনের জর্জ হ্যারিসের পত্রের কথা অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়।

অযোধ্যার বেগম

মহারাজ নন্দকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পর চণ্ডীচরণের দৃষ্টি পড়ল অযোধ্যার উপর। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে 'অযোধ্যার বেগম, প্রথম খণ্ড' (২য় খণ্ড ১৮৮৬, ১৫ ডিসেম্বর) লিখলেন। এ বইটিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত। হেস্টিংসই তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার। বিষয়বস্তু অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে হলেও বাঙালি চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় উপন্যাসটিতে আছে।

লেখক আইনব্যবসায়ী হওয়াতে গ্রন্থের মধ্যে বিচারবিভাগীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। চণ্ডীচরণ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—

'গত কয়েকমাস আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে হয়, ভবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত, আমি এত দিনে পাগল হইয়া যাইতাম। ভবিষ্যতে কি আছে জানি না, তবে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।'

'অযোধ্যার বেগমে' এই দারিদ্র্যের জ্বালা এবং ঈশ্বরানুরক্তির প্রকাশ দেখি। লেখকের অদম্য পাঠস্পৃহা এবং জ্ঞানতৃষ্ণা তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। এজন্য তথ্যবিকৃতি তাঁর উপন্যাসে বিশেষ নেই। বরং স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ

দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাদটীকায় লেখক আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। যশোবন্তনামা, আবুতালিবের ইতিহাস, বার্কের বক্তৃতাবলী, জেম্‌স মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকের অবলম্বন ছিল।

অযোধ্যার বেগমের প্রথম খণ্ডে ইংরেজের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ডে তার পরিণাম। কাহিনীর তিনটি সূত্র। এক অযোধ্যার বেগম, দুই চৈৎসিংহ গোলাপকুমারী, তিন বাণেশ্বর অমরসিংহ আখ্যায়িকা। কাহিনীগুলির যোগ দৃঢ নয়—শিথিলবদ্ধ।

হেস্টিংসের চক্রান্তে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের উপর অত্যাচার করেন। সুজাউদ্দৌলার রাজ্যলোভ তাঁর বিপদ ডেকে আনে। ইংরেজের ক্রমাগত অর্থের দাবি মেটাতে না পেরে তিনি হেস্টিংসের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। নারীনির্যাতনে এবং জঘন্য লালসাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর পত্নী বউবেগমের পুত্র নবাবী পায়। ইংবেজরা পুত্রকে দিয়েই বউবেগমের উপর অত্যাচার করে। পরে অবশ্য এ অত্যাচার প্রকাশিত হয়। বউবেগম পুনরায় জায়গীর ফিরে পান। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলার নবাবমহিষী মীরণের মাতা জগদম্বা বেগমের করুণ কাহিনী।

বারাণসীর স্বাধীন রাজা যশোবন্ত। তাঁর পত্নী গোলাপকুমাবী। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা পূর্ণিমা বা পান্নাব প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে রাজা তাকে বিবাহ করেন। গোলাকুমারী পূর্ণিমার প্রবোচনায় অন্তঃপুর ত্যাগ করলে। পূর্ণিমার পুত্র চৈৎসিংহ। চৈৎসিংহের রাজ্যে ইংরেজ প্ররোচনাতে অসন্তোষ দেখা দিলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়। অবশ্য সে বিদ্রোহ অতি সহজেই নির্বাপিত হয়।

তৃতীয় কাহিনীটি এই। অমরসিংহ বাণেশ্বরেব পুত্র। বাংলার নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত এই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অমরসিংহ (আসল নাম ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য) অযোধ্যায় এসে পড়ে। রোহিলাদের উপর অত্যাচার করে হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে যখন সুজাউদ্দৌলা হরণ করে হারেমে নিয়ে আসে তখন অমরসিংহ বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে বারাণসীর যুদ্ধে যোগ দিয়ে সে বীরত্ব প্রদর্শন করে। বারাণসীতে সকলে মিলিত হলে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাহিনীগুলির মধ্যে যোগসূত্র নেই। ইংরেজ-অত্যাচারের তিনটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হিসেবে এই কাহিনীগুলিকে ধরা যেতে পারে। কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল

ইংরেজের কূটনীতি দেখাবার। সমস্ত বাঙালি পরিবারের মিলনদৃশ্যটি সহজ সমাধানপ্রবণতার সাক্ষ্য। বিশেষত প্রাচীরগাত্রে অমরসিংহের হাফেজ-নন্দিনীর নাম লিখে রাখা এবং বাণেশ্বরের পুত্রের হস্তাক্ষর চিনতে পারার মধ্যে ভাবালুতাব পরিচয় সুস্পষ্ট।

নীতিপ্রবণতাও দুর্লক্ষ্য নয়। জগদম্বা বেগমের চরিত্র অপরিস্ফুট—আদর্শ-বাদেব স্বাক্ষর। লেখকের উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সুজাউদ্দৌলা, চৈৎসিংহ, আসফউদ্দৌলা সকলেই বিধাতার অমোঘ নিয়ম 'উল্লঙ্ঘন' কবেছে বলেই তাঁদের এই 'প্রায়শ্চিত্ত'। এতে গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে কবি। বউবেগম এবং জগদম্বা বেগমের কথোপকথন অনেকটা গুরুশিষ্য সংবাদের মতো। লেখক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করে নানাস্থানে ধর্মপ্রচাব কবেছিলেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল দেখি উপন্যাসে। বউবেগমের অনুশোচনা একজন পাপীর কনফেশন।

সমসাময়িক উপন্যাসেব প্রতি লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। উপন্যাসে প্রেমের অবতারণা তাঁব দৃষ্টিতে ধিক্কৃত হয়েছে। একজন নবীনানন্দ স্বামী বলে যাব প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে তার লক্ষ্য মনে করি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের নবীনানন্দ। আসল কথা উপন্যাসের কাহিনীরসের প্রতি লেখক মনোযোগ দেন নি। উপন্যাসটির বিশিষ্টতার কথা বলি।

ইংরেজ বণিকেরা এদেশে যে সুচিন্তিতভাবে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় Cotton-এর স্বীকারোক্তিতে। অযোধ্যার সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী চণ্ডীচরণ সেন বর্ণনা করেছেন। হাফিজ রহমত খানের কন্যার প্রসঙ্গ অবশ্য ইতিহাসে পাই না। কিন্তু এই কাহিনীটি উপন্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। চণ্ডীচরণের স্বদেশপ্রেরণার সুন্দর দৃষ্টান্ত হাজিফ রহমত খানের শৌর্যবীর্য বর্ণনাব মধ্যে রয়েছে। গ্রন্থটির আকর্ষণ এইখানে।

বেগমদের উপর অত্যাচাবের মর্মন্তুদ দৃশ্যটি তিনি ইতিহাস থেকেই পেয়েছেন। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে করার কারণ নেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য—

'And their eunuchs were compelled by imprisonment, starvation and threat, if not actual infliction, of flogging, surrender the treasure in December, 1782'

চৈৎসিংহের কাহিনী ইতিহাসসম্মত। তবে চৈৎসিংহের কাপুরুষতার জন্যই

বিদ্রোহদমনের সুবিধা হয়েছিল এ ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই। বাঙালি বীরের বিদ্রোহে যোগদানও লেখকের কল্পনাপ্রসূত। এই বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট বলেছেন—'…the present insurrection is said believed to be an intention to expel the English'. লেখক চৈৎসিংহের কাপুরুষতা দেখিয়ে বিদ্রোহের স্বরূপধর্মকে অবহেলা করেছেন।

মীরকাশিম যে সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ্ আলমের সঙ্গে সন্ধি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা। এ উপন্যাসেও অযোধ্যাব বেগমদের উপর অত্যাচাবের মর্মন্তুদ বর্ণনা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

ঝান্সীর রানী

'ঝান্সীর রানী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। নামপত্রে এটিকে *A Historical Romance* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি পরিকল্পিত। রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড, ১৮৭৬) ইতিপূর্বে বার হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত আরও কয়েকটি উপন্যাসও ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। চণ্ডীচরণের এই গ্রন্থের নায়িকা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।

সে সময়ে লভ্য সিপাহীবিদ্রোহের সকল ঐতিহাসিক উপাদানই চণ্ডীচরণ কাজে লাগিয়েছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ঝান্সীর বানী সম্বন্ধে কিছু তথ্যবিকৃতি আছে। সিপাহীবিদ্রোহে রানীর যোগ ছিল—এইটি তাঁদের মত। ঝান্সীর রানী সম্বন্ধে ইংরেজের এই প্রতিকূল ধারণা নিরসন করে ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার কবা চণ্ডীচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রানী লক্ষ্মীবাঈ যথার্থ বীরাঙ্গনা। পরাধীন ভারতে এঁকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। অতএব 'লক্ষ্মীবাঈর চরিত্রের এই বৃথা কলঙ্ক নিরাকরণার্থ ঝান্সী বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনপূর্বক' চণ্ডীচরণ এই উপন্যাসটি রচনা করলেন। তবে 'উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রহিয়াছে'।

হোলকার সম্বন্ধেও ইংরেজের বিরূপ মনোভাব বর্তমান। সেইটি নিরসন করার অঙ্গীকারও লেখক গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত নানাসাহেবের সমালোচনা

গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁতিয়া তোপির বীরত্ব লেখককে মুগ্ধ করেছিল। এ ছাড়া আছে একটি অনৈতিহাসিক কাহিনী। ত্র্যম্বক-যোগিরাজ-গঙ্গাবাঈ আখ্যায়িকা। শেষোক্ত আখ্যায়িকার উপর লেখক গুরুত্বও আরোপ করেছেন বেশি। সিপাহী-বিদ্রোহ সর্বজনবিদিত ঘটনা। লেখকও তথ্যসমাবেশ করেছেন বিস্তৃতভাবে। এখানে বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই।

চণ্ডীচরণের দৃঢ় ধারণা ছিল জাতির অধঃপতনের জন্যেই ভারতবাসীর এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা। যোগেশের জবানিতে লেখক হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁতিয়া তোপি বীর, কিন্তু তাঁর পতন অনিবার্য। কেন না তাঁর শত্রু তিনটি।

'ঘৃণিত হিন্দুসমাজ প্রচলিত দেশাচার তাঁহার প্রধান শত্রু, তাঁহার জননী তাহার দ্বিতীয় শত্রু এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার তৃতীয় শত্রু।'

এই ত্র্যহস্পর্শের তাড়নায় তাঁতিয়া তোপির অধঃপতন। তাঁতিয়ার জননীকে শত্রু বলার কারণ তাঁতিয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মাতার তাঁকে বিবাহপ্রদান। গঙ্গাবাঈর ক্ষেত্রে হিন্দুমেয়ের বাল্যবিবাহের পরিণাম দেখি। এ দুটি ঘটনাই শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুসৃত আদর্শের পরিচয় বহন করছে। লক্ষণীয় লেখক ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথের দলভুক্ত ছিলেন। উপধর্মের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন রাধাকান্তদেবের প্রতি কটাক্ষ করে। ইংরেজদের যুদ্ধে জয়লাভ করার কারণটি লেখকের কাছে সুস্পষ্ট।

'ইহাদিগের (ইংরেজের) রাজ্য রক্ষার প্রকৃত দুর্গ কি শুনিবে? এই যে শিবের মন্দিরে বসিয়া আমরা কথা বলিতেছি, ঈদৃশ শত শত দেবীর মন্দিরই ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃত দুর্গ, আর আমাদের দেশপ্রচলিত জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা ইহাদিগের বর্ম এবং চর্ম, দেশব্যাপিনী অজ্ঞানতাই ইহাদিগের একমাত্র সৈনাধ্যক্ষ। লর্ড ক্লাইব, লর্ড লেক কিম্বা লর্ড নেপিয়ার কর্তৃক কি ভারত পরাজিত হইয়াছে? ভারতবাসিদিগের নৈতিক দুর্বলতা এবং বিবিধ কুৎসিৎ আচার ব্যবহারই তাঁহাদিগের পরাজয়ের একমাত্র কারণ। সুতরাং আমাদের নৈতিক দুর্বলতাই ইংরেজদিগের বল।'

রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে চণ্ডীচরণের মতামত বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকা সত্ত্বেও লেখক তাঁকে বিদ্রোহী বলেন নি। এ বিষয়ে লেখকের সত্যনিষ্ঠা এবং দূরদর্শিতা প্রশংসা পাবার যোগ্য। সম্প্রতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রানীর বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহীরাই রানীকে জোর করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। রানী এর পর ইংরেজের সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। ইংরেজের প্রথমে সহানুভূতি থাকলেও পরে রানীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। উপায়ান্তর না দেখে রানী যুদ্ধে অগ্রসর হন।

নানাসাহেবের প্রতি লেখক সুবিচার করতে পারেন নি। ইতিহাসে নানাসাহেব এতটা হীন নন।

আজিমউল্লা ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নিঃসন্দেহে একজন আকর্ষণীয় পুরুষ। তার প্রেমকাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ ইতিহাসে বর্ণিত।[১] সম্ভবত চণ্ডীচরণ এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই চরিত্রটির মধ্যে কিছুটা কৌতুকরসের যোগান দেবার চেষ্টা করেছেন। ত্র্যম্বক-যোগিরাজ কাহিনীর আতিশয্য আগেই লক্ষ্য করেছি। বিশেষতঃ ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর মুরগীর রোস্ট ইত্যাদি খাবার দৃশ্যটি সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। সিপাহী বিদ্রোহে এক নামহীন বাঙালি যুবকের পরিচয় আছে। অবিনাশ সম্ভবত সেই বাঙালি যুবক। লেখক বলেছেন যোগিরাজ রাজনৈতিক আনন্দাশ্রম স্বামী নন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, ঝান্সীর রানী দ্বিতীয় খণ্ডে 'যোগিরাজের দৈনিক পুস্তক' অথবা *India under the Crown* নামে একখানি বই লিখবেন। কিন্তু সেইটি আর লেখা হয় নি।

এই কি রামের অযোধ্যা

'এই কি রামের অযোধ্যা' (১৮৯৫) উপন্যাসে ঠগী অত্যাচার-কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে।

১. R. C. Majumder, *The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857.*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বউঠাকুরানীর হাট

রবীন্দ্রনাথেব ‘বউঠাকুরানীব হাট’ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। উপন্যাসটিতে স্পষ্টত বঙ্কিমেব প্রভাব আছে। বিষয়বস্তুও মৌলিক নয়। ইতিপূর্বে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে বাংলায় কয়েকখানি বই বচিত হয়েছিল। ভাবতচন্দ্রের কাব্য, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, হবিশ্চন্দ্রেব সাগর দ্বীপের শেষ স্বাধীন রাজা[১], প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ‘বউঠাকুরানীর হাটে’র ‘সূচনা’য় বলেছেন, তিনি সে যুগে লভ্য প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা সমস্ত বইই পড়েছিলেন। তবে ‘বউঠাকুরানীর হাটে’র প্লটের জন্য তিনি সর্বাপেক্ষা ঋণী ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’র কাছে। ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’র প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ‘বউঠাকুরানীর হাট’ লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’র দ্বিতীয় খণ্ড দেখবার সুযোগ পান নি। ‘বউঠাকুরানীর হাটে’র উৎস বিচার করতে গেলে ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’র প্রথম খণ্ডকেই গ্রহণ করতে হবে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ[২] ছিলেন বায়গড়েব অধিবাসী। এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে তিনি অনেক দিন কাজ করেছিলেন। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহও ছিল প্রচুর। এর প্রমাণ পাই এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এঁর প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে। প্রতাপচন্দ্র ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ লেখবার জন্য প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরেও সেখানকার জনশ্রুতিগুলি তিনি আহবণ করেছিলেন। তবে মূল উপাদান পেয়েছিলেন ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত[৩] থেকে। বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রথম খণ্ড

১. প্রতাপচন্দ্র বইটির উল্লেখ করেছেন। এ বইটিও প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত—রামরাম বসুর বইয়ের সার সংকলন। প্রতাপাদিত্যের কোনো কোনো জীবনীকার এ বইটির অবশ্য উল্লেখ করেছেন।

২. দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পুনশ্চ’ অংশ।

৩. W. Pertsch-এর সম্পাদনায় বার্লিন থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের কিছু অংশ প্রতাপচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সংকলন করেছেন।

বেরোবার পর আরও কিছু তথ্য *Proceedings of the Asiatic Society*-তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এগুলি পড়েছিলেন। পর্তুগীস লেখকের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ-গ্রন্থও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গোচরে এসেছিল।

'বঙ্গাধিপ পরাজয়'কে প্রতাপচন্দ্র বলেছেন Historic Romance, তিনি ইতিহাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে যথাসম্ভব কল্পনার জাল বুনেছেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' লেখক কল্পনা অপেক্ষা তথ্যের মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। যার জন্য ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

'নির্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র না হইয়া কেবল একমাত্র স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল।'

এই 'স্বভাব' বলতে লেখক ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা জোর করে বলা শক্ত। তবে পূর্ববর্তী উপন্যাসের আদর্শ থেকে লেখক তাঁর গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য দাবি করেছেন—এইটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে লেখক এই লাইনটি তুলেছেন—অত্রাপ্যুদাহরন্তীমিমং ইতিহাসং পুরাতনম্। এখানে ইতিহাস অর্থে প্রতাপচন্দ্র ইংরেজি History শব্দকেই বুঝিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা নেই।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। প্রতাপাদিত্য বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভুঁইঞা। তিনি পাঠানদের সহায়তায় মোগল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ঠিক করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনুপরামকে আশ্রয় দেন। পর্তুগীস দস্যু সেবাস্টন গঞ্জালিসের সাহায্যে তিনি এক দিকে যেমন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলেন তেমনি অন্য দিকে তাঁর বিভিন্ন চক্রান্তে তিনি গঞ্জালিসকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর থেকে। রাজা বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কচু রায় কি করে বঙ্গেশ বিজয়[১] করলেন তারই কাহিনী হচ্ছে বঙ্গাধিপ পরাজয়। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য-আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তিনি রায়গড়কেও নিজের শাসনে

১. বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ড বের হয় 'কাব্য প্রকাশ যন্ত্র' থেকে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই প্রেসে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানি বই ছাপা হচ্ছিল। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ের নামও ছিল 'বঙ্গেশ বিজয়'। কালীপ্রসন্ন সিংহ ইত্যাদির অনুরোধে তিনি 'বঙ্গেশ বিজয়' নামের পরিবর্তে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' রাখলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অপর গ্রন্থ বঙ্গেশ বিজয় প্রকাশিত হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে তার বিষয়বস্তু এবং লেখক কী ও কে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এ বইটিও কি প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা?

আনতে চেয়েছিলেন। বসন্তবায়ের পালিত জয়ন্তীরাজতনয়া ইন্দুমতীর প্রতি প্রতাপ প্রেমাসক্ত হন। ইন্দুমতী কচু রায়ের বাগদত্তা। প্রতাপাদিত্য ইন্দুমতীকে জোর করে নিয়ে আসবার জন্য সেবাস্টন গঞ্জালিস, কৃষ্ণনাথ, হুজুবমল, অনুপরাম ইত্যাদিকে পাঠালেন রায়গড়ে। রায়গড়ের বৃদ্ধমন্ত্রী ছিলেন অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল অর্থলোলুপ, অকর্মণ্য। সুতরাং প্রতাপের চক্রান্ত সহজেই সফল হতে পাবত। কিন্তু তাঁর চক্রান্তে বাদ সাধলে তাঁবই মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণের পুত্র মালিকরাজ ও জয়ন্তীরাজপুত্র সূর্যকুমার। মালিকরাজ ও সূর্যকুমাব চলে গেল বায়গড়ের দুর্গের দিকে ইন্দুমতীকে বক্ষা কববাব জন্যে। এই সময়ে মানসিংহও তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রতাপকে জব্দ করবাব জন্যে রায়গড়ের দুর্গে উপস্থিত হলেন। কচু রায় ছদ্মবেশে (বর্মাবৃত পুরুষ) রায়গড়ের দুর্গে এল। কচু রায়, মালিকরাজ, সূর্যকুমার ইত্যাদি রায়গড়ের সৈন্য নিয়ে প্রতাপের সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রথমবারে পরাজিত হলেও দ্বিতীয়বাবে কচু রায়েব জয় হল। প্রতাপ সংবাদ শুনে রায়গড়ে এলেন, কিন্তু তিনিও কচু রায়ের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। গ্রন্থেব উপসংহাবে মানসিংহ কচু রায়কে বললেন—

'কচু রায়। বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড তোমার, দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমায় অধিকারী করিলাম।'

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্যেব শেষ জীবন বর্ণিত হয়েছে।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে আরও কতগুলি ঘটনা আছে। যেমন, সূর্যকুমাব ও প্রতাপাদিত্যের কন্যা সরমার, মালিকরাজ ও মালতীব, ববদাকান্ত-অরুন্ধতীর প্রেমকাহিনী। মালতী সরমার সহচবী, অরুন্ধতী পলাযিত আরাকানী অনুপরামের ভগ্নী।

রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী দেবীকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পড়ে শোনাতেন। এই কারণে 'বউঠাকুরানীর হাটে' 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'ব মিল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গাধিপ পরাজযের সঙ্গে বউঠাকুবানীর হাটের পার্থক্যও প্রচুর। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে বসন্তরায়ের প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গ্রন্থের আরম্ভ। বউঠাকুরানীর হাটে বসন্তরায় একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ে পর্তুগীস, মগ দস্যুদের অত্যাচার-কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়েছে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের গ্রন্থ থেকে, Rainey, Blochmann ইত্যাদিব বর্ণনা থেকে তিনি পর্তুগীজ, মগদের সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র বলেছেন—

'It is genetally supported that Portuguese piracy and Mug incursions in the 16th century devasted the whole country.'

রায়গড়ের ইন্দুমতী, অনঙ্গপালের কন্যা প্রভাবতী এবং অনুপরামের ভগ্নীর উপর পর্তুগীজদের অত্যাচার প্রতাপচন্দ্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। বউঠাকুরানীর হাটে রামচন্দ্র রায়ের দরবারে ফার্ণাণ্ডিজের উল্লেখ ছাড়া আর কোনো কথাই পাচ্ছি না। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপাদিত্য চরিত্র বউঠাকুরানীর হাটের মতো নয়। এখানে প্রতাপাদিত্য উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কেবল পাপকর্মে লিপ্ত নয়। প্রতাপাদিত্যের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা (প্রথম সংস্করণেব ৫০২ পৃষ্ঠায়) লেখক বিস্তৃতভাবে বলেছেন।[১] বিজয়কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন,

'আমাদিগের দেশ, আমাদিগের ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল, আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি স্লেচ্ছযবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে। এ কেমন কথা?'

একটু পবের উক্তি—

'বিজয়কৃষ্ণ। তুমিও জান আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক সাহসী, অধিক বুদ্ধি-জীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত আমার ভয়ের পাত্র হইবে না।'

বউঠাকুরানীব হাটে প্রতাপাদিত্যের যবনবিদ্বেষ আছে সত্য, কিন্তু এই জাতীয় উক্তি নেই। দম্ভ, হিংসা, কুটিলতাই প্রতাপের বিশেষত্ব। তার পরে বউ-ঠাকুরানীব হাটে প্রতাপ হৃদয়হীন, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রতাপের সরমার জন্য উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা তাঁব পিতৃহৃদয়টিকে প্রকাশ কবে দিয়েছে। কিন্তু প্রতাপ-চরিত্রের সঙ্গতি বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নেই। প্রতাপকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য লেখক পব পর তিনটি স্ত্রীর উপব তাঁব কামুকতার পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বসন্তরায়ের ছোটো বানী বিমলার প্রতি প্রতাপের আসক্তি যদিও বা স্বাভাবিক হয় সুন্দরীর প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টি একেবারেই বিসদৃশ। এখানে প্রতাপ কাপুরুষ, হীন, দুশ্চরিত্র রূপে চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে উদয়াদিত্যের প্রসঙ্গ নেই। বউঠাকুরানীর হাটে উদয়াদিত্য লেখকের সহানুভূতির আশ্রয়ে দীপ্যমান। উদয়াদিত্য-পত্নী সরমাব প্রসঙ্গ বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নেই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীতে (১ম খণ্ড) লিখেছেন, বঙ্গাধিপ পরাজয়ের সরমা বউঠাকুরানীর হাটে সুবমা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গাধিপ পবাজয়ে সরমা প্রতাপাদিত্যের কন্যা আর

---

১. *Proceedings of the Asiatic Society, 1863*

২. বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বউঠাকুরানীর হাটে সুরমা উদয়াদিত্যের পত্নী—প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধূ। সরমার স্থলে বউঠাকুরানীর হাটে পাই বিভা। বিভার বিবাহ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখি সরমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুমতি রামচন্দ্র রায়ের পত্নী। রামচন্দ্র রায় ও বিভার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বিভা চরিত্র অপরিস্ফুট হলেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কল্পনাসঞ্জাত। বসন্তরায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ধারণা পোষণ করতেন তার কথা পরে আলোচনা করছি। তবে বসন্তরায়ের প্রতি দরদ এবং সহানুভূতি বঙ্গাধিপ পরাজয়েও পেয়েছি। তিনি যে একজন আদর্শ ক্ষমাশীল রাজা ছিলেন তার পরিচয় বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্যে পাচ্ছি। বসন্ত রায়ের মহত্বও গ্রন্থের সর্বত্র ঘোষিত। রুক্মিণী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ বউঠাকুরানীর হাটের অনুরূপ। কেননা বিজয়কৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রতাপাদিত্যের কাজের প্রতিবাদ করতেন না। কিন্তু তিনিও প্রতাপাদিত্যের অন্যায় বুঝতে পারতেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে আছে—

'এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই। পাপ যথেষ্ট হইয়াছে। শেষ উপস্থিত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না।'

কচু রায়ের প্রসঙ্গও বউঠাকুরানীর হাটে নেই।

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। বউঠাকুরানীর হাট পরে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপান্তরিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রায়শ্চিত্ত কার? প্রতাপাদিত্যের না বিভার? বিভার উক্তিকে গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত বিভারই। কিন্তু এক দিক থেকে এই প্রায়শ্চিত্ত তো প্রতাপাদিত্যেরও। বউঠাকুরানীর হাটে এই ভাবটি ঘটনাপ্রবাহে এবং বর্ণনায় অন্তর্লীন ছিল। এইটি কি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাধিপ পরাজয় থেকে পেযেছিলেন? বঙ্গাধিপ পরাজয়ে সূর্যকুমার মালিকরাজের উক্তি স্মরণীয়।

'মালিকরাজ। তুমি আমার আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাঙ্গিয়া বলিলে না।'

অনুমান করি রবীন্দ্রনাথও বউঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্যের জীবনের ট্র্যাজেডিকেই দেখাতে চেয়েছিলেন। তবে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। সে কারণে 'প্রায়শ্চিত্তে'র প্রতাপের মুখে শুনতে পাই—

'বৈরাগী, আমার একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই—আমার এই রাজ্যটা কিছুই না।'

বেঁচে থেকেও, সকল সুখের মধ্যেও যে ট্র্যাজেডির বেদনা থাকতে পারে প্রতাপের এই উক্তিতে তা স্পষ্ট।

বউঠাকুরানীর হাটের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর-চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না।'

এ থেকে বোঝা যাবে বঙ্গাধিপ পবাজয়ে প্রতাপকে কেন্দ্র করে যেটুকু দেশাভিমান ছিল তাও রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন নি। ইতিহাসই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু পববর্তীকালে প্রতাপেব যে ছবি আমরা পেয়েছি সেখানে বঙ্গের বীর সন্তানদেব মধ্যে তিনি অন্যতম। বউঠাকুরানীর হাট রচিত হবার কিছুকাল আগে থেকেই বাংলা দেশে স্বদেশী উদ্দীপনা জাগতে থাকে। ঠাকুরবাড়িতেও এই স্বদেশী প্রেরণার ঢেউ বয়ে যেত। হিন্দুমেলার ঐতিহ্যও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। তাঁর মধ্যে দেশপ্রীতি ছিল, কিন্তু ছিল না দেশ-উন্মাদনা। সুতরাং ববীন্দ্রনাথ যদি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো মহত্ত্ব খুঁজে পেতেন তাকে অবহেলা কবতেন না। কিছুকাল পরে বাংলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্য রাণা প্রতাপসিংহের সঙ্গে তুলিত—স্বদেশী সমাজ সিরাজকে শিবোপা দিয়েছে।

'যশোহব খুলনার ইতিহাস'-লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতাপাদিত্যের প্রশংসায় প্রতাপাদিত্যেব অসৎকর্মের মধ্যেও একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য খুঁজেছেন। সতীশবাবু গত শতাব্দীব ইতিহাস-লেখক এবং উপন্যাস-রচয়িতাদের কথা মনে করেই সম্ভবত এভাবে প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে দেশহিতৈষণার মহত্ত্ব আরোপ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে ববীন্দ্রনাথ যে প্রতাপাদিত্যের চিত্র বউঠাকুরানীর হাটে এঁকেছেন তা ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত রূপ কিনা? পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও দেখতে পাই প্রতাপাদিত্যের চরিত্র রবীন্দ্রমতঅনুসারী। বাংলার এই বারো ভুঁইঞা সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকারের মতামত প্রণিধানযোগ্য। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দেশাভিমানের কথা বলেছেন আচার্য সরকার তাকে আরও তীব্র ভাষায় সমর্থন করেছেন।[১] সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাই প্রতাপাদিত্যকে স্বাধীনতার পূজারী রূপে সম্মান দিয়েছিল। আসলে বাংলায় পাঠানরাজত্বের অবসানের ও মোগল-রাজত্বের অভ্যুত্থানের সময় একদল ভুঁইফোড় জমিদার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঘোষণা

১. J. N. Sarkar: ed. *History of Bengal*, Vol. II

করে। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল ছিল বলে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সমস্ত 'upstart mushroom' জমিদারেরা কিছুকাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ছিল। এদের মধ্যে কোনোরূপ স্বদেশী ঐতিহ্য আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। এই মতকে যদি প্রামাণিক ধরে নিই তবে বলব রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র যথাযথভাবেই আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা বিবেচ্য। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' লিখেছেন রামচন্দ্র-বিভা ঘটনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে নিষ্ঠুরতার সন্ধান করেছেন তা অমূলক। কেবলমাত্র গল্পটিকে 'জাঁকাল করিবার জন্য' রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন এইটি মানতে পারছি না। সতীশবাবু বমাই এবং রামচন্দ্রের প্রতি প্রতাপ যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন তার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন এইটি প্রতাপের একটি সাময়িক ক্রোধ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে অন্যায়কারী দুশ্চরিত্র রাজা হিসাবে ইতিহাস থেকে পেয়েছেন। সুতরাং দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার দম্ভ যদি প্রতাপের থেকে থাকে তবে তাঁর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞাকে কাজে পরিণত করবার ইচ্ছাও যে সম্ভব তা মানতেই হয়। উপন্যাসের সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও তো এইটি একান্তভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রামচন্দ্র যাতে পালিয়ে যেতে না পাবে তার জন্য প্রতাপাদিত্য নদীতে শালকাঠ ফেলে দিতে বলেছিলেন। সতীশবাবু এইটিও গল্পটিকে 'জাঁকাল করিবার জন্য' উদ্‌ভাবিত মনে করেন। এ ক্ষেত্রেও ঘটনাটি উপন্যাসের সত্য বলে মনে করি। 'ভৈরব স্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত' সতীশবাবুর এই উক্তিকে মেনে নিলেও রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টারূপের কোনোও ক্ষতি হবে না। আরও একটি কথা, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র ঘটনাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ বিশেষ নেই। সেখানে প্রতাপের এই জাতীয় কাজের স্বীকৃতি আছে। যে-প্রতাপ আপন পিতৃব্যকে হত্যা করতে পারেন তাঁর পক্ষে কি জামাতার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব?

'বউঠাকুরানীর হাট' জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গীকৃত।[১] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মন 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে

১. 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় আছে—'রাজর্ষি' উপন্যাস সৌদামিনী দেবীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিশিষ্টে রাজর্ষি উপহার দেওয়া হয় নি এর স্বীকৃতি আছে। দ্বিতীয়টিই সত্য।

প্রবেশ করলে।' একে রবীন্দ্রনাথ 'কৌতূহল' বলেছেন। 'প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে' —সুতরাং কবিমনের অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস খুঁজে পেতে চাইলে মুক্তির স্বাদ। অন্তরের কলরোল উপন্যাসেব পাত্রে স্থাপিত হল। এ-কথা ভুললে চলবে না তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ হয় নি। অনুকরণের স্পৃহাও একেবারে অবলুপ্ত হয় নি—কাব্যে বিহারীলালের, গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের। বসন্তরায়-উদযাদিত্য-বিভাকে কেন্দ্র করে তিনি পারিবারিক ঘটনাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করলেন। প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাবুকের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে এ উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। স্মরণের তুলিতে চিত্র না এঁকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেব কল্পনাকে হাজারখানা গীতে ভরিয়ে তোলবার প্রযাস পেলেন।

বিষয়বস্তুব জন্য 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'ব নিকট ঋণী হলেও রচনারীতিতে **তিনি বঙ্কিমের শৈলীকে গ্রহণ করেছিলেন।**

'বঙ্গাধিপ পবাজয়ে'ব লেখক 'নির্দিষ্ট নিয়মেব পরতন্ত্র' না হলেও স্কটের প্রভাব এড়াতে পাবেন নি। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্কটেব *Ivanhoe*-র সপ্তম থেকে নবম অধ্যায পর্যন্ত যে টুর্নামেন্ট ঘটনা আছে তাব থেকে প্রায় হুবহু অনুবাদ বঙ্গাধিপ পবাজযে দিযেছেন। টুর্নামেন্টেব ঘটনাব অনুরূপ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতাপাদিত্যের রাজসভা বর্ণিত। কৃষ্ণনাথ আসলে টেম্পাব ব্রায়ান, আর বর্মাবৃত পুরুষ (কচু রায়) বর্মে আবৃত Ivanhoe-কে স্মবণ কবিয়ে দেয়।

Ivanhoe উত্তরাধিকাব বঞ্চিত, কচু বায়ও তাই। সূর্যকুমারেব প্রতি সরমার ভালোবাসাব বর্ণনা স্কটেব বচনার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি। নায়িকাব রূপ বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত কবির অনুসারী। সংলাপেও এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

অপর দিকে ববীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব বঙ্কিমকে অনুসবণ করেছেন। স্কটেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই।[১] কিন্তু স্কটের প্রভাব বউঠাকুরানীব হাটে নেই। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে একমাত্র ভিলেন চরিত্র রুক্মিণী। রুক্মিণীর কাহিনীব মধ্যে যে বঙ্কিমেব প্রভাব রয়েছে তার প্রতিও

১. 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডে আছে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বউঠাকুরানীর হাট লেখেন তখন তিনি ইংরেজি বই পড়ে রস আস্বাদন করতে পারতেন না। প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। দ্রষ্টব্য, আত্মপরিচয়।

তিনি ইঙ্গিত করেছেন। রুক্মিণী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ। বলা বাহুল্য, বিষবৃক্ষের হীরার চরিত্রও এই জাতীয়। হীরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী—রুক্মিণী সুরমার জন্য। হীরা এবং রুক্মিণীর মধ্যে অপর সাদৃশ্য হচ্ছে—হীরা দেবেন্দ্রনাথের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী আর রুক্মিণী-সীতারামের সম্বন্ধও কতকটা তাই। দুইয়েরই জীবনের পরিণতি ব্যর্থ এবং শোকাবহ। হীরা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে উন্মাদগ্রস্ত, রুক্মিণীর পরিণতিও অনুরূপ।

বউঠাকুরানীর হাটের অপর চরিত্রগুলির আলোচনাকালে প্রায় সকলেই বাস্তবগুণের ন্যূনতার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—'চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে'! পরে বলেছেন, এ গল্প 'অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি', 'আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষি'।

কিন্তু এর মধ্যেও 'কারিগরি'র চিহ্ন এবং 'সঞ্জীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে' দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বউঠাকুরানীর হাটে'র প্রশংসা করেছিলেন। প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল হয় নি। বউঠাকুরানীর হাট যে সেকালে অনাদৃত থাকে নি তার প্রমাণ পাই কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত এর নাট্যীকৃত রূপের সমাদরে। রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এই নাটক বহুবার অভিনীতও হয়।[১]

বসন্তরায়-উদয়াদিত্য-বিভার কাহিনীর মধ্যে পারিবারিক জীবনের অধিক্ষেপ ঘটেছে।[২]

বসন্তরায়ের সঙ্গে পদকর্তা বসন্তরায়ের যতটুকু সাদৃশ্য থাক বা না থাক তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশি মিল রয়েছে শ্রীকণ্ঠ সিংহের। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে রবীন্দ্রনাথ এই বৃদ্ধের সাহচর্যে নিজেকে স্নেহধন্য মনে করতেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ উদার, আত্মভোলা, নিরহংকার। বিবাদ, কলহকে, তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

১. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড)
২. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)

'পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।···আবার, তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না।'

প্রতাপাদিত্যেব আদেশ নিয়ে পাঠানরা যখন বসন্তরায়ের সামনে এল তখন বসন্তরায়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারে পাঠান বশ্যতা স্বীকার করলে। শত্রুর মধ্যে যে কাঁটাটি ছিল বসন্তবায় আপন ঔদার্যগুণে সেটি তুলে নিলেন। উদযাদিত্যের যেমন বসন্তরায়কে ভিন্ন চলে না, বালক রবীন্দ্রনাথেরও তাই। শ্রীকণ্ঠ সিংহের—

'কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।'

এই সংগীতপ্রিয়তা বসন্তরায়ের ছিল। সমস্ত দিক থেকে বিপদ যখন ঘনিযে আসে, প্রতাপের নিষ্ঠুরতা যখন চবমে উপনীত হয় তখন বসন্তরায় সান্ত্বনা খুঁজে পান সুরের মধ্যে। বসন্তরায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির অন্ত নেই। চিরকাল রবীন্দ্রনাথ 'অন্তরের অন্তঃপুব' এই গানের মধ্যেই জীবনের সাধনাব সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। বসন্তরায়ও গানেব ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখেছিলেন বলে জগৎ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। 'বউঠাকুরানীর হাট' শেষ করবার পর বসন্তবায়ই পাঠকের চিত্তগহনে অনুরণন তোলে। কেদাবনাথ চৌধুবী কর্তৃক বউঠাকুরানীর হাটের নাট্যীকৃত নাম ছিল 'রাজা বসন্তরায়।' এটি যে সার্থকনামা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উদয়াদিত্য চরিত্র্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের প্রভাব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। উদয়াদিত্য কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। শক্তি ও সাহস দু-ই তাঁর ছিল। তথাপি উপন্যাসে উদয়াদিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল—সে যেন বসন্তবায়ের ছায়া। তার কারণও আছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সের লেখায় আধুনিক বাস্তবতাপ্রধান উপন্যাসের প্রৌঢ় পরিণতি আশা করাও যায় না। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করেন নি। বউঠাকুরানীব হাটে আত্মভাবনা চরিত্রগুলির স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। এমন-কি কোনো কোনো চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত ঘটে নি। তথাপি এক দিক দিয়ে উদয়াদিত্য পাঠককে আকর্ষণ করে। যৌবন-উচ্ছল রসে আপ্লুত হয়ে একদা উদয়াদিত্য রুক্মিণীর প্রেমাসক্ত হয়। এই ঘটনা তার বিবাহিত জীবনের মধ্যেও বিবাদের আস্তরণ বিছিয়েছে। সুরমার

সাক্ষাতে উদয়াদিত্যের চিত্ত পীড়িত হয়। উদয়াদিত্য সর্বাপেক্ষা পীড়িত হয়েছে বন্ধঘরে অবস্থান করে। কারাগারের জীবনকে সে বারবার ধিক্কার দিয়েছে। প্রতাপাদিত্যের রোষে সে যখন বন্দী তখন তার মনের যে অবস্থার বর্ণনা পাই 'জীবনস্মৃতি'তে 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথাও সে ভাবেই বলেছেন।

'জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব।······এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন, কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আব ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।'

বালক বযসে ববীন্দ্রনাথকেও ভৃত্যবাজক তন্ত্রে থাকতে হয়েছে। জীবনের বেড়ী তখন পর্যন্ত ভাঙে নি। সুতরাং বটগাছের ঝুরির গহন অবণ্যে, কুহকের মধ্যে স্বপ্নযুগেব একটা অসম্ভব রাজত্বের কল্পনা কবে কবিচিত্ত পরিতৃপ্তি পেত। এব পরে 'জীবনস্মৃতি'র বর্ণনা আসলে বউঠাকুবানীর হাটের উদয়াদিত্যের কথারই প্রতিধ্বনি।

'সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গবাদের ব্যবধান দিযা নানা ইশারায আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায ছিল না। সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।'

আসলে ববীন্দ্রচিত্তে যে উচ্ছ্বসিত হৃদযাবেগ এতকাল সঞ্চিত ছিল উদয়াদিত্যেব জবানিতে তাই মুক্তি পেলে। এ যেন বাস্তবে যে শাসন তিনি পেয়েছিলেন কল্পনার জগতে তাবই প্রতিশোধ তুললেন।

বিভা অনেকটা সৌদামিনী দেবীর ছায়ায় কল্পিত। বউঠাকুরানীর হাটের 'উপহার' কবিতাটিতে বড়দিদির প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় দিদির স্নেহসুধা রবীন্দ্রনাথের উপব কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বর্ষিত হত। প্রতাপের নিষ্ঠুরতায় উদয়াদিত্য যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত তখন বিভা ভ্রাতৃসেবার জন্য রামমোহনের আহ্বান উপেক্ষা করে স্বামীগৃহে যায় নি। পিতৃগৃহে থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে উদয়াদিত্যকে আনন্দ দিতে চেয়েছিল বিভা। কারণ—

'এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে পরাণে মম
ঝরে স্নেহধার।

বউঠাকুরানীর হাট রচনা করবার সময় কবিচিত্ত মাত্র বাইরে পদচারণা আরম্ভ করেছে। এই সময়ে পাপপুণ্যের বোধ ন্যায় নীতি সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ ধারণাই রবীন্দ্রনাথের ছিল। মানবমনেব জটিলতা, দুজ্ঞের্য় রহস্য-প্রবণতা জানবার সময় তখন পর্যন্ত কবি লাভ কবেন নি। স্রষ্টাব ঔচিত্যবোধ তখন পর্যন্ত সমাজশাসনেব বেডা ধবেই চলতে সুরু কবে। মানবজীবন যে উত্তপ্ত লৌহকটাহে টগবগ করে ফুটছে, মানবজীবন যে পরিবর্তমান সে বোধ তখন পর্যন্ত জাগে নি। এই কাবণে প্রতাপাদিত্য-চরিত্রেব মধ্যে কেবল একই ভাবের অনুবর্তন দেখতে পাই। প্রতাপাদিত্য বাস্তবেব প্রতিরূপ—প্রতিবিম্ব নয়। ববীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁর অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্যের কথাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উদয়াদিত্য, সবমা, বিভা, বসন্তবায়কে হাবিয়ে তাঁব মধ্যে যে চাঞ্চল্য জাগতে পারে, তাঁব মনও যে দোলাযিত হতে পাবে, সে কথা ঔপন্যাসিক বলেন নি। এইখানেই পুতুলেব ধর্ম অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন প্রতাপাদিত্য মোটা মোটা দড়িগাছি ছিঁড়তে পাবেন, কিন্তু সূক্ষ্মভাব বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এইটি কেবলমাত্র ব্যাখ্যাব পর্যায়েই থেকে গেছে—ঘাতপ্রতিঘাতেব মধ্য দিযে প্রকাশিত হয় নি। চবিত্রগুলির এই অসঙ্গতিই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে অনেকদিন। তাব জন্য তাঁকে লিখতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ।

রাজর্ষি

'বউঠাকুরানীর হাট' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পাত্রপাত্রী-গুলিতে বিশেষ কালেব চিহ্ন পর্যন্ত লক্ষ্য কবা যায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সাধারণত ঐতিহাসিক ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ কবে। ব্যক্তিচরিত্রগুলি প্রায়ই বৃহত্তর ঘটনার আবর্তে আবর্তিত হয়। ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও লেখক ঘটনাগুলির বিশেষ মূল্য দেন। স্থান কাল পাত্রের এই বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান। বউঠাকুরানীর

হাটে রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু 'রাজর্ষি' (১২৯৩) উপন্যাস সম্বন্ধে একথা জোর করে বলা সম্ভব নয়। এখানে তিনি বিক্রমাদিত্যের আদর্শের সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির দ্বন্দ্বকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করবার প্রয়াস পেলেন। এতে উপন্যাসের 'ঐতিহাসিকত্ব' কতখানি রক্ষিত হয়েছে এবং তার দ্বারা উপন্যাসের উৎকর্ষই বা কতটা সূচিত হয়েছে সে বিচার পরে করছি। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিতে কার্পণ্য করেন নি। স্টুয়ার্টের বাংলাব ইতিহাস, কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় অংশ উৎকলিত কবেছেন।

'বাজর্ষি'ব প্রেরণা স্বপ্নলব্ধ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তৃত কবে বলেছেন। কোনো-একটি কাহিনী স্বপ্নলব্ধ হলে তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে ওঠে। কবিগহনের কী বিশেষ ভাব এবং ভাবনা এই রচনার উৎস তা পাঠকের দৃষ্টির অগোচবে থাকে।

'বাজর্ষি'ব সমস্যা হিংসা এবং অহিংসার দ্বন্দ্ব। সমস্যাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রাচীন আচাথ এবং প্রথাবদ্ধ বীতিব বিরুদ্ধে নবীন চেতনা এবং স্বাধীন ধর্মচিন্তার দ্বন্দ্ব বলে ধবা যেতে পাবে। ত্রিপুবার বাজপবিবার শাক্ত। শাক্ততন্ত্রের হিংসাত্মক দিকটি এতকাল ধর্মের আববণে চলে এসেছে। ভক্ত জনসাধারণও বলির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করে নি। বলিব পশ্চাতে যে হিংস্রতা ক্রূরতা বিদ্যমান, বলি যে মানুষের আদিম মনোবৃত্তির স্মারক এতকাল জনসাধারণ ভক্তির আবেগে অন্ধ অচেতন ভাবে তার কথা মনে রাখে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বীভৎসতার মূলে আঘাত করতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ধর্মের পূজারী, তিনি শাস্ত্রশাসিত নিয়ম-নিগড়কে সর্বথা মেনে নেন নি। হিন্দুধর্ম যে তার সনাতন ঐতিহ্য, উদার সর্বজনীনতা বিসর্জন দিয়ে প্রথার পাঁকে বদ্ধ, একপ্রকার অচলায়তনের বেড়ার আড়ালে অনড়, রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে কণ্ঠযোজনা করেছেন রাজর্ষি উপন্যাসে। তিনি যে অহিংসার কথা বলেছেন সে অহিংসা আসলে তাঁর উপলব্ধিসঞ্জাত।

প্রশ্ন হচ্ছে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্লট কি কেবল স্বপ্নবৃত্তান্তের কাহিনী-চিত্রণ, না এর মধ্যে অন্য কোনো অভীপ্সা জাগরূক? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে সেই দ্বন্দ্বটিকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের কথা মনে হতে পারে। পূজারিণী কবিতাতে যে চিত্র পেয়েছি

সেখানেও মনুষ্যত্ব আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অহিংসার মহিমাকে উঁচুতে তুলে ধরেছে। তবে কবিতাতে স্বর তীব্র নয়, বিদ্রোহ তীক্ষ্ণ নয়, এবা ইতিহাসের ভাবরূপ—প্রতিবিম্ব মাত্র।

রাজর্ষিতে প্রথাবদ্ধ রীতির বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, কিছু পরিমাণে বা অসহিষ্ণুতাজড়িত। উপন্যাস রচনা করবার কৌশল তখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে অনায়ত্ত, ছোটোগল্পেও তিনি সার্থকতা পান নি। যে আবেগ কবিতার বিশিষ্ট পরিবেশের উপযোগী, কাহিনী-বর্ণনায় তা প্রায়শই তরলতায় পর্যবসিত হয়। রাজর্ষি উপন্যাসে ধর্মের নিষ্ঠুরতার দিকটির প্রতি আত্যন্তিক করবার প্রচেষ্টা। এজন্য প্রথম পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনার অপ্রতুলতা। আইডিয়ার বিস্তারই মুখ্য। আঙ্গিকের দিক থেকে এ ত্রুটি মান্য, কিন্তু কবিগহনে বিকাশধারা লক্ষ্যগোচর বলে এর অন্য মূল্য অনস্বীকার্য। রক্ষণশীলতা, আচারপরায়ণতা চিরকালই ববীন্দ্রনাথের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। বাজর্ষিতে তার সূত্রপাত। এবং সাহিত্যরচনার মধ্য দিয়ে এ আঘাত প্রথম বলে স্বভাবতই এখানে আতিশয্যের মাত্রা সমধিক।

রাজর্ষি উপন্যাসের দ্বন্দ্বেব দুই কোটি। এক কোটিতে রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য, অন্য কোটিতে রঘুপতি—এক কোটিতে অহিংসা, অন্য কোটিতে হিংসা। এই দুইয়ের আবর্তে প্রথম পর্বের তীব্রতা এবং জটিলতা।

রঘুপতির চরিত্রে চাণক্যের ছায়াপাত। চাণক্যের মতোই রঘুপতি ক্রূর, প্রতিহিংসাপবাযণ এবং মননশীল। রাজশক্তির কাছে তাঁব অবমাননা কেবল ব্যক্তির অবমাননা নয়। এ পবাজয় যেন একটি বিশ্বাসেব নিকট আবেকটি বিশ্বাসের। ইউবোপে যেমন রাজশক্তির সঙ্গে পোপেব কলহ সমগ্র রাজ্যের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করত, গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতিব দ্বন্দ্বও সেরকম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে বৃহত্তর আলোড়নেব সূত্রপাত কবে। সুতবাং উপন্যাসের মধ্যে সমস্যাটিকে কেবলমাত্র ব্যক্তির সমস্যা মনে না কবে এব অন্যতব রূপটির উপর গুরুত্ব আবোপ কবা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল।

বলি বন্ধ করা রাজার আদেশ। রঘুপতি কেবল বাজাব বিরুদ্ধে দ্রোহবুদ্ধি নিয়ে এ আদেশ অমান্য করতে অগ্রসর হয় নি। ঘটনাটিকে এ ভাবে দেখলে সমস্যাটির গুরুত্ব ফিকে হয়ে যায়। বরং রঘুপতি যে এ আদেশ তাঁব এবং জনসাধারণের এত কালের পোষিত ধারণার বিরুদ্ধে আঘাত, বাজার স্বেচ্ছাচারিতা যে ধর্মবোধের উপরও আপতিত, এটা যে বিপ্লবের সামিল, সেটাই

রঘুপতিকে উদ্‌বেজিত করেছে। রঘুপতির বিদ্রোহ কেবল বিদ্রোহের জন্যই নয়। ধর্মপ্রাণতা অন্যান্য বোধের মতো রঘুপতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারও থেকে পাওয়া বস্তু নয়—ধর্মবোধ তাঁর মর্মমূলে প্রোথিত। সুতরাং রঘুপতির গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কেবলমাত্র অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এইটি মনে করবার অবকাশ নেই। রঘুপতির দৃঢ়তা এবং কার্য-সাধনের জন্য কৌশল উদ্‌ভাবন গভীর আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কৌশলের মধ্যে মারপ্যাঁচ থাকতে পারে, কিন্তু সেই প্যাঁচ মানবের সনাতন স্বভাবধর্ম। আপনাকে প্রতিষ্ঠা করবার আকাঙ্ক্ষা, নিজের সম্মানকে বিচ্যুত হতে না দেওয়া, এ তো মানব-স্বভাবের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি রঘুপতিকে একেবারে ভিলেনরূপে চিত্রিত করেন নি। জয়সিংহের প্রতি তাঁর যে মমতা, স্নেহ অজস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, সেইখানেই রঘুপতির অনমনীয়তার পশ্চাতে দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যেন অদৃষ্টের মতো তাঁকে তাড়িত করেছে। তাঁর সকল সাফল্যকে বিষাদাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বুঝতে পারি রঘুপতির দম্ভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রণপিপাসা সকলের কাছে মূল্য পেলেও নিজের কাছে তিনি পরাজিত। নক্ষত্ররায়ের সহায়তায় রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে উদ্যত। নির্বোধ নক্ষত্ররায় রঘুপতির ঘুঁটি হিসেবে চালিত। কিন্তু রঘুপতির কাজে বাদ সাধলে তারই প্রিয়তম জয়সিংহ। রঘুপতির এই নৃশংস কাজে জয়সিংহকে জড়াতে রঘুপতি পারেন না। রঘুপতির দুর্বলতার বীজও এখানে। জয়সিংহের প্রশ্নের উত্তরে তাই রঘুপতি বলেন—

'তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয় তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না, কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।'

গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা অর্থ রঘুপতির কাছে পুণ্য অর্জন করা। সেই পুণ্য জয়সিংহ অর্জন করতে চাইলে রঘুপতির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তখন ভিতরের মানুষটি জাগ্রত হয়। সুপ্ত দুর্বলতা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু রঘুপতির অজ্ঞাতে জয়সিংহ আত্মবিসর্জন দিলে তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন তখন জ্বলে উঠে। তাঁর পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে পীড়িত করে তোলে। রঘুপতি আপন পতনের জন্য গোবিন্দমাণিক্যকে দায়ী করে। প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল আকার ধারণ করলে। এর পরে রঘুপতি অন্ধ আবেগে গোবিন্দমাণিক্যের সর্বনাশ করতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নির্বাসিত

হয়ে তিনি সুজার সৈন্যদলের সাহায্যে নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাতে উদ্যত হয়েছেন। রাজ্যলোভ রঘুপতির কাছে তুচ্ছ। গোবিন্দমাণিক্যের দম্ভ চূর্ণ হোক এইটিই তাঁর কামনা। ত্রিপুরা আক্রমণের পর পরাজিত গোবিন্দ-মাণিক্যকে তিনি বলেছিলেন—

'যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব—ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।'

রঘুপতির এই দাবি থেকে এইটি সুস্পষ্ট যে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের দম্ভকে সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু রঘুপতির জীবনে বোধ হয় এইখান থেকেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। যে আবেগের বশে তিনি একের পর এক কৌশলের দ্বারা অগ্রসর হচ্ছিলেন পরবর্তীকালে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় তাঁরও ছিল না। তুচ্ছতার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য, রাজ্যলোভকে তিনি তৃণাদপি সুনীচ মনে করেছেন। একটা শক্তি যেন আপন তেজ ক্ষয় করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম ভিক্ষা করলে। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এতকাল যাঁর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তারই কাছে মথা নত করলেন।

'আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।'

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'রাজর্ষি'। এই নামকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সকলের নিকট সুপরিচিত। যোগাযোগের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা বিচার করেছেন। যদিও সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। প্রায়শ্চিত্ত নামকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর মতবাদকে লঙ্ঘন করেছেন। রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিচার প্রযোজ্য।

রাজর্ষি উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিশ্লেষণও এই পদ্ধতিতে করা উচিত। রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষিতে উন্নীত হয়েছেন এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাজার একটি আদর্শ ছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন নাটকে আমরা রাজার অবতারণা দেখেছি। এই 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় চরিত্র। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই রাজা রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গোবিন্দমাণিক্য থেকে

তার সূত্রপাত বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রাজা চরিত্রের পট-ভূমিকা হিসেবে গোবিন্দমাণিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরও একটি কথা ভাববার আছে। রাজর্ষির নাট্যরূপ 'বিসর্জনে'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে রাজর্ষির ভাবার্থ একটু ভিন্ন ধরণের। বিসর্জনে প্রতিমা বিসর্জনই মুখ্য বস্তু নয়, অপর্ণার জয়সিংহের আত্মবলির মধ্য দিয়েই রঘুপতির জাগরণ ঘটেছিল। বিসর্জন নাটকে এজন্য গোবিন্দমাণিক্যের উপর কবিদৃষ্টি নিঃশেষিত হয় নি। কিন্তু রাজর্ষিতে গোবিন্দমাণিক্যই মুখ্য চরিত্র।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য যে রাজাদর্শ অনুসবণ কবে আপন জীবনকে ধন্য করে তুলতে চেয়েছিলেন তা রাজর্ষির প্রাবম্ভেই সূচিত হয়েছে।

'কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সে'ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সে'ই পৃথিবীর রাজা।'

গোবিন্দমাণিক্যের এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কববার অন্তবায় হয়ে দাঁড়ায় রঘুপতি নক্ষত্ররায়। আদর্শ তখনই বাস্তবসত্যে পরিণত হয় যখন তা বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেও টিকে থাকবার ক্ষমতা রাখে। গোবিন্দমাণিক্য এই আদর্শকে রক্ষা কববাব জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। তিনি যে উচ্চ ধারণাকে লক্ষ্যস্বরূপ রেখেছিলেন নিজেব জীবনে তাকে সত্যরূপে উপলব্ধি করতে চাইলেন। এজন্য তাঁকে কম কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি। রাজ্য ত্যাগ করে যাবার সময়ও তাঁর মধ্যে কিছুটা আসক্তি ছিল। ধ্রুবকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে গৃহজীবনের প্রতি আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজা-দর্শের সার্থকতা তিনি তখনই পেলেন যখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এলেন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধাবণেব মধ্যে। কেবলমাত্র নির্দেশ কিংবা আদেশের মধ্য দিয়ে নয়, আহ্বানের দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎকে আপন করতে চাইলেন। রঘুপতি, সুজা তাঁর শত্রুদল মাথা নত করলে। সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা রাজা যথার্থ রাজর্ষিতে রূপান্তরিত হলেন।

'বালকে' প্রকাশিত 'কাজের লোক কে'? 'শিখ গুরু', 'ঝান্সীর রানী'

ইত্যাদি প্রবন্ধে রাজার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ইতস্তত মন্তব্য আছে। সেখানেও অনুরূপ দৃষ্টি লক্ষ্যগোচর।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র আলোচনা-কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, শক্তির প্রচণ্ডলীলা কালে কালে শান্তি লাভ করে। সংহারিণী শক্তি শান্তমূর্তিতে পরিণত হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে যদি এইটি সত্য হয় তবে বলি বন্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে ধর্মের অগ্রগতির স্মারক।

এবারে 'রাজর্ষি'র ঐতিহাসিক অংশ নিয়ে আলোচনা করি। 'বউঠাকুরানীর হাটে' ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রী অতীতের পরিবেশে স্থাপিত হয় নি। যে-কোনো বাস্তবধর্মী উপন্যাসও রচনা করা যেতে পারত প্রতাপাদিত্য-বসন্তরায়-উদয়াদিত্য কাহিনী নিয়ে। অনুমান কবি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার জন্য যে ধরণের প্রতিভার প্রয়োজন রবীন্দ্রপ্রতিভা তার অনুকূল ছিল না। কেননা বস্তুবাহুল্যের প্রতি বিতৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। আর 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে তিনি সচেতন ভাবে কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে পরিস্ফুট করতে চানও নি।

তথাপি বউঠাকুরানীর হাটে ইতিহাস যেমন কতকগুলি পাত্রপাত্রীর নাম নির্বাচনের মধ্যেই নিঃশেষিত, 'রাজর্ষি'তে তেমন নয়। রাজমালা এবং স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকে যে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা তো উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেই প্রমাণিত। প্রথম সংস্করণে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অনুরূপ তিনিও রাজমালার কিছু অংশ পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছিলেন। লিথোচিত্রও বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রভাব বহন করছে। সুতরাং নিছক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আনা হয়েছে এমন অনুমান রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই রয়েছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সংস্করণে রাজর্ষি সম্বন্ধে কবির উক্তি স্মরণীয়। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি-পূজার বিরোধ। 'কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল'।

বস্তুত উপন্যাসটি শেষ হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই প্রমাণ রাজর্ষির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রটি ক্ষীণ, কিছু পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। নিছক গল্পখোর শিশুদের জন্য দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাটির একটি তাৎপর্য আছে। পূর্বেই বলেছি গোবিন্দ-মাণিক্যের ক্রমপরিণতির দিক থেকে এই ঐতিহাসিক অংশের প্রয়োজনীয়তা

স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় অংশে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কৃচ্ছ্র সাধনা, ত্যাগস্বীকাব, নক্ষত্ররায়েব নিকট পরাজয়বরণ একদিক থেকে তাঁর চবিত্রের মহত্ত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আবও একটি কথা। আওরঙ্গজেবের হস্তে সুজার ভাগ্যবিপর্যয় গভীব অর্থব্যঞ্জক। এই ঘটনাটি গোবিন্দমাণিক্য-কাহিনীব সঙ্গে শিথিলভাবে প্রযুক্ত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সুজাব সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাদৃশ্য দেখানোর জন্যই মোগল দরবাবেব ভ্রাতৃবিবোধকে উদ্‌ঘাটিত কবেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রান্তীয ত্রিপুবা রাজ্যেব সাদৃশ্য হচ্ছে এইখানে যে বাজনীতি স্বভাবতই বাঁকা পথ অবলম্বন কবে। গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্র বায় কর্তৃক বিতাড়িত, সুজাও আওবঙ্গজেব কর্তৃক বিতাডিত। দুজনেই সিংহাসনচ্যুত হযে এক গভীব সত্য আবিষ্কাব করলে। বিশাল ভাবত সাম্রাজ্য নিযে যে দলাদলি, হানাহানি, ভ্রাতবিবোধ তাব সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজ্যেবও মিল রযেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার অবতাবণা এই অর্থে সার্থক এবং ববীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে হলেও এই সত্যটি প্রকাশ কবেছেন বাজর্ষি উপন্যাসে। উপন্যাসেব গঠনে নিশ্চয়ই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু শিথিলবিন্যস্ত ঐতিহাসিক উপাদানেব মূল্যও অস্বীকাব করবাব উপায় নেই।

সকলেই 'মালিনী'ব ক্ষেমঙ্কব-সুপ্রিয়েব সঙ্গে বঘুপতি-জযসিংহের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। এই সঙ্গে জয়সিংহেব সঙ্গে মুক্তধাবাব অভিজিতের ক্ষীণ সাদৃশ্যেব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

শক্তিকানন

'শক্তিকানন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৯ শকাব্দে। এইটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থটিতে প্রথম রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। কিন্তু গোড়া থেকেই শ্রীশচন্দ্রের মৌলিক সুরটি লক্ষ্য করা যায়। সেইটি হল বাংলার পল্লীশ্রীর প্রতি লেখকের প্রীতিপক্ষপাত। লেখক বলেছেন, 'আমি দেড়শত বৎসরের আগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালির উপর নির্ভর করিয়াছি'।

উপন্যাসটির ঘটনা-সংস্থান পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে। এই সময়কার বাঙালির ইতিহাস আজ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে লেখা হয় নি। শ্রীশচন্দ্র কিছুটা কল্পনা কিছুটা সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্য যা মূলত সাহিত্যনির্ভর তাই মিশিয়ে 'শক্তি-কানন' রচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক মহাপুরুষ-জাতীয় চরিত্রের ধর্মতত্ত্ব আলোচনার মতো শক্তিকাননে জগন্নাথ এবং জগদীশের শাক্ত-বৈষ্ণব তত্ত্ব আলোচনা সন্নিবেশিত। লেখক সে-যুগের ধর্মবিবর্তনের যে রূপটি সহজলভ্য তাকেই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণব প্রভাবে শক্তিধর্ম তার ভয়ংকরত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। রামপ্রসাদের গানে কৃষ্ণ এবং কালী এক হয়ে গেছে। জগদীশের প্রকৃত শিক্ষাও তাই। তিনি অন্তরে অন্তরে শাক্ত বাইরে বৈষ্ণব। হরিদাসের শাক্তধর্মের প্রতি প্রবল ঘৃণা সে-যুগের সমাজমানসের স্বাক্ষর বহন করছে। মুসলমান গাড়োয়ানকে দীক্ষা দান, থানার দারোগার ভাবান্তর সবই চৈতন্যজীবনী-প্রভাবিত।

শক্তিকাননের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বইটিতে সেকালের বাংলার চিত্র পাই হৈম-মৃন্ময়ীর সংলাপে। পল্লীশ্রীর রূপবৈভব দেখি লেখকের বর্ণনায়। উদ্ধব রোমান্টিক চরিত্র, জগদীশও তাই। এই সময়ে বাংলার গ্রাম্যশ্রীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মমত্ববোধ মানসী কাব্য এবং অন্যান্য গদ্যগ্রন্থে দেখি, তাতে মনে হয়, লেখক রবীন্দ্রপথ অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। শ্রীশচন্দ্রের বৈষ্ণবপ্রীতি তাঁর পারিবারিক ধর্মের ছায়ায় প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি একখানি বৈষ্ণব চয়নিকা গ্রন্থ বার করেছিলেন।

ফুলজানি

'শক্তিকানন' পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। বাংলাব পল্লীপ্রকৃতিব মনোবম চিত্র, মানুষেব সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনছবি ববীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট কবেছিল। শক্তিকাননেব আকর্ষণ আবও এক কাবণে বাড়িয়েছিল। শক্তিকাননেব সমালোচনা প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন উপন্যাসেব মধ্যে প্রায়ই বাঙলাদেশকে পাই না। একান্ত অপরিচিত দৃশ্যাবলীব সূত্রপাতে উপন্যাসটি প্রায়ই অবাস্তবতাব প্রান্তে স্থাপিত হত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর উপন্যাসে বাংলাদেশকেই প্রধান করে তুললেন। কিন্তু সেকালেব রীতি অনুযায়ী বোমাঞ্চকব দৃশ্যেব অবতাবণা কবতে তিনিও ভুল কবেন নি। কতকটা জনপ্রিযতাব জন্য, কতকটা সেকালেব বীতিব জন্যে শ্রীশচন্দ্র শক্তিকাননে বোমাঞ্চকব দৃশ্য যোগ কবেছিলেন।

'ফুলজানি'তে বাংলাদেশেবই কথা। অবশ্য বোমাঞ্চকব দৃশ্যবর্জিত নয। সূক্ষ্মবিচাবে ফুলজানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। শ্রীশচন্দ্র খাঁটি বাঙালিজীবনকে দৃশ্যগোচব কববাব জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নির্বাচন কবেছেন। 'শক্তিকানন', 'ফুলজানি', 'বিশ্বনাথ' সব উপন্যাসগুলিব সময় হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী। নবাবী আমলেব পতনদশায় বাংলাব জনজীবনেব প্রতিচ্ছবি উপন্যাসগুলিতে প্রতিবিম্বিত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদাব এই যুগোচিত পবিবেশটি বক্ষা করবাব চেষ্টা করেছেন। কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক উপাদানের উপস্থাপনাব দ্বাবা সে-যুগের ভাবাকাশকে ধরবাব চেষ্টা দেখা যায় 'ফুলজানি' উপন্যাসে।

শ্রীশচন্দ্র সিবাজদ্দৌলাব যে চিত্র অঙ্কন কবেছেন তাতে আদর্শবাদের কোনো চিহ্ন নেই। ববীন্দ্রনাথ যেমন প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন, তেমনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদাবও সিবাজ সম্বন্ধে নির্মোহ। সিবাজেব বিচাবের দৃশ্য কিংবা অন্তঃপুবেব বর্ণনা অনেকটা বমেশচন্দ্রেব ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিব কথা স্মবণ কবিয়ে দেয়।

ফুলজানিব কাহিনীটিব সম্ভবত একটি লৌকিক ভিত্তি আছে। পবিশিষ্টে শ্রীশচন্দ্র মজুমদাব বলেছেন—

> 'কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা এই সম্পত্তির (ফুলকুমারী-পুরন্দব) হিন্দুমতে সংকাব কবিলেন এবং দাহস্থলে চিতাভস্মের এক সুরম্য উৎস নির্মাণ করাইযা দেন। গোলাব-বাসিত নির্মল সলিলরাশি নিশিদিন এই উৎসমুখে বিকীর্ণ হইত।'

ফুলকুমারীর কাহিনী অবলম্বনে ছন্দোবদ্ধ বচনা যে বটতলাব প্রকাশকদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রিকায় ফুলজানির সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি স্মরণীয়—

'The Burtola people have been selling for the last fifty years a wretched metrical composition of that name, and the story is that of the abduction of a beautiful Hindu girl for the zenana of a Mahammedan grandee. It is on the basis of that story that Babu Shrish Chandra has created a whole host of characters, high and low, Hindu and Mahammedan, master and servants, teacher and pupil, zemindar and tenant.'

ফুলজানিতে পাঠশালাব মনোরম বিববণটি শ্রীশচন্দ্র 'বালক' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় লিখেছিলেন।

ববীন্দ্রনাথ ফুলজানিব যে ত্রুটি আবিষ্কার কবেছেন তা সূক্ষ্মদর্শীর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিব পবিচয় দেয়। শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঐক্য বিশেষ নেই। ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে গল্পবসও বিশেষ জমে নি। কিন্তু উপন্যাসটির বিশিষ্টতা অন্য কাবণে। শ্রীশচন্দ্র কতগুলি খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির সুখদুঃখ, হাসিকান্না, বিবহমিলনকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। 'বালক' পত্রিকায় তিনি যে পাঠশালা কিংবা বাংলাব বসন্তোৎসবের চিত্র এঁকেছেন সেবকম কতগুলি খণ্ডচিত্র বর্ণনা করাই তাঁব উদ্দেশ্য ছিল। ফলে উপন্যাসেব ঘটনার ঐক্য ব্যাহত হয়েছে সত্য, কিন্তু কতগুলি চিত্রমালায় উপন্যাসটি অলঙ্কৃত হয়েছে এ কথাও মানতে হবে। এখানেই ফুলজানির সার্থকতা।

বিশ্বনাথ

'বিশ্বনাথ' উপন্যাসটি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নামপত্রে গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ***Biswanath or The Robinhood of Bengal (A Historical Novel)***। রবিনহুড গাথা ইংলণ্ডে জনসমাজেব মধ্যে এককালে সাড়া এনেছিল। এই তীরন্দাজ নায়কের নানা দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবিনহুডের সাদৃশ্যে 'বিশ্বনাথ'কে অঙ্কন করেছেন। বিশ্বনাথকে নিয়েও নানা ছড়া রচিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের প্রীতিপক্ষপাত ছিল বিশে ডাকাতের উপর। এই জনপ্রিয় নায়ককে কেন্দ্র করে শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার আগ্রহ জাগবে এতে আর বিচিত্র কি? রবিনহুড

বনে বাস করতেন। আব তাঁর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ছিল জনসাধারণের হিতের জন্য। রবিনহুডের ম্যারিয়ান (Marian) ছিল প্রণয়িনী। অনুরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে। বিশ্বনাথও বাস করত জঙ্গলে। বাল্যকালে প্রণয়ের ব্যর্থতাই তার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বনাথের চরিত্রে নানা সদ্‌গুণেব সন্ধানও পেয়েছেন।

হাণ্টারের লেখায় বিশ্বনাথ খুব উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত নয়। সেখানে সে **dakouits** দলভুক্ত। তাব কার্যাবলীব প্রশংসা কোথাও নেই। শ্রীশচন্দ্র সরকাবের রিপোর্টকেই অবলম্বন কবেছেন। কিন্তু তথ্যেব জন্য ঋণ স্বীকাব করলেও তিনি বিশ্বনাথকে আঁকলেন জনপদবাসীব আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রতীক করে। বিশ্বনাথেব ফাঁসির পরে গ্রামবাসীর মুখে মুখে এই ছড়াটি ফিরত—

'ওরে রফি দেখে যা, কি দশা যে হল
আশা নগরের মাঝে আশা ফুরাইল।'

এই স্বতোৎসারিত বেদনা শ্রীশচন্দ্রকে স্পর্শ কবেছিল। তাই তিনি সবকাবী কর্মচারী হওযা সত্ত্বেও ইংবেজ-নির্দিষ্ট পথে চলেন নি।

সবকারী কাজে শ্রীশবাবু নদীযায গিযেছিলেন। 'নদীয়া ভ্রমণ' নামে শ্রীশচন্দ্র 'বালক' পত্রিকায় দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। বিশে ডাকাত সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক স্থানটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি।

'আমাদের মধ্যে রবিন্‌হুডের নাম যাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে এবং সেই ইংরেজকুলতিলকের বীরত্ব কাহিনীতে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁরা শুনে একেবারে নিঃসন্দেহ আশ্চর্য হয়ে থাকেন যে এই বিশে ডাকাতের কার্যকলাপ দস্যুশ্রেষ্ঠ জন বুলেরই অনুরূপ। আব এই চৈতন্য, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি নদীয়া তাকেও অঙ্কে ধারণ করেছিলেন।· ·আমায নিরক্ষর ছোটলোকদের কাছ থেকে অনেক যত্নে খবর নিতে হয়েছে।'১

শ্রীশবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও ঘটনার ঐক্য নেই। কেবলমাত্র চরিত্রটিকে পবিস্ফুট করবাব জন্য লেখক তাঁর সংগৃহীত উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ছবিও এই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয় নি।

রাইবনীদুর্গ

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইবনীদুর্গ' নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বার হয়েছিল।

১. বালক, ফাল্গুন, 'নদীয়া ভ্রমণ' ২নং।

ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তম বর্ষের একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত (১৩১৩-১৩১৪) এই উপন্যাসটি বাব হয়। মাঝে মাঝে কয়েক মাস বাদ গিয়েছে। এই সময় বঙ্গদর্শন কাগজেই শ্রীশচন্দ্রের 'রাজতপস্বিনী' জীবনীটিও বার হচ্ছিল। প্রথম প্রথম 'রাইবনীদুর্গে'ব রচনায় লেখকের নাম ছাপা হয় নি। সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে বইটিব লেখক যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তা জানতে পাবি। 'শক্তিকানন' এবং 'ফুলজানি' উপন্যাসে ইতিহাস চিত্রডোবেব কাজ করেছে। 'বিশ্বনাথ' ঐতিহাসিক বনাম জীবনী পর্যায়েব গ্রন্থ। 'বাইবনীদুর্গ'ই শ্রীশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এই উপন্যাসটিতে মেদিনীপুব এবং উড়িষ্যার সীমান্তে বাংলাব ভূস্বামী পদাঙ্কনাবায়ণের কাহিনী শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন। আলিবর্দীব বাজত্বকালেব প্রথমার্ধে বর্গীব হাঙ্গামা, সবফবাজ খাঁব পতন, মুর্শিদকুলী খাঁর কার্যপ্রণালীর এবং উড়িষ্যাব বাজরাজড়ার কাহিনী শ্রীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করে বলেছেন। রবইবনীদুর্গের দুর্গাধিপ পদাঙ্কনাবায়ণকে কেন্দ্র কবে শিবাপ্রসন্ন মারাঠা পণ্ডিত ভাস্করেব সাহায্যে পুনবায হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলবাব স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেজন্যে কুমাব পদাঙ্কনাবায়ণকে শিবাপ্রসন্ন পুত্রবৎ লালন করেন। ওদিকে আলিবর্দীর চক্রান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে মীব হবিব মাবাঠাদেব ডেকে আনে। উড়িষ্যাবাজেব সেনাপতি কল্যাণ পাণ্ডা আবার হিন্দু শক্তিকে জাগিয়ে তোলবাব চেষ্টা কবে। মীব হবিবেব সৈন্যদেব সঙ্গে শিবাপ্রসন্নেব পত্নী সৌদামিনী দেবী যুদ্ধ কবেন।

এই সমস্ত যুদ্ধ এবং বাজবাজড়াব কাহিনীব সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র আবও কতগুলি পারিবাবিক কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন—পদাঙ্কনাবায়ণ এবং তাঁব মাতা কৃষ্ণপ্রিযাব বাৎসল্যলীলা, কৃষ্ণপ্রিয়াব পূর্বস্বামী বাধাচবণেব নিরুদ্দেশ-যাত্রা এবং অভয়ানন্দ নামে আত্মপ্রকাশ, শিবাপ্রসন্ন এবং তাঁব পত্নী সৌদামিনী দেবীর নিষ্ঠা, স্বজনবাৎসল্য ইত্যাদি।

বস্তুত কাহিনীটির আকর্ষণও এখানে। এই সমস্ত পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীশচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছেন। প্রসঙ্গত শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শটির রূপ বর্ণনা করেছেন।

বইটির সমাপ্তি আকস্মিক। যে বিস্তৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র তাঁর কাহিনী রচনা করছিলেন সে পটভূমিকাটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। পদাঙ্ক-নারায়ণের, ষষ্ঠীচরণের কোনো পরিণতি পাই না। উপন্যাস হিসাবে এই বইটি

সার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ ফুলজানি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এই বইটি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

মধ্যে মধ্যে বর্ণনার উৎকর্ষ লক্ষণীয়। রাইবনীদুর্গের প্রাচীন ঐশ্বর্য আর নেই, এখন কেবল স্মৃতিমাত্র। শ্রীশচন্দ্র বলেছেন—

'যেখানে সুখস্মৃতি নাই, সেখানে কৌমুদী প্রফুল্ল নিশীথিনী, মলয়হিল্লোল ও পুষ্পবীথিকা এবং কোকিল পাপিয়ার যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া বংশীবদনের চেষ্টা করিলেও কি 'বনমাঝে কি মনোমাঝে' মধুর সে বাঁশী বাজে না। রাইবনীদুর্গ তাহার প্রাচীন দুর্জয় প্রাকার ও পৌরাণিকী জয়পরাজয়ের কাহিনী লইয়া মাতাপুত্রের মনে কেবল আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ের ভাবই চিরদিন জাগরূক রাখিত।'

আর একটি বর্ণনা। সৌদামিনী স্বামীদর্শনে যাচ্ছেন, তিনি পদ্মাঙ্কনারায়ণকে শিবিকায় যেতে বললেন—

'তারপর কিন্তু কুমার কিছুতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। 'তোমার নাতি হয়ে যেতে রাজি আছি ঠাকুরানীদিদি, নাতবউ হয়ে নয়।' এই বলিয়া তিনি দাস-গৃহিণীর সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইলেন। আকাশে অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রকিরণ নীলিমার উপর একটা ক্ষীণ শুভ্র রজতাবরণ বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহাতে ফেনপুঞ্জময় বিশাল সুবর্ণরেখার বুকে ইন্দ্রধনুর সুষমাবৎ অনির্বচনীয় রমণীয়তা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর বন্যাগর্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিবিড় বনানীর মৃগয়াকালীন প্রলয়ঙ্কর গাম্ভীর্য সূচিত করিতেছিল। পদ্মাঙ্কনারায়ণ সশস্ত্র যোদ্ধ‍ৃবেশে এই দৃশ্যের ভিতর সর্বাগ্রে উৎসাহে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে সকল শব্দ ডুবাইয়া কে গান গাহিল—

ইস্ নগরীমে বোল্‌তাহে কোন্ বেপরোয়ানি
বাবা। বেপরোয়ানি।
কঙ্কর চুন্ চুন্ মহল বনাযা, লোক কহে ঘর মেরা।
ওলা ঘর তেরা না ঘর মেরা চিড়িয়া নিয়া থামেড়া।'১ ইত্যাদি

১. বঙ্গদর্শন, ৭ম বর্ষ

বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিক

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

জয়াবতীর উপাখ্যান

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'জয়াবতীর উপাখ্যান' (১৮৬৩) কর্ণ্টাবের রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি অবলম্বনে লিখিত। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন—

'জয়াবতীর উপাখ্যান প্রচারিত হইল। ইহা ইংরেজি রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরী অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনুবাদিত। ইহা তাহার অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানে স্থানে অনেক ভাব পরিত্যক্ত ও নূতন ভাব সমাবেশিত হইয়াছে।'

ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ণ্টাবের বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। টডের রাজস্থানের মতো কর্ণ্টাবের বইটিও যে জনপ্রিয় ছিল তা এই সমস্ত বই থেকে অনুমিত হয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপখ্যান' যে 'জয়াবতী উপাখ্যানে'র প্রেরণাস্থল তার প্রমাণ পাই বইটির কাহিনীবিন্যাসে। এই বইটিতেও স্বাধীনতা-হীনতায় বাঙালির বেদনাকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। বইটির অপর মূল্য আছে। বনোয়ারীলাল রায়ের জয়াবতী কাব্য (১৮৬৫) এবং যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়াবতী নাটক (১৮৮৪) রচনাতে সম্ভবত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর প্রেরণা ছিল।

কাহিনীটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছুই নেই। উপাখ্যানটি সংস্কৃত আখ্যায়িকা ধরণে লিখিত। কাদম্বরীর প্রভাব সর্বত্র। উপমাপ্রয়োগে, সংলাপ রচনায় কাদম্বরীর আভাস মিলে। তবে স্বাধীনতাবোধ জাগাতে হয়তো বইটি কিছু প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে। আলাউদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে রত্নসেন বলেছিলেন—

'স্বাধীনতা লাভে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? অধিক কি কহিব, মনুষ্যের তো কথাই নাই, পশু পক্ষীগণও অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না।'

বইটি মিলনান্তক। বনোয়ারীলালের কাব্য বিষাদান্ত। জয়াবতী চরিত্রে কোমল এবং কঠোর ভাবের মিশ্রণ দেখি। তবে নিতান্ত বর্ণনামূলক বলে চরিত্রটির বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। রাজপুতরমণী হলেও বাঙালি মহিলার আদর্শ জয়াবতীতে দুর্লক্ষ্য নয়।

'কমলাদেবী' (১৮৮৫) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অপর উপন্যাস।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গাধিপ পরাজয় (২য় খণ্ড)

প্রতাপচন্দ্র ঘোষেব 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১ম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪) সেকালে সুধীসমাজেব নিকট সমাদর পেয়েছিল। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডেব আলোচনা 'বউঠাকুরানীব হাটে'র সঙ্গে করেছি। এখানে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ডেব আলোচনা করছি।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের এমন কতগুলি দিক উদ্‌ঘাটিত কবেছেন যার পূর্বাভাষ প্রথম খণ্ডে ছিল না। প্রথম খণ্ড বাব হবার পর *Calcutta Review*-এ গ্রন্থটিব আলোচনা করা হয়। এবং প্রতাপচন্দ্রেব বন্ধুবান্ধবও কিছু কিছু মন্তব্য কবেন। দ্বিতীয় খণ্ডেব ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র বলেছেন—

'এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতবিদ্য কায়স্থ কুলতিলক মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্বন্ধে কষ্ট হইযা গ্রন্থকারকে দুষিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না, গ্রন্থকার অত্যাচার করিযা প্রতাপাদিত্যকে কদর্যবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবাব কলিকাতা রিভিউ-লেখক বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহস্রের মধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমিদার ছিলেন, তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করাইযা উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইযাছে।'

এই সমালোচনা প্রতাপচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। সেই কারণে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত কবেছিলেন, লিথোচিত্রগুলি দিয়েছিলেন। লেখকেব দেশীয় মনোভাবের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত দেখা যায়। দু' একটা স্থান উদ্ধৃত কবলেই আমাদেব বক্তব্য স্পষ্ট হবে। লেখক প্রতাপাদিত্যেব পতনের কাবণ-স্বরূপ তদীয় মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণেব মাবফৎ বলেছেন—

'প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোণিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচিবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও আশ্রিত কর্বালহ ফিরিঙ্গী আশ্বস্ত হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য অস্ত হইল। যখন মহারাজের বাল্যচাপল্য বশতঃ গুরুজনে বিপরীতদৃষ্টি করিলেন, তখনই তাঁহার সর্বনাশের ইষ্টকারোপণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খুল্লতাতের রাজ্যে ঈর্ষাদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলাম যে মহারাজ অধঃপতনে সংকল্প করিলেন।'

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের এই সমস্ত পাপকার্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে আছে। কিন্তু এই বিবরণ দিয়েও প্রতাপচন্দ্র প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে লিখলেন, 'আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য— বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন'। বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্যকে এর পর গ্রন্থকার অনেক মহৎ কীর্তিব স্রষ্টারূপে দেখেছেন। ববীন্দ্রনাথের বউঠাকুবানীব হাট নিশ্চয়ই এক শ্রেণীব পাঠকেব বিবাগ উৎপন্ন করেছিল। প্রতাপচন্দ্র সযত্নে সে পথ পবিহার কবলেন। রবীন্দ্রনাথেব বউঠাকুবানীর হাটে বামচন্দ্র কাপুরুষ। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র তাঁকে এত হীনভাবে চিত্রিত করেন নি। প্রথম খণ্ডেব উপসংহাবেই প্রতাপবাবু গ্রন্থের যবনিকা টেনেছিলেন। সেই সমাপ্তি আসলে ছিল আকস্মিক। প্রথম খণ্ড পড়ে পাঠকদের অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল। কলকাতা বিভিয়্যুব সমালোচনাও তাব প্রমাণ। সুতবাং প্রথম খণ্ডেব উপস্থাপিত ঘটনাব গ্রন্থি খোলবার জন্য প্রয়োজন হল দ্বিতীয় খণ্ডেব। বিমলা বসন্তবায়েব স্ত্রী। প্রতাপাদিত্য অবৈধ প্রণয়ে তাব সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিমলাব পবিণাম হল ভয়াবহ। বামচন্দ্রেব স্ত্রী সুমতিব পতিনিষ্ঠা আদর্শবাদের দ্বাবা অঙ্কিত হল। জানা গেল ইন্দুমতী সূর্যকুমাবেব ভগ্নী। ইন্দুমতীর সঙ্গে কচু বাযেব বিবাহ হল। সূর্যকুমাব সবমাকে বিবাহ করতে পারলেন না। সবমা পিতৃশোকে মৃত্যুববণ করলে। প্রতাপাদিত্যেব শেষজীবনও বিষাদাচ্ছন্ন। গ্রন্থে আবও কতগুলি অবাস্তব বিষয় স্থান পেয়েছে। সূর্যকুমারেব রাজ্য বিববণ, জয়ন্তিযাব অবস্থা, যক্ষবাজ্যের শাসন-প্রণালী, পর্তুগীজদেব কাহিনী ঈষৎ বিস্তৃতি লাভ কবেছে। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন রায়গড়েব অধিবাসী। এই বায়গড়েব শোচনীয় পবিণাম লেখককে উদ্বেজিত কবেছিল। বইটি লেখবাব প্রেবণা এসেছে এই স্বদেশহিতৈষণা থেকে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যে সর্বদা পরিত্যাজ্য সে কথাও সূর্যকুমারের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন—

'অদ্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মূলিত হইল। মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক—বঙ্গের জন্য তাঁহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদিগের স্বেষ্ট চিন্তাত্যাগ করিয়া যদ্যপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়ী হই বা না হই মনের এরূপ মালিন্য জন্মিত না। আমাদিগের স্বার্থপরতাই আমাদিগের সর্বনাশ করিল।'

সুতরাং বুঝতে পারছি নিছক তথ্য পবিবেশন ছাড়াও লেখকের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গ্রন্থের শেষ ছত্রটি উদ্ধারযোগ্য।

'শরগুনার কুব্জীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগন্নাথ-কুব্জীর নামে রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈঋতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গত-মধ্যে গণিত।'

এই 'ঘোষে'দের বংশজ ছিলেন প্রতাপচন্দ্র।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অন্যতম ত্রুটি এর ভাষাব্যবহারে। ভাষায় প্রসাদগুণের নিতান্ত অভাব। সমাসবহুল এবং অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রতি লেখকের পক্ষপাত ছিল। পরের সংস্করণগুলিতে তিনি সে সমস্ত শব্দের পাদটীকায় অর্থ দিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত বাক্‌রীতিও অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ করেছেন।

প্রতাপচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই প্রথম বঙ্গাধিপ পরাজয়ে (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৯) দেখালেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গেলে ঔপন্যাসিকের তথ্যনিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তথ্যের অভাব লক্ষিত হয়। এদিক থেকে প্রতাপচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পথিকৃতের কাজ করেছেন। এই উপন্যাস রচনা করবার সময়ে তিনি তথ্যের জন্যে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন।

ইতিপূর্বে রামরাম বসুর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছি। প্রতাপচন্দ্রের কৃতিত্ব এদিক থেকে আরও বেশি। রামরাম বসুর বইতে প্রতাপাদিত্যের স্বদেশ-হিতৈষণার দিকটি তেমন স্পষ্ট নয়। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডে প্রতাপচন্দ্রেরও কণ্ঠ তেমন উঁচু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যে পথের ইঙ্গিত দিলেন সেই সরণীই অন্যান্য ঔপন্যাসিক-নাট্যকাররা অবলম্বন করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের এই মন্তব্যটি লক্ষণীয়। একস্থানে প্রতাপাদিত্যকে বলতে শুনি—'আগামীস্তন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতার-রূপে জানিবে।'

রামগতি ন্যায়রত্ন

রামগতি ন্যায়রত্নের 'ইলছোবা' একখানি স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রামগতি আরও একখানি আখ্যায়িকা লিখেছিলেন 'রোমাবতী' নামে। 'ইলছোবা মণ্ডলাই' অথবা 'ইলছোবার ইতিহাস' বইখানির পুরো নাম হতে পারে। কিংবা এ দুখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও হতে পারে। সুধীরকুমার মিত্র স্বতন্ত্র দুটি বই মনে করেন। যতদূর মনে হয়, শেষের বইটি প্রথম বইটির বিস্তৃততর রূপ।

'ইলছোবা সরল গদ্যে লিখিত। কাহিনী পরিকল্পনায় এ বইটিও সংস্কৃত কথা

কিংবা আখ্যায়িকার অনুরূপ। দণ্ডীর সূত্র অনুযায়ী কথা কিংবা আখ্যায়িকা কতগুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এবং 'কথা'তে কন্যাহরণ কাহিনীর অন্যতম বিষয়বস্তু। ইলছোবাও 'উচ্ছ্বাসে' বিভক্ত। কন্যাহরণ তো আছেই। তা ছাড়া কাহিনীটি কোন্ ছাঁদে লেখা তা লেখক কথারম্ভে পাদটীকায় নারদ-বিষ্ণুর গল্প উদ্ধার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থে শকুন্তলা থেকে শ্লোক উদ্ধারও সংস্কৃত সাহিত্যেব প্রভাবের আর এক প্রমাণ।

ইলছোবা লেখকের নিজেব জন্মভূমি। জন্মভূমির কথা সাহিত্যে চিবস্মরণীয় করবার আকাঙ্ক্ষা রামগতির পক্ষে স্বাভাবিক। এ বস্তু বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। প্রাচীন কবিবা আত্মপবিচয় প্রসঙ্গে স্বগ্রামেব কীর্তিকথা বলতে ভোলেন নি। কৃত্তিবাস বলেছেন —

গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী॥

বামগতির 'গ্রামবত্ন' ইলছোবাব পুরাকীর্তি তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ইলছোবাব কাহিনীটি এই।

ভগবতীতলায় ইলছোবা গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম কবছেন। এমন সময়ে দেবী ভগবতী দেখা দিলেন। এই ভগবতীতলা এবং তাব পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের বর্তমান জীর্ণ অবস্থা পূর্বে ছিল না। বাজা গণেশেব সময়ে এর ঐশ্বর্য প্রাচুর্য ছিল। দেবী সেই ইতিহাস ব্রাহ্মণকে বলে গেলেন।

লক্ষ্মীকান্ত যশোরে থাকে। পুত্র কন্যা নিয়ে সে সৎভাবে জীবন যাপন কবত। তখন গৌডেব সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। বাজ্যে অত্যাচাব ইত্যাদি দেখা দিল। লক্ষ্মীকান্ত কবীম খাঁব বিষনজরে পড়ল। সে এক সন্ন্যাসীর কাছে রূপা থেকে সোনা কবার অলৌকিক কৌশল জেনে নিলে। বামধন লক্ষ্মীকান্তের প্রতিবেশী। তাব কন্যা দামিনী, পত্নী মঙ্গলা। দামিনীকে করীম খাঁ অপহরণ করলে। দামিনী করীম খাঁকে হত্যা কবে নিজে আত্মহত্যা করলে। লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলবিলা এবং পুত্র হবিদাস। হরিদাস করীম খাঁর পাইক-পেয়াদার সঙ্গে লড়াই করে আহত হল। ব্যাপার দেখে লক্ষ্মীকান্ত কন্যা ইলবিলা এবং পত্নী গোবিন্দমণিকে নিয়ে ঝিঁটকীপোতা চলে এল। রামধনও সঙ্গ ছাড়লে না। এখানে তারা পরিচয় পেল নীলমণি পাল এবং তার পত্নী বাঁকা ও কন্যা মাধবীর। ইলবিলা, নীলমণির কন্যা মালতী ও মাধবী, শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো সুখে দিন কাটাতে লাগল। অতুল সোনা সপ্তগ্রাম

এবং পাণ্ডুয়ায় বেশ বাজার পেল। সন্ন্যাসী এসে একদিন লক্ষ্মীকান্তকে গৌড়রাজসমীপে যেতে বললেন। লক্ষ্মীকান্ত গৌড়রাজকে তার সৌভাগ্যের কথা জানালে। রাজা গণেশ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রাড়্‌বিবাকের পদ দিলে। উজীর রহিম খাঁর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল। লক্ষ্মীকান্তের নামে লক্ষ্মীকান্তপুর, হরিদাসের নামে দাসপুর গ্রাম হল। লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলবিলা রাজা গণেশের পুত্র যদুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। যুবরাজ অসীম সাহস প্রদর্শন করে ব্যাঘ্রযুদ্ধে জয়ী হল। আহত হয়ে লক্ষ্মীকান্তের গৃহে তিনি এলেন। ইলবিলা সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাকে আরোগ্য করলে। উভয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। ওদিকে লক্ষ্মীকান্তের পুত্র হরিদাস উজীর-কন্যা সোমাবিবির প্রেমে পড়ল। এর পর লক্ষ্মীকান্ত কন্যা নিয়ে স্বগ্রামে এল। ইলবিলার বিবাহ স্থির হল। দেবপল্লীর রাজা যখন বিবাহ-বাসরে এল, তখন যুবরাজ ছদ্মবেশে এসে ইলবিলাকে হরণ করে নিলে এবং তাদের বিবাহ হল। মালতী ও মাধবীকে দেবপল্লীর রাজা দেবপাল বিবাহ-করলেন। ইলার বিবাহসভা যেখানে স্থাপিত হয়েছিল তার নাম হল ইলাসভা বা ইলছোবা।

রামগতি নিজ গ্রামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। দৌলতাবাদ, ইন্দ্রপুরী, জাহাঙ্গীরনগর ইত্যাদি নামের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলির মূলে বাস্তব ঘটনা কতটা আছে তা বলা দুরূহ, কিন্তু স্মৃতিবাহিত হয়ে এই সমস্ত ঘটনা লোকের মনে দানা বেঁধেছে। সুতরাং এগুলি নিছক বাস্তব অপেক্ষা সত্য। রামগতির কৃতিত্ব এখানে যে সেই সমস্ত অল্পপ্রচলিত ইঙ্গিতগুলি নিয়ে একটি কাহিনী রচনা করে সমস্ত ঘটনাগুলির ঐক্যসাধন করেছেন। এই ঐক্যবিধায়ক শক্তির চমৎকারিত্বই কাহিনীটির প্রাণ।

ভগবতীতলা লক্ষ্মীকান্তের গৃহদেবীর নাম অনুসারে। যেখানে দেবীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে তার পাশের পুকুরটির নাম দেউলগড়ে। দেবকুল থেকে দেউল। চম্পকলতা রস দিয়েই সোনা প্রস্তুত করা হত। চম্পকলতা যেখানে পাওয়া যায় তার নাম চাঁপ্‌তা। দেবপল্লী নাম কালে দেপাড়া হয়েছে। ইলছোবা, দাসপুর, লক্ষ্মীকান্তপুরের কথা আগে বলেছি। দেবপাল মালতী মাধবীকে বিবাহ করলেন। মালতী-মাধবী অন্ত্যজ শ্রেণীর। রাজা এদের পুকুরের ধারে বাড়ি করে দিলেন। দুই সতীনে মিলে মিশে আছে। এজন্যই স্থানটির নাম হল দোসতীনা। ইলাসভার জাঁকজমক ঐশ্বর্য লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। একে আর গ্রাম বলে চেনা যায় না। হঠাৎ

মনে হয় এ বুঝি নগর। সুতরাং "ইলছোবার কিয়দংশ 'হঠ নগর' নামেই খ্যাত হইয়া গিয়াছে"।

ঐতিহাসিক তথ্যগুলির প্রামাণিকতা একেবারেই নেই। গণেশ বিঠুরের জমিদাব নন। লেখক বলেছেন সন্ন্যাসী কর্তৃক গণেশ রাজা হন। এইটিও কল্পনা। যদুর অপব নাম ফিবিস্তার তারিখ-ই-আকবরীতে জিতমল। রামগতি বলেছেন চেৎমল। পাণ্ডুয়া অবশ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। যদুর মুসলমানধর্ম গ্রহণের কোনো কাবণই লেখক দেন নি।

ইলবিলাব প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেবা, শুশ্রূষা প্রেমিকেব প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা সবই বোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। যদুব ব্যাঘ্রযুদ্ধ ইংরেজি উপন্যাসের ছাঁদে পরিকল্পিত। সন্ন্যাসীব কার্যকলাপ এ-জাতীয় উপন্যাসে বিশেষ বেমানান হয নি। নিদ্রিত ব্রাহ্মণ লেখক স্বয়ং।

জঙ্গলা এবং বাঁকার কার্যকলাপ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আচার-আচরণকে স্মবণ কবিযে দেয়। এ দুটি চবিত্র বাস্তবসম্মত। লালবিবি কূটনীতিব প্রতীক। দামিনীব সাহসিকতা ও মৃত্যুববণ বোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।

ইলছোবাব এই কটি অংশ। প্রথম, কাহিনীব ভূমিসংস্থান, দ্বিতীয, কথাবস্তু, পবে আটটি উচ্ছ্বাস।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষেব 'চিত্তবিনোদিনী' হল 'সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস'। বইটি বার হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে (দ্বিতীয় সংস্করণ-১৮৮৪)। এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেনেব 'পলাশিব যুদ্ধ' কাব্যটিও প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালিব দেশচর্চাব (দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য পরিষৎ প্রবন্ধ) নিদর্শন হিসেবে এই সমস্ত বইয়েব মূল্য অনস্বীকার্য। 'চিত্তবিনোদিনী' গ্রন্থটি দু ভাগে বিভক্ত। একটি ইংবেজ পরিবার এবং একটি বাঙালি পরিবারের যোগসূত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহেব টানাপোড়েনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই দুই পবিবারের কাহিনী গোবিন্দচন্দ্র বর্ণনা করেছেন।

বাংলার বাবাসত অঞ্চলের প্রতাপচন্দ্র বসুব পুত্র চারুচন্দ্র এবং তারই ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র বিজয়েব সঙ্গে মিঃ রেমণ্ডেব দুই কন্যা এমি ও হেলেনা পরস্পব পরস্পবের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা লেখক বিস্তৃতভাবে বলেছেন। সিপাহী বিদ্রোহেব সুযোগ নিয়ে বিজয় চারুচন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক

সিপাহীদলভুক্ত বলে প্রতিপন্ন করে। চারুচন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। এর পর চারুচন্দ্র নানা কৌশলে মিঃ রেমণ্ডের পরিবারকে সিপাহীদের কবল থেকে মুক্ত করে। বিজযেব অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায়। এমির সঙ্গে চারুচন্দ্রের এবং হেলেনার সঙ্গে বিজয়েব বিবাহ হয়।

সিপাহীবিদ্রোহে বিশেষত নানা সাহেবের অত্যাচারকাহিনীর এরকম বর্ণনা অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে নেই। সিপাহীদেব নিষ্ঠুরতাব দিকগুলি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবেছেন। বিদ্রোহীদেব প্রতি লেখকেব বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। এর প্রমাণ পাই চারুচন্দ্রেব উক্তিতে—

'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচাব, দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিবাপদ ভাব বিদ্যালোকে, ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা, কর্তব্য, জ্ঞান, জীবস্তভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাব সহিত স্মরণ না করিযা থাকিতে পারে, এরূপ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তোলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কিনা সন্দেহ। হিন্দুবাজার সময স্বাধীন থাকিয়াও ভারতবর্ষ একপ সুখে ছিল না। আর কোন্ রাজো প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পাবে?'

এই উক্তিতে উচ্ছ্বাস থাকলেও তখনকাব শিক্ষিত বাঙালিব ইংবেজ সম্বন্ধে এই ধারণাই বলবৎ ছিল। 'পলাশিব যুদ্ধে' ব্রিটানিয়া দেবীব বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মবণ কবি। চাকচন্দ্র আরও বলেছেন -

'মাতঃ ভারতভূমি। আর তোমাব যন্ত্রণা দেখিতে পাবি না। তোমার কুসন্তানেরা বিদেশীয়ের প্রতি কি না অত্যাচার করিতেছে—সেই বিদেশীযেরা আবার প্রতিহিংসায কি না করিবে।'

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী

কালীকৃষ্ণ লাহিডীব 'রশিনারা' ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এটিকে ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান বলেছেন। বইটি দ্বারকানাথ লাহিড়ীকে উপহাব দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকেব বহু পর্যটনক্ষম শ্রমের ফল। 'রশিনারা'ব বিষয়বস্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয বিনিময়ে'ব অনুরূপ। রশিনারাতে বঙ্কিমের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রভাব যেমন আছে, লেখকের মৌলিকতাও দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাস মুখ্য নয়, রশিনারাতে ইতিহাসের স্থান অপ্রধান নয়। রশিনারাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় স্বপ্নবৃত্তান্তে এবং পাঠকসম্বোধনে। রশিনারা এবং শিবজীর প্রেমোপাখ্যান ভূদেবের উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত। 'রশিনারা'তে এই উপাখ্যান বিস্তৃত। দূতী গোলাবীর মধ্যস্থতায় এই প্রেমের বিকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রেমচিত্র বর্ণনার চিরন্তন ধারাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিবজীর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতা ভূদেবের অপেক্ষা বেশি। শিবজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উদার মনোভাব এবং বীরত্ব লেখক কয়েকটি দৃশ্যে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

বইটির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উৎস কর্ণ্টাবের 'দি মার্হাটা চিফ'। রশিনারায় রোমান্সের আতিশয্য বিশেষ নেই। তবে প্রেমবর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের মতো। শিবজীর পলায়নের দৃশ্যটি এখানে সংক্ষিপ্ত। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর গ্রন্থে রশিনারার জীবন অনেকটা বাংলাদেশের নারীসমাজের মতো। ঘটনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিস্ফুটনে লেখকের আগ্রহ সমধিক হওয়ায় রশিনারার অন্তর স্বাদবৈচিত্র্য উপেক্ষণীয় নয়।

হারাণচন্দ্র রাহা

হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। হারাণচন্দ্র কাছাড় অঞ্চলের অধিবাসী, লোকমুখে কাছাড়ের গালগল্প শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। পরে যখন উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা জাগল, তখন তিনি ইতিবৃত্তের উপাদান সমূহকে ঐক্যের বন্ধনে নিয়ে এলেন। লোকপ্রচলিত কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

'কোন ইতিহাসে রণচণ্ডী সম্বন্ধে কিছু পাঠ করি নাই। রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে সকল কথা কাছাড় দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল। রাজকৃষ্ণ রায় নামে জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোক কাছাড়ের বিধবা রানীদিগের উকিল ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কাছে বসিয়া আমি রণচণ্ডী সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিতাম। তদ্‌ভিন্ন কাছাড়ের এক রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের এক নাপিত ছিল। ক্ষৌরকর্ম শেষ হইলে তাহাকে আমি অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিতাম ও তাহার মুখে রণচণ্ডী সম্বন্ধে বিস্তর কথা শুনিতাম।'

এর পর লেখক কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সে

প্রাচীন বাজবংশ এখন লুপ্ত (১২৯৪)। হাবাণচন্দ্রের বইটিব জনপ্রিয়তা ছিল। মাত্র দশ বছবেব মধ্যে তিনটি সংস্কবণই তাব প্রমাণ।

স্থানীয় ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিকেব কাছে বিশেষ আবেদন নিয়ে আসে। আমাদেব দেশে স্থানীয় গালগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলন নেই। এ-অভাব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক পূবণ কবেছেন কল্পনার অনুবঞ্জনেব দ্বারা। হাবাণচন্দ্র স্থানীয় ইতিবৃত্তেব সঙ্গে প্রান্তীয বাজাদেব মিলন-সংঘর্ষেব কাহিনী মিলিয়ে দিয়েছেন। তবে ঘটনাগুলিব ঐতিহাসিকতা যে একেবাবে ছিল না সে কথা বলা যায় না।

মিব জুমলা শ্রীহট্ট এবং কাছাড অভিযান কবেন। মির জুমলাব সৈনাধ্যক্ষ শিযাব শা এ অভিযানেব নাযক ছিলেন। শিযাব শা কাছাডেব বাজা উপেন্দ্রনারাযণকে বধ কবে কাছাডেব শাসনভাব গ্রহণ কবেন। উপেন্দ্র-নারাযণেব পত্নী মন্দাকিনী এবং পুত্র চন্দ্রনাবাযণ (শত্রুদমন) শিযাব শা-ব প্রাণবধ কবে বাজ্য পুনরুদ্ধাবেব সংকল্প গ্রহণ কবলেন। মন্ত্রী বামজীবন বায়ও এঁদেব সঙ্গে যোগ দিলেন।

কাছাডেব সীমান্তে কুকিদেব বাস। বামজীবন এবং শত্রুদমন হৃতসর্বস্ব হযে কুকি অঞ্চলে চলে আসেন। কুকিদেব সর্দাব কুলপিলালেব পালিতা কন্যা বণু তাদেব নিযে এল। কুলপিলাল এদেব যথাযোগ্য সমাদব কবে আশ্রয় দিলে। বামজীবন এবং শত্রুদমনেব চেষ্টা ছিল সৈন্যবল সংগ্রহ কবে কাছাড আক্রমণ কবা। কুকিবা সবলপ্রাণ। পার্শ্ববর্তী মণিপুব অঞ্চলে কুকিদেব সম্বন্ধে ভালো ধাবণা ছিল না। মণিপুববাজেব আশ্রিত কুকিজাতি শোষিত। বিজেতা-বিজিত সম্বন্ধ তিক্ততাব সৃষ্টি কবলে। মণিপুববাজ বীবকীর্তি কুকিদেব শৌর্যবীর্যেব প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কবতেন না। বামজীবন কুকিদেব বোঝালেন। তাঁব ইচ্ছা কুকি এবং মণিপুব সৈন্য নিয়ে কাছাড আক্রমণ কবেন। মণিপুব অভিমুখে সকলে রওনা হল। বণু শত্রুদমনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। পথে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে ভেবে সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। মণিপুববাজেব আশ্রিত ভরতসিংহ বামজীবন এবং শত্রুদমনকে বন্দী কবলে। বণু শত্রুদমনকে উদ্ধার করলে। এব পর নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শত্রুদমন মণিপুব বাজ্যে উপস্থিত হল। মণিপুববাজ এঁদেব অভ্যর্থনা কবলেন। মণিপুররাজ কাছাড আক্রমণ করতে বাজী হলেন একটি সর্তে। সর্তটি হল রানী

মন্দাকিনীর সাহায্যে আসামরাজ থেকে আসালু রাজ্য মণিপুরকে দিতে হবে। মন্দাকিনী ছিলেন আসামরাজের ভগ্নী। রামজীবন শক্রদমনকে পাঠালেন মণিপুররাজের দাবি জানাতে। বীরকীর্তির দাবি শক্রদমন মাতাকে জানালে। মন্দাকিনী এতে সম্মত হলেন না। ওদিকে বীরকীর্তি কুকিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেন না। কুলপিলাল ইত্যাদি মণিপুরের বিরুদ্ধে লেগে রইল। রামজীবন কুকিজাতির প্রতি স্নেহ পোষণ করলেও বীরকীর্তির পক্ষ অবলম্বন করলেন। এর পর কতগুলি যুদ্ধের বর্ণনা পাচ্ছি। শক্রদমন কুকিদের সাহায্যে মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। মণিপুররাজ-দুহিতা ইরাবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঠিক ছিল। কিন্তু শক্রদমন এতে রাজী হলেন না। শক্রদমনের সঙ্গে রণু এসে দাঁড়াল যুদ্ধক্ষেত্রে। রণু অসম সাহস প্রদর্শন করে আহত হল। আহত অবস্থায় সে শক্রদমনকে অনুরোধ জানালে অন্নদাকে বিবাহ করতে। অন্নদাকে যুদ্ধের সময় পাওয়া গিয়েছিল শক্রর বন্দী অবস্থায়। সেও মুসলমান অত্যাচারে প্রপীড়িতা। রণুও তাই ছিল। রণু নবদ্বীপ অধিবাসী ব্রাহ্মণ কন্যা। শক্রদমন অন্নদাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। রণচণ্ডীর (রণু) মৃত্যু ঘটল। রণচণ্ডী যে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছিল সে তরবারি পূত এবং রাজগৃহে গৃহদেবীর সম্মানে পূজিত হতে লাগল।

'রণচণ্ডী' স্থানীয় ইতিবৃত্ত নিয়ে লেখা হলেও লেখক আসাম-মণিপুর-কুকিরাজ্যের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন। লেখক রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে গল্পটি শুনেছিলেন তার অন্য একটি রূপ এখানে তুলে দিচ্ছি। গল্পটি চিত্তাকর্ষক।

'একদা তিনি (নির্ভয় নারায়ণ) স্বপ্নদর্শনে নদী তীরে গিয়া সর্পরূপিণী রণচণ্ডী দেবীকে দর্শন করেন। বিষধর সর্পকে তাঁহার ভয় হইল না, দেবী জ্ঞানে নির্ভয় চিত্তে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেন, সর্প তৎক্ষণাৎ অসিতে পরিণত হইল। এই দেবীরূপী তরবারি লইয়া তিনি গৃহে আগমন করিলেন। পরে রাত্রে পুনঃ স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, এই অসি সযত্নে সংরক্ষিত হইলে, তৎকৃপায় রাজবংশে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না। এই তরবারি তদবধি রাজবংশে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়।'[২]

হারাণচন্দ্রের রণচণ্ডীর সঙ্গে এ গল্পের কোনো মিল নেই। তবে নির্ভয়নারায়ণ বা শক্রদমনই যে রণচণ্ডীর প্রতিষ্ঠাতা তার প্রমাণ পেলাম।

রণচণ্ডীর বিষয়বস্তু সারালো। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ জাতীয়

---

১. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

২. অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, 'উপসংহার, কাছাড়ের কথা'।

ঘটনা বিশেষ পাওয়া যায় না। পার্বত্য অধিবাসীদের নিয়ে কাহিনী বচনার মধ্যে অভিনবত্ব আছে নিশ্চয়ই।

লেখক কাছাড় অঞ্চলেব। এই কাবণে সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্যবাসীদের বীতিনীতি তাঁব পক্ষে জানা সহজ হয়েছিল। রুদ্রেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রবীণ এবং নবীনেব মতদ্বৈধ চিত্তাকর্ষক। রুদ্র চায় মণিপুবেব বিরুদ্ধে অভিযান, কিন্তু কুলপিলাল সন্ধি এবং আত্মবক্ষাব জন্য ব্যগ্র। রুদ্রেব কাছে দশের স্বাধীনতাব জন্য মৃত্যুবরণ পবম শ্লাঘার বিষয। মণিপুববাজের কাছে তাব দম্ভোক্তি, শত্রুদমনের দ্বৈবথযুদ্ধে জাতিগত ঐতিহ্যেব প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, বণুব প্রতি জলন্ত প্রেম নিবেদন উপন্যাসটিব অন্যতম প্রশংসনীয দিক। কুলপিলাল, আতঙ্গী, রুদ্র পাহাড়ী জাতির বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু দিককে প্রকাশ কবেছে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকৃতিপ্রভাবিত মানবজীবনেব কথা হাবাণচন্দ্র ব্যাখ্যাবিশ্লেষণেই সমাপ্ত কবেছেন। দু-একটি চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আরণ্যক প্রবৃত্তির বিশেষ কোনো স্বাক্ষব দেখতে পাই না। পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গে সমতলবাসীব মৌল প্রভেদ লক্ষ্যগোচর হয় না বলে উপন্যাসটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত।

'রণচণ্ডী'র আখ্যান অংশ দ্রুতগতিতে চলেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশিষ্ট ধর্ম অনুযায়ী প্রেম, আদর্শবাদ, সুন্দবী নারীর প্রতি মোহ, যুদ্ধেব তূর্যনিনাদ থাকলেও লেখক কাহিনীব অবাবিত গতিকে রুদ্ধ করেন নি।

মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসুব দীর্ঘ ঐতিহাসিক নবন্যাস 'দুলীন' ১২৮০ সালে আবম্ভ হয়। প্রথমে বইটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয। পবে পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিত হযে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হল ১৮১৩ শকাব্দে।[1]

বইটির পুরো নাম ছিল 'দুলীনেব আশ্চর্য জীবন বা মহারাজা রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নবন্যাস'। গ্রন্থটির নাম দীর্ঘ হওয়াতে লেখক পরে নাম দিলেন 'দুলীন'।

বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, ভারতের কোনো-এক স্বাধীন রাজার রাজত্বকাল প্রদর্শন করবার জন্যেই উপন্যাসটি লিখেছেন। নানা কারণে

রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালই লেখকেব মনোভাব প্রকাশের অনুকূলে বলে মনে হয়েছিল। হেনরি লরেন্সের বইটি লেখকের অবলম্বন ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে। তবে কল্পনার স্থান যে একেবারেই নেই সে কথা বলা যায় না।

গ্রন্থটিতে সেকালেব পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে লেখক যত্নের ত্রুটি করেন নি। সামরিক কৌশল, যুদ্ধের অস্ত্র বর্ণনা, দস্যুদের অত্যাচার, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র লেখকেব বর্ণনার অন্যতম অংশ। যুদ্ধের অস্ত্র-বর্ণনায় লেখকের বিরাম নেই। দ্বলীনের প্রতি লেখকেব সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট। গ্রন্থ লেখবাব সময়ে দ্বলীন জীবিতও ছিলেন।

কেদারনাথ চক্রবর্তী

কেদারনাথ চক্রবর্তীব ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চন্দ্রকেতু' ১২৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ইতিবৃত্তকে অবলম্বন কবে লেখা এই উপন্যাসটির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই। ভূমিকাতে লেখক ম্যাক্সমূলাবেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবে প্রাচীন ইতিহাসচর্চা করেছেন এ কথা বলেছেন।

বালণ্ডা নগরীর (অধুনা বালণ্ডা পবগণা) বাজা চন্দ্রকেতুব সঙ্গে পীর গোরাচাঁদের যুদ্ধ গ্রন্থটিব বিষয়। লক্ষ্মণসেনের পব বাজা চন্দ্রকেতু সাহসের সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ কবেন। মহম্মদ গোবাচাঁদ চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত কবেন। বিজয়কেতুব সাহসিকতায় সাময়িকভাবে বাজ্য বক্ষা হলেও রাজা চন্দ্রকেতু পত্নীব শোকে আত্মবিসর্জন করলেন। বিজয়কেতু প্রণয়িনী মালতীর শোকে সেই পথ অবলম্বন কবলেন।

লেখক যুদ্ধেব বর্ণনা অপেক্ষা মালতী-বিজয়কেতুব প্রেম বর্ণনার উপর গুরুত্ব আবোপ কবেছেন বেশি। সে বর্ণনা তবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। ভাবাবেগ-প্রবণতা আত্যন্তিক হওয়াতে গ্রন্থটিতে চবিত্র এবং ঘটনার আকর্ষণ বিশেষ কিছু নেই। চন্দ্রকেতু স্বাধীন রাজা বটে, কিন্তু তাঁর মুখে স্বদেশপ্রেমের বাণী অত্যন্ত বেমানান। কেননা তাঁর দম্ভ ছিল কিন্তু যুদ্ধ করবার মতো শক্তি ছিল না।

বইটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে গোরাচাঁদের উল্লেখে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব 'জাল প্রতাপচাঁদ ১২৮৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' বার হয়। পরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হযে পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। বইটিকে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলেছেন। বিজ্ঞাপনে লেখক যথার্থ বলেছেন—

'আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমবা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিযা পাঠ কবি, তাহা ইংবেজেব ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংবেজের কীর্তিকলাপকে বাঙ্গালীব জিনিস বলিযা আমবা গ্রহণ কবিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয নাই। যখন সে সময উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাস উপযোগী উপকরণের অভাব না হয, এই প্রত্যাশায় এক এক সমযের সামাজিক দুই চারিটী কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা কবা যাইতেছে। সে জন্য আপাততঃ জাল-রাজাকে উপলক্ষ্য কবা গিযাছে।'

সঞ্জীবচন্দ্রেব প্রথম বচনা গল্পকাহিনী। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাব প্রতি তাঁব আগ্রহ গোড়া থেকেই ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রেব *Bengal Ryot* বচনাব সংবাদ দিযে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন তিনি কি অপবিসীম পবিশ্রম কবে এই বইটিব জন্য উপাদান সংগ্রহ কবেছিলেন। *Bengal Ryot*-এব সঙ্গে জাল প্রতাপচাঁদেব অন্তত এক জায়গায মিল পাচ্ছি। সেটি হচ্ছে উভয় গ্রন্থেই ইংবেজ আইন-কানুনেব পর্যালোচনা। পূর্বে আমাদেব দেশেব অবস্থা কিবকম ছিল সেইটি জানানোও এই দুই গ্রন্থেব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

'জাল প্রতাপচাঁদ' সঞ্জীবচন্দ্রেব বিশিষ্ট বচনা। এ বইতে সঞ্জীবচন্দ্রেব প্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। জাল প্রতাপচাঁদ আর-এক দিক দিযেও উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রেব বচনা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু বিষযবস্তু নির্বাচনে কিংবা চবিত্রসৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রেব একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই সঞ্জীবচন্দ্রেব ব্যক্তিগত জীবন প্রতিবিম্বিত। পীতম চবিত্র এ দিক থেকে স্মরণীয। দামিনী, বামেশ্বরেব অদৃষ্টে ভাগ্যেব নিষ্ঠুব পবিহাসেব কথা বলা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিভাবান হযেও জীবনযুদ্ধে পবাজিত। তাঁব উন্নতিব পথ ছিল রুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র এজন্য আক্ষেপও করেছেন। জাল প্রতাপচাঁদও তাঁব অদৃষ্টকে বাববাব অস্বীকাব কবতে চেয়েছেন কিন্তু অবস্থাব চাপে সত্যও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হযেছে। কেবল তাই নয়, জাল প্রতাপচাঁদেব জীবনের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রেব আবও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন, 'প্রতাপচাঁদের বাগ কেবল সিভিল সার্বেণ্টদেব উপর ছিল, তাহাদিগকেই তিনি বেযাদপ বলিতেন'। সঞ্জীবচন্দ্র নিজেব চাকরী-ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন ইংরেজ কর্মচারীদের। ইংরেজ-

কর্মচারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী। জাল প্রতাপচাঁদেব ক্ষেত্রে ওগলবি, লিটন ইত্যাদি ইংবেজ কর্মচারীর ষডযন্ত্রেব কথা সঞ্জীবচন্দ্র সবিস্তাবে বলেছেন। তাঁদের মিথ্যাচাব, কৌশল, ছলনাকে প্রকাশ কবে তিনি বেনামিতে আসলে নিজের কথাই বলেছেন।

প্রতাপচাঁদ বাল্যে লেখাপডা বেশি শেখেন নি। তবে ইংবেজি অনর্গল বলতে পাবতেন। পবীক্ষা পাস সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনেও ঘটে নি। তবে শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাঁব মানসিক গঠন ছিল বাজকীয। জাল বাজাব অধঃপতনের কাহিনী বলতে গিযে সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদেব সংসর্গদোষ, প্রমাবা খেলাব কথা বলেছেন। আব সঞ্জীবচন্দ্রেব জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র বানব-সম্প্রদায় (বন্ধুবর্গ) পবিবৃত হয়ে পবীক্ষাব কথা বিস্মৃত হযেছিলেন।

'কিন্তু পবীক্ষাব দিন, কলেজে যাইবার সময দেখিলাম, তিনি উপবিলিখত বানর-সম্প্রদাযেব মধ্যে একজনেব সঙ্গে সতবঞ্চ খেলিতেছেন। বিদ্যার মধ্যে এইটী তাহাবা অনুশীলন কবিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান কবিযাছিল।'[১]

প্রতাপচাঁদ কুসংসর্গে পডে যখন অধঃপাতে গেলেন তখন তাঁব অনুশোচনা এসেছিল এবং প্রাযশ্চিত্তেব জন্য অজ্ঞাতবাস কবেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রও বাববার পবাজিতও হযে 'ভগ্নোৎসাহ' হয়ে পডেন। এই-সকল ঘটনাব সাদৃশ্য দেখে অনুমান কবি সঞ্জীবচন্দ্রেব প্রতাপচাঁদকে গ্রহণ কববাব পশ্চাতে কেবলমাত্র তাঁব বিচাবকাহিনী লিপিবদ্ধ কবাই মূল লক্ষ্য ছিল না, ববং প্রতাপচাঁদেব মধ্যে নিজ জীবনেব সাধর্ম্য লক্ষ্য কবে সঞ্জীবচন্দ্র পুলকিত হযেছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত সহানুভূতি দিযে প্রতাপচাঁদেব ব্যথাস্নিগ্ধ দিকটিকে অপরূপভাবে প্রকাশ কবতে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। জীবনী যে বচনাগুণে সাহিত্যবস্তু হতে পাবে 'জাল প্রতাপচাঁদ' তার অন্যতম প্রমাণ।

জাল প্রতাপচাঁদ নিযে ইতিপূর্বে দুখানা ঐতিহাসিক কাব্য লেখা হযেছিল। একখানি 'প্রতাপচন্দ্র লীলাবস সঙ্গীত'। তাব কবি অনুপচন্দ্র দত্ত।[২] অপবটি দু পাতাব একখানি পুথি। অনুপচন্দ্রেব গ্রন্থের নামেই প্রকাশ কবি প্রতাপচাঁদকে ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভক্তিব আবেগে প্রতাপচাঁদ সেখানে মানুষরূপী দেবতা। প্রতাপচাঁদের 'অন্ত্যলীলা' কবিকে মুগ্ধ কবেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী

২. শ্রীহরপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

প্রতাপচাঁদের শেষ জীবনের সংবাদটুকু দিয়েছেন—তাকে বিস্তৃত করেন নি। পূর্বে বলেছি প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রূপটি দেখানোই সঞ্জীবচন্দ্রের বাসনা ছিল। প্রতাপচাঁদের শেষ জীবন তো আসলে উৎসাদিত বাসনার ধ্বংসবিত্ত পরিণাম। সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদের শোচনীয় পরিণামের বর্ণনায় উল্লাস-বোধ করতে পারেন না। অনুপচন্দ্র নিজে সত্যনাথ প্রতাপচাঁদের শিষ্য ছিলেন। ধর্মশাসিত মনের আবেগ-বিহ্বলতার সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীতে'। আর সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকের মেলবন্ধন ঘটেছে। জাল রাজার সমগ্র কাহিনীটি বর্ণনা করতে সঞ্জীবচন্দ্র গল্পরসের কোথাও ব্যাঘাত করেন নি। তাঁর অন্তর্ধান, আবির্ভাব, বিচার-কাহিনী, স্বীকারোক্তি সাহিত্যসম্মত উপায়ে বর্ণিত। পরিশেষে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন—

'তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এইজন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়। এর উদাহরণস্বরূপ তিনি জাল প্রতাপচাঁদের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

' 'জাল প্রতাপচাঁদ'-নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান প্রমাণ-বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র।'১

কালীপ্রসন্ন দত্ত

কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' (১২৯১) সিপাহীযুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের 'চিত্তবিনোদিনী'র পর সিপাহীযুদ্ধ নিয়ে লেখা এ উপন্যাসটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন দত্তও সিপাহীবিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু তিনি এ বিদ্রোহকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি সিপাহীযুদ্ধের সম্পর্কে দুটি মূল্যবান্ মন্তব্য করেছেন। এক, ইংরেজের অত্যাচারের জন্য

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, 'সঞ্জীবচন্দ্র'

এই বিদ্রোহ। দুই, এ বিদ্রোহ সময়োপযোগী নয়! পরে বলেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু দেশের জনসাধারণ যদি শাসনভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত না হয় তবে বিদ্রোহের পরিণাম হবে ভয়াবহ। কেননা দেশ তা হলে আবার ফিউডাল যুগে পিছিয়ে যেতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত বীর ছিলেন সন্দেহ নেই। এঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও হয়তো সংশয় নেই। তথাপি এঁদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব ছিল তা হচ্ছে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করবার মতো ক্ষমতার।

উপন্যাসটির নায়ক তান্তিয়া টোপি। লক্ষণীয়, প্রায় সকল ঔপন্যাসিকই বিদ্রোহের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করলেও তান্তিয়া টোপিকে এঁরা সহানুভূতির চোখে দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি প্রথম উপন্যাসে তান্তিয়ার বীরত্বমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল দিকটিকে গৌরব সমুন্নতি দিলেন। পরবর্তীকালে চণ্ডীচরণ সেন, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।

বিজয়ের কাহিনী খুব সাবালো নয়। কাহিনী অপেক্ষা সিপাহীদের বিদ্রোহসংক্রান্ত মনোভাবই এ উপন্যাসের বৃহত্তর ভূমিকা। মাধবরাও বেবারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর দুই কন্যা বেলা ও মালতী এবং এক পালিত পুত্র বিজয়। বিজয় মাধবরাওয়ের অসম্মতি সত্ত্বেও সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেয়। এবং তান্তিয়া টোপির সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয় এবং মালতী পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। বিদ্রোহে তান্তিয়া টোপি নানা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ-সকল যুদ্ধে তান্তিয়া প্রথমে সাফল্যলাভ করলেও পরে পরাজিত হন। নানা সাহেবও পরাজিত হয়ে নেপাল অঞ্চলে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর অন্তিম জীবন অতিবাহিত হয়। বিজয়ও যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করে। অবশেষে তান্তিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে নেপাল অঞ্চলে চলে আসে। নেপালে দস্যু মর্দনের আশ্রয়ে এরা থাকে। বিজয়ের সঙ্গে মালতীর, মর্দনের সঙ্গে বেলার বিবাহ হল। যুদ্ধের অপর সৈনিক প্রতাপ ফুলকুমারীকে বিবাহ করে।

পূর্বেই বলেছি, বিদ্রোহসংক্রান্ত ঘটনাই বিজয়ের আসল বিষয়। বিদ্রোহীরা এককালে ছিল নিমকহালাল। এখন নিমকহারাম কেন হল তার কারণ বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন ইংরেজরা বিদেশী। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি সহানুভূতি ইংরেজের ছিল না। অথচ

'সিপাহী ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যুদ্ধ তাহার ধর্ম, স্বার্থত্যাগ, উদারতায় তাহার অস্থিমাংস গঠিত ; সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু তাহার অক্ষয় স্বর্গের সোপান, আর অপমান, অবহেলা প্রভৃতি তাহার নিকট বিষ। অপমানিত হইয়া যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রতিশোধ না লয়, অনন্ত নরক তাহার বাসস্থান।'

ইংরেজ কর্তৃক অপমানিত হয়েই সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। নীল সাহেবের অত্যাচারে দেশ যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হল, তখন কালীপ্রসন্নের তীব্র জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে এই কয় ছত্রে —

'কিন্তু তাহাতে কর্ণেল নীলকে আপনারা নিন্দা করিতে পারেন না, যে হেতু তিনি খৃষ্টান, তাহাতে আবার প্রতিহিংসা লইতেছেন মাত্র।'

নিরীহ ইংরেজের প্রাণহনন তান্তিয়ার ইচ্ছা ছিল না। নানা সাহেবেরও না। কিন্তু বিদ্রোহে সৈন্যরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। তান্তিয়া এবং নানা সাহেবের নিষেধ শোনবার জন্য কেউ দাঁড়াল না। ইংরেজের অত্যাচারের পরিবর্তে সিপাহীরাও নৃশংস অত্যাচার করলে। তান্তিয়া এবং নানা সাহেব স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই দুই বীরকে এর জন্য দায়ী করলেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন—

'হা হতভাগ্য নানা ধুন্ধুপন্থ। হা হতভাগ্য তান্তিয়া তুপি। একবার আসিয়া দেখ কৃতজ্ঞ ইংরেজ ইতিহাস লেখক আজ কি রঙ্গে তোমাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন।'

ঐতিহাসিকের পক্ষপাতদুষ্ট চিত্র কালীপ্রসন্নকে পীড়িত করেছিল। সে যুগের পক্ষে কালীপ্রসন্নের মর্মবেদনার এই নির্ভীক প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে। ভারতবাসীদের নির্বিচারে নিধন করলে পর সেই সমস্ত হতভাগ্যদের প্রতি লেখকের সমবেদনা লক্ষণীয়।

'যাও, নির্দোষী ভারতশিশু, ভারতনন্দিনী, যাও, এ সংসার ছাড়িয়া সেই দেশে যাও, যে দেশে বলবান দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না, যে দেশে এক মানুষ অপর মানুষকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় হিংসা করে না, যেখানে তাপ নাই, দুঃখ নাই, যাও সেই অনন্ত সুখের ধ্যানে। নির্দোষিতার, সরলতার নিমিত্ত এ পাপময় পৃথিবীর বসতি নহে।'

রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের উপসংহারের কথা মনে করিয়ে দিলেও লেখকের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো কারণই নেই। তান্তিয়া টোপি বলেছেন—

'আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষের স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত আমি অস্ত্র ধরিয়াছি, আর ইংরেজ অপরের ধর্ম স্বাধীনতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, ধর্মের নিকট প্রকৃত অপরাধী কে ? আমি আমার বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি আমি অপরাধী না।'

তান্তিয়ার জবানিতে দেশের আপামর জনসাধারণের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ক্ষেত্রগোপাল রায়

ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 'ইন্দ্রকুমারী' (১৮৯১) রমেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গীত।

বর্গির হাঙ্গামা উপন্যাসটির বিষয়। বাংলাদেশে নবদ্বীপ অঞ্চলে আমদহের রাজা রাঘবেন্দ্র সিংহ জৈনুদ্দীনের শত্রু কর্তৃক নিহত হন। রাঘবেন্দ্র মহারাষ্ট্রীয়। তাঁর কন্যা ইন্দ্রকুমারী পিতার মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থায় পতিত হন। ও দিকে নাগপুরাধিপতি রঘুজী এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি ভাস্কর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। রঘুজীর এক সেনাপতি সমরসিংহ ইন্দ্রকুমারীর প্রণয়াসক্ত হয়। ভাস্কর ছলে বলে কৌশলে সমরসিংহের মৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাস্করের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হল। সমরসিংহের প্রতি রঘুজীর আস্থা অটুট রইল। ইন্দ্রকুমারী-উদ্ধারের জন্য সমরসিংহকে পাঠান হল। এ দিকে আলিবর্দী মারাঠা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সন্ধিপ্রার্থনা করলেন। উপন্যাসের সমাপ্তিও এইখানে। সমরসিংহ সম্ভবত রঘুজীর পুত্র, ভাস্করের চক্রান্তে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ জানা গেল না।

ক্ষেত্রবাবুর লেখা ভালো, অযথা বাক্‌বিস্তার নেই, তবে রোমান্স-সৃষ্টির আত্যন্তিক মোহ থেকে তিনি মুক্ত নন।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের 'রায়বাঘিনী' স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী। এটিকে উপন্যাস বলি না, কারণ এতে উপন্যাসোচিত গুণ বিশেষ কিছুই নেই। তবে 'পড়িলে নবেলের' মতো লাগে। বিধুভূষণবাবু ভুরসুট অঞ্চলের জনশ্রুতি অবলম্বন করে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রামদাস আদকের অনাদি-মঙ্গল (ধর্মমঙ্গল), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং স্থানীয় ছড়া ইত্যাদি উদ্ধার করে তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। লেখক গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, নানা দেবমন্দিরের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এবং জমিদারদের বংশাবলী সংগ্রহ করে গ্রন্থ বিস্তৃত করেছেন। কয়েকটি চিত্র দিয়ে সেকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে পাঠকের দৃশ্যগোচর করেছেন। বিধুভূষণবাবু অনুমান করেন ভুরসুটের জমিদার রাজা রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতি-ভ্রাতা রাজীবলোচনই হচ্ছেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়। কালাপাহাড় প্রায়

সব জায়গাবই মন্দিব, বিগ্রহ, দেউল, দেহারা ভেঙেছেন। কিন্তু ভুরসুট অঞ্চলের কোনো ক্ষতি কবেন নি। মুসলমান কন্যার প্রেমে পড়ে রাজীবলোচন যখন তাকে বিবাহ কবতে উদ্যত তখন উড়িষ্যাবাজ বাজীবলোচনকে বাধা দেন। এতে রাজীবলোচন ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্মেব প্রতি আস্থা হাবান এবং হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ কববেন সঙ্কল্প করেছিলেন। নিবেদন অংশে লেখক বলেছেন—

'পুস্তকের বর্ণিত ঘটনার একটিও কল্পনাপ্রসূত নহে। নরপতিগণের কীর্তিকলাপ, শিলালিপি ও দলিলাদি হইতেই অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।'

লেখকেব এই পবিশ্রম প্রশংসাব যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যগুলি যে সর্বত্রই প্রামাণ্য এ কথা মানতে পাবা যায় না। সে যাই হোক, লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে গ্রাম্য প্রবাদেব উপব নির্ভর কবে ভবশংকরীব চরিত্র-অঙ্কন। ভবশংকবী আকবর কর্তৃক বাযবাঘিনী উপাধি পান। ভবশংকরী পাঠান সেনাপতি ওসমানেব বিরুদ্ধে বীবত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ওসমান পরাজিত হলে আকবব সন্তুষ্ট হযে তাঁকে রায়বাঘিনী উপাধি দেন। লেখক ভবশংকরীকে হিন্দুধর্মেব এবং হিন্দু জাতিব প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। ভবশংকরী মহীয়সী মহিলা। তাঁব সঙ্গে তুলনা চলতে পাবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর। আবার ভবশংকবী কেবল গৃহীজীবনের আদর্শকেই বড়ো করে তোলেন নি। তাঁর ক্ষাত্রতেজ রাজপুতরমণীসদৃশ। দেশের এবং দশের মঙ্গল চিন্তাই তাঁর জীবনের ধ্যান ছিল।

প্রবোধচন্দ্র সরকার

প্রবোধচন্দ্র সরকাবের 'শালফুল' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে। এইটি স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখক চন্দ্রকোনাবাসী। সুতরাং তাঁব পক্ষে স্থানীয় জনশ্রুতি সংগ্রহ কবা কষ্টকব হয় নি। তবে অনেক কথাই 'ঔপন্যাসিক'। 'কয়েকটি কথা'য় লেখক ঐতিহাসিক উপাদানের যাথার্থ্য বিচাব কবেছেন। মেদিনীপুবেব ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এ. হ্যারিসন বর্ধমান বিভাগেব কমিশনাবেব কাছে যে বিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র তাকে অবলম্বন কবে কাহিনী রচনা কবেছেন। বইটি প্রকাশিত হবার সময়ে ভারতবর্ষের বাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা নূতন রূপ নিচ্ছিল। প্রবোধচন্দ্র শালফুলের ভূমিকায় সে কথার ইঙ্গিত করেছেন।

'রাষ্ট্রীয় চেতনার এই অবস্থার জন্যে ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার, অভিনব উপন্যাসের যে কয়েক স্থলে কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যে যে স্থলে সময়ানুরূপ কোমল ভাষা প্রযোজিত হয় নাই, সে সকল অংশের ভাব ও ভাষা পরিবর্তিত ও সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় সৌরভ বিহীন বনকুসুম 'শালফুল' একটুকু বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থকার অপরাধী।'

সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে শালফুল নিতান্ত তুচ্ছ, কিন্তু গ্রন্থটিব সাময়িক মূল্যকে স্বীকাব করতেই হবে।

শালফুলের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'নায়েক' বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলি না। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয়ই এই বিদ্রোহের মধ্যে সমসাময়িক জনমানসের প্রতিফলন দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন।

বগড়ি অঞ্চলেব মন্ত্রী অচলসিংহের ইংরেজদেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গ্রন্থটিতে বিস্তৃত হযেছে। কাহিনীতে অন্যান্য বিষযেব মধ্যে অচলসিংহেব কন্যা চামেলীর বীবত্ব এবং মথুবানাথ দাসেব কন্যা কমলাব সখ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অচলসিংহ পরাজিত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

এই বইটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'নায়েক' বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকেব সহানুভূতি। তিনি স্পষ্টত প্রশ্ন কবেছেন বিদ্রোহীবা দস্যু না স্বদেশপ্রেমিক। নিজেই এর উত্তর দিযেছেন। নায়েকদেব আপাত দস্যুবৃত্তির অন্তবালে রয়েছে স্বদেশ-প্রেরণা, দেশকে স্বাধীন করবার উদগ্র বাসনা, মথুবানাথ যখন বলে—

'তোমরা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতে ইচ্ছা কর?'

তখন অচলসিংহ বলেছিলেন, 'হাঁ, আমরা তাই চাই।' কিন্তু দেশরক্ষা করবে কি ভাবে? এর উত্তর দিয়েছেন অচলসিংহ।

'কেন পারিব না—সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে, আর আমরা দেশের লোক হইয়া দেশ রক্ষা করিতে পারিব না।'

ফাঁসীতে যাবার আগে অচলসিংহ কন্যা চামেলীকে বলেছিলেন—

'তুমি আমার নন্দিনী হইয়া আবার রোদন করিতেছ? মা আর কাঁদিও না, প্রফুল্লমুখে বিদায় দাও। আমি স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হইযা জন্মভূমির চরণে জীবন বিসর্জন দিয়া স্বর্গে যাইতেছি, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। তুমি আপন গৌরব গরিমা স্মরণ রাখিবে।'

ভূমিকাতে লেখক যে 'কোমল' ভাষাব কথা বলেছেন তা সত্ত্বেও লেখকের অভিপ্রায় এসকল সংলাপে আর প্রচ্ছন্ন থাকে নি। অচলসিংহ ইংবেজের দৃষ্টিতে একজন বিদ্রোহী। Achal Singh was the leader of the mutineers. কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে তিনি বীর।

গড়বেতা নামেব উৎপত্তি, কযেকটি মন্দিবের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক জনশ্রুতি এবং এইচ. এল. হ্যাবিসনেব বিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেকালেব উপন্যাসেব মতো প্রবোধচন্দ্র পবিশিষ্টে ঐতিহাসিক উৎস নির্ণয় কবেছেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেব 'অমব সিংহ' (সন ১২৯৬ সাল) সিপাহীবিদ্রোহ-মূলক উপন্যাস। নগেন্দ্রবাবুব এই বইতে অ্যাডভেঞ্চাবেব স্পর্শ আছে। কিন্তু উপন্যাসটি অ্যাডভেঞ্চাবসর্বস্ব নয। নগেন্দ্রনাথ এই বইটিকে ঐতিহাসিক তথ্যে ভাবাক্রান্তও কবেন নি। বচনাব প্রসাদগুণ ও আন্তবিকতা পাঠকেব চিত্তগহনে অনুবণন তোলে।

বিহাবেব বিদ্রোহী নেতা কুমাবসিংহেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমবসিংহেব ঘটনাবহুল চিত্র এই উপন্যাসটি। কাহিনীটি এই। কুমাবসিংহ বাজপুত বীব। একখণ্ড ভূখণ্ডেব অধিকাবী। কিন্তু যৌবনে বিলাসব্যসনে উৎসবে অনুষ্ঠানে অতিবিক্ত ব্যযেব জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অশীতিপব বৃদ্ধেব সকল আশা যখন নির্বাপিত, তখন সিপাহীবিদ্রোহ আবাব বৃদ্ধেব মনে বাসনাব শিখা জ্বেলে দিলে। বিদ্রোহকে অবলম্বন কবে কুমাবসিংহ হৃতগৌবব ফিবিয়ে আনতে পাববেন এই আশা কবলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা অমবসিংহ এতকাল সন্ন্যাসীব জীবন-যাত্রা নির্বাহ কবেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফকিব ফুল শাহেব প্রেবণায় তিনি ভ্রাতাব পাশে দাঁড়ালেন। অসীম সাহস দেখালেও অমবসিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো বিচক্ষণতা কিংবা দূবদর্শিতা ছিল না। সেই কারণে বারবার করাযত্ত সিদ্ধি স্খলিত হযেছে। অবশ্য এই বিদ্রোহ একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ নিতে পাবে নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহকে দমন করতে ইংবেজ সবকাবের বেগ পেতে হয নি। অমবসিংহ যখন সংসাবে ফিবে এসে ভ্রাতার পাশে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পত্নী বানী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। গতপ্রেম অনির্বাণ শিখায় জ্বলে উঠে অমবসিংহের কার্যে পথ দেখাতে লাগল। বিশ্বাসঘাতক রামশরণ বানীকে অপহবণ কবে নিলে। ফুল শাহের সহায়তায় আবার রানীকে ফিরে পেলেন। অমরসিংহ নিজের ঔদার্যের পরিচয় দিলেন। রামশরণের বিশ্বাস-

ঘাতকতায় অমরসিংহ যখন বন্দী হলেন, তখন ইংরেজ রমণী মিস হাইলর (ওরফে লবা) অমরকে কৌশলে মুক্ত করে দিলে। অমরের প্রতি তার গোপন প্রেম ছিল। অমরের ভ্রাতৃবধূ লছমী রামশরণের গুলিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে দেবরকে রক্ষা করলে। অমরসিংহ যখন মুমূর্ষু ভ্রাতৃবধূকে স্পর্শ করলেন, তখন বিধবার রুদ্ধপ্রেম আত্মপ্রকাশ করলে। শেষে অমরসিংহ সকল আশা ছেড়ে দিয়ে রানীকে নিয়ে নেপালে পালিয়ে গেলেন। কুমারসিংহের আগেই মৃত্যু হয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অমরসিংহ সুখপাঠ্য উপন্যাস। সিপাহীবিদ্রোহ-মূলক উপন্যাসে বিদ্রোহের উত্তেজনাটাই প্রবল, চরিত্রচিত্রণ কিংবা উপন্যাসোচিত প্লটনির্মাণ সেখানে গৌণ ছিল। নগেন্দ্রনাথের উপন্যাস এই হিসাবে ব্যতিক্রম। বিদ্রোহ অমরসিংহের পারিবারিক জীবনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল তারও যথাযথ চিত্র এই উপন্যাসে পাচ্ছি। রাজপুতরমণী রানীর হিন্দু পাতিব্রত্য আদর্শ, স্বামীর গর্বে গর্বিতা রমণীর মহনীয় রূপ এবং ক্ষাত্রতেজ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লছমী এবং রানীর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ অথচ স্বতোৎসারিত অনুরাগ-বিরাগ আমাদের পরিচিত জীবনের রহস্যমধুর চিত্রগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। এই-সকল চিত্রই ভাগ্যবিড়ম্বিত, নিয়তিতাড়িত শোচনীয় পরিণতিটিকে গাঢ়তা দান করেছে। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতোই।

'প্রকৃত পক্ষে উহা যুদ্ধ নহে, বিদ্রোহমাত্র। যে দিন ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইবে সেই দিন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজের বাস উঠিবে।'

অথবা

'সিপাহী বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ না অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, যুদ্ধধর্ম প্রতিপালন করে নাই।'

এবং

'সিপাহীবিদ্রোহের সিপাহীরা নবপিশাচস্বরূপ, স্বদেশোদ্ধারস্বরূপরূপে মহাব্রত এরূপ নৃশংসেরা সাধন করিতে পারে না।'

এ-সকল কথা থাকলেও নগেনবাবুর বই কিন্তু অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। নগেনবাবু গ্রন্থের নায়ক-চরিত্র অমরসিংহের জন্য সমবেদনা উজাড় করে দিয়েছেন, কুমারসিংহের মৃত্যু-দৃশ্যটিকে করুণাঘন করে তুলেছেন। স্বদেশপ্রেম না হউক, উপযুক্ত বীরের প্রতি লেখকের এই শ্রদ্ধা মর্মস্পর্শী। ফুল শাহ মহাপুরুষ

জাতীয় চরিত্র। তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী সেকালের উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল' (১৩০৬) একখানি অভিনব উপন্যাস। এই অভিনবত্ব উপন্যাসটির গঠনবৈচিত্র্যে। কতগুলি দলিলদস্তাবেজ এবং পত্রের সাহায্যে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ বর্ণিত। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

'এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যায়। পুরাণ কাগজকে উপন্যাস, এমন কি একটা গল্প বলিলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্যও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান বর্ণিত নায়কনায়িকাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠন ও তাহার পূর্ণতাসাধন দূরের কথা। তবে যথাসাধ্য ত্রুটি করা হয় নাই।'

অম্বিকাচরণের মাতামহ রাজবাড়ির বৈদ্য ছিলেন। সেই সূত্রে রাজবাড়ির প্রাচীন দলিল ইত্যাদি লেখকের হস্তগত হয়। এই দলিলদস্তাবেজ থেকে লেখক তাঁর কাহিনীটিকে খুঁজে পান। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হওয়াতে লেখক একে সর্বসাধারণে প্রচার করতে সাহসী হন। কাহিনীটি এই। জনার্দনগড়ের রাজা রত্নধ্বজ সিংহ। তাঁর দুই স্ত্রী সাবিত্রী এবং অনঙ্গমোহিনী। সাবিত্রীর গর্ভজাত কন্যা কৃষ্ণভাবিনী দেবী। সাবিত্রীর মৃত্যুর পরে সুবর্ণগড়রাজ-দুহিতা অনঙ্গমোহিনীকে রত্নধ্বজ বিবাহ করেছিলেন। রত্নধ্বজ অপুত্রক হওয়ায় সুবর্ণগড়ের রাজা রত্নধ্বজ সিংহের রাজ্যলাভের আশা পোষণ করতে থাকেন। অনঙ্গমোহিনী পিত্রালয়ে থাকতেন। সেখান থেকে খবর পাঠানো হল রত্নধ্বজের এক পুত্র হয়েছে। রত্নধ্বজ এ খবর বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু একটা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি কন্যা কৃষ্ণভাবিনীকে ব্রহ্মানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ রাজগুরু। সেখানে অন্য এক রাজপুত্র (বিজয়গড় রাজ্যের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহ ধলদেব বাহাদুরের পুত্র) আদিত্য প্রতাপ সিংহও থাকতেন। সেখানে উভয়ের সখ্যতা, পরে প্রেম এবং শেষে বিবাহ হয়। সুবর্ণগড়রাজ কৃষ্ণভাবিনীর প্রাণনাশে উদ্যত হন।

১. নগেন্দ্রনাথ 'জয়ন্তী' (প্রবাসী, ১৩২৯-১৩৩০) নামে আর একখানি কল্পনাসর্বস্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারী সেনাপতি মীরজাফর আলির সহায়তায় কৃষ্ণভাবিনীকে নিহত কবতে গেলে তীর্থযাত্রী রত্নধ্বজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দেন। কৃষ্ণভাবিনী পালিয়ে আত্মবক্ষা করেন। কিন্তু সকলে জানলে কৃষ্ণভাবিনী মৃত। কৃষ্ণভাবিনী পবে মোকদ্দদা করেন। এই মোকদ্দমায় বাদী ময়ূরধ্বজ সিংহ (অনঙ্গমোহিনীব পুত্র বলে কথিত), প্রতিবাদিনী কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবং প্রতিবাদী দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ। দেবেন্দ্র বত্নধ্বজের ভাগিনেয়। মোকদ্দমায় কৃষ্ণভাবিনীর জয় হল। কাহিনীও এখানে শেষ।

ঘটনাব কালবিচাবে দেখি সিবাজদ্দৌলাব রাজ্যপ্রাপ্তি এবং পতনের সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উপন্যাসটিতে সিবাজেব অত্যাচাব-কাহিনীও স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের ছায়াবলম্বনে লিখিত। লক্ষণীয়, অক্ষয়কুমাব মৈত্রেযের গবেষণাব পবেও লেখক সিবাজকে অত্যাচারীরূপেই দেখেছেন। ব্রহ্মানন্দ সবস্বতী সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রেব হবদেব ঘোষালেব (বিষবৃক্ষ) প্রোটোটাইপ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসেও ঘটনাব অগ্রগতি এই বিরাগী পুরুষেব পত্রেব মধ্য থেকেই জানতে পাবি। কৃষ্ণভাবিনীব মৃত্যু-সংবাদ রটনা এবং পরে তার আবির্ভাব সঞ্জীবচন্দ্রেব জাল প্রতাপচাঁদেব কথা স্মবণ করিয়ে দেয়। লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে তিনি ভাষা ব্যবহারে যথাসাধ্য 'প্রত্নরীতি' অবলম্বন করেছেন। সূচনাতে লেখক বলেছেন প্রাচীন ভাষার কিছুটা সংস্কাব করে তিনি কাহিনীটিকে পবিবেশন কবেছেন। কিন্তু এ সংস্কার যৎসামান্য। মোকদ্দমার ভাষা এবং গন্তেব ব্যবহারে সেকালের রচনাবীতি এবং শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করে লেখক ঐতিহাসিক পরিবেশটিকে অক্ষুণ্ন বেখেছেন।

হলধর বিশ্বাস এবং পোলিটিক্যাল এজেণ্টেব সংলাপ কিঞ্চিৎ স্থূল। ব্রহ্মানন্দ সবস্বতীর পত্রে নীতিকথনের বাহুল্য ঈষৎ পীড়া দেয়। আদিত্য-কৃষ্ণাব প্রেমকাহিনী গতানুগতিক।[১]

নবীনচন্দ্র সেনের 'ভানুমতী' (১৩০৭) চট্টগ্রামের আদিনাথ-মাহাত্ম্য কাহিনী।

১. অম্বিকাচরণ গুপ্ত আরও দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন 'কপট সন্ন্যাসী' (১৮৭৪) ও 'কমলে কণ্টক' নামে।

হ র প্র সা দ শা স্ত্রী

কাঞ্চনমালা

'কাঞ্চনমালা' বঙ্গদর্শনে (তখন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ১২৯০ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটি ১৩২২ সালে (১৯২১) ১লা ফাল্গুন, আধুলি গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তর্গত হয়।

কাঞ্চনমালার ভূমিকায় হরপ্রসাদ বলেছেন—

'ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাঁহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন, বলিতে পারি না।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের খুশির জন্যও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে দিতেন।[১] ফলে গুরুকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিষ্যের মধ্যেও গুরুর অনুকরণ প্রথম জীবনে আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। নচেৎ বাল্মীকির জয় গদ্যকাব্য রচনা করার পর এতটা অনুকরণাত্মক রচনা আশা করা যায় না।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অনুকরণে কাঞ্চনমালায় তিষ্যরক্ষার মধ্যে 'সু ও কু'র দ্বন্দ্বটি কৌতূহলোদ্দীপক। 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অংশটি তিষ্যরক্ষার দীক্ষা গ্রহণের পূর্বের দৃশ্যটিতে অনুসৃত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এ দৃশ্যবর্ণনায় যে রীতিগত সৌন্দর্য প্রকাশমান এখানে তা অনুপস্থিত। অনুকরণের আতিশয্য লক্ষিত হয় তিষ্যরক্ষার পরিণতিতে। 'বিষবৃক্ষের' হীরা আর তিষ্যরক্ষায় কোনো প্রভেদ নেই। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকুশলতা হরপ্রসাদে নেই। কাঞ্চনমালার গৃহত্যাগ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কেবল ঘটনার সাদৃশ্যে নয়, বর্ণনাতেও বঙ্কিম-অনুসৃতি দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমের প্রৌঢ় রচনারীতি হরপ্রসাদের আয়ত্তের বাইরে। প্রারম্ভে কুণাল কাঞ্চনমালার বিবাহোত্তর জীবনের দ্বৈতলীলা অতিপল্লবিত বর্ণনায় ভারাক্রান্ত। ভাবের তরল উচ্ছ্বাসও লক্ষণীয়। কুণালের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন অনেকটা গতানুগতিক।

কাঞ্চনমালা চরিত্রটির উপর লেখকের সহানুভূতি। গ্রন্থের নামও নায়িকার নামানুসারে। তবে প্রতিনায়িকা তিষ্যরক্ষা গ্রন্থে প্রধান। কাঞ্চনমালার স্থান অপরিসর। এই কারণে তার চরিত্রের বিকাশ উপন্যাসোচিত নয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাক, পরোক্ষ প্রভাবে কাঞ্চনমালা

১. 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' গ্রন্থে উদ্ধৃত

চিত্রিত। এজন্য চরিত্রটি উচ্চচিন্তার বাহক—তার ক্রমবিকাশ মানবোচিত নয়।

কুণাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবাব নেই। কেননা সে-ই লেখকেব আদর্শ-বাদের যন্ত্রস্বরূপ। এই চবিত্রটিও নির্দ্বন্দ্ব অতএব নিস্তরঙ্গ।

তিষ্যবক্ষা চরিত্রে বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব আছে। এই চরিত্রটিই পাঠকেব কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে কাঞ্চনমালায হবপ্রসাদ পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে কোনো মৌলিক পবিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হন নি। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে তিনি নূতন পথ খুলে দিলেন। হিন্দুবৌদ্ধ বিবোধেব কাহিনী অবলম্বন কবে তিনি বিষযবস্তু নির্বাচনেব সীমাটিকে আবও বিস্তৃত কবে দিযেছিলেন। এইখানেই কাঞ্চনমালাব কৃতিত্ব।

.বণের মেযে

কাঞ্চনমালা প্রকাশিত হবাব প্রায় বত্রিশ বছব পবে হবপ্রসাদ 'বেণের মেয়ে' লিখলেন। বেণেব মেয়েব প্রকাশকাল ১লা ফাল্গুন ১৩২২। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে হবপ্রসাদ যে উপন্যাসটি লিখলেন তার মধ্যে প্রৌঢ় জীবনেব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষব সর্বত্র। তাঁব কর্মব্যস্ত সময়েব মধ্যে যে গবেষণালব্ধ ফল সঞ্চিত হয়েছিল তাকেই গল্পাকাবে প্রকাশ কবেছেন হবপ্রসাদ এই গ্রন্থে। কাঞ্চনমালায় বঙ্কিমেব অনুকরণ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। 'বেণেব মেয়ে'তে তার স্পর্শমাত্র নেই। বেণেব মেযে হরপ্রসাদের কেবল মৌসিক সৃষ্টি নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ বইটি অভিনব। হরপ্রসাদের বসিক মন 'পাথুবে প্রমাণে'র উর্ধ্বে তথ্যকে কল্পনার বঙে বাঙিয়ে তুলতে সাহায্য করলে।

ইতিহাসেব অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তথ্যগুলি ভাসমান বয়াব মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।[১] হরপ্রসাদ চেয়েছিলেন এই বযাগুলিকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে, বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলিকে যুক্তি ও উপাদানেব সাহায্যে নিবেট করে তুলতে। বেণের মেযেতে এই প্রচেষ্টা। হবপ্রসাদের বেণেব মেয়ে নিজের আবিষ্কার, দেশ-প্রীতিব প্রেবণা, খাঁটি নভেল লেখবাব আকাঙ্ক্ষা, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যসূত্রে বিধৃত করবার প্রেরণা থেকেই বচিত। বেণেব মেয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

১. ১৩৩২ সালের ভাবণ, রচনাবলীভুক্ত

'বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সম্মত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কথন হইতেও চাই না। বেণের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে বাঙ্গালার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইযা লউন না কেন?'

বেণেব মেয়েব কাহিনী দীর্ঘ নয, জটিল তো নযই। কাহিনীটি এই।

তাবাপুকুবেব রূপনারায়ণ জাতে বাগ্দী, বৌদ্ধধর্মেব পৃষ্ঠপোষক। তাঁবই অভিষেকেব সময়ে গাজন উৎসব। লুইসিদ্ধা শিষ্য বিক্রমণিপুবেব বাজপুত্রকে নিয়ে অনুষ্ঠানে চলেছেন। সাতগাঁব বেণেব মেয়ে মায়া গুরু-শিষ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে এল। মাযাকে দেখে শিষ্যেব চিত্ত টলোমলো। কিন্তু গুরুব দিকে তাকিযে সে চিত্ত নিবোধ কবলে। মাযাব স্বামী জীবন ধনী বোগ যন্ত্রণায মাবা গেলে মায়া বিধবা হল।

মায়াব সন্তান ছিল না। মাযাব বাবা বিহাবীব পুত্রসন্তান ছিল না। তখন বাংলা দেশে হিন্দুবৌদ্ধ বিবোধ। বৌদ্ধবা মাযাকে মহাবিহাবে ভিক্ষুণী করে তাব সম্পত্তি হস্তগত কবতে চাইলে। কিছুকাল পবেই মায়া ভিক্ষুণীদেব উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে। রূপা রাজাব ইচ্ছা গুরুপুত্রের সাধন-সঙ্গিনী হোক মাযা। সুতবাং সে মহাবিহাবে যাক। বিহারী দত্ত হিন্দুসমাজেব নেতৃবৃন্দকে ডেকে মায়াকে রক্ষা করতে বলল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হল।

গুরুপুত্র কিন্তু মাযাকে ভুলতে পাবে নি। মায়া তার ধ্যানধাবণাকে বিচলিত করে দেয়। তিনি ভাবেন মহাসুখ যদি বিগলিত-বেদ্যান্তব হয় তবে তার উৎস হোক মাযা।

এ দিকে মস্করীর ছদ্মবেশে পিশাচখণ্ডীব এক ব্রাহ্মণ মায়াকে গোপনে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেল। মায়ার অন্তর্ধানেব সঙ্গে সঙ্গে সাতগাঁযে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের দায়ী কবলে। রূপা বাজাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব বহ্নি প্রধূমিত হতে লাগল।

কথাটা বাজা হবিবর্মদেবেব কানে গেল। বিহারী হিন্দু জানতে পেবে তিনি বললেন—

'তবে ত উহাকে সাহায্য করা আমাদের আবশ্যক। বাগ্দী রাজা হিন্দুদের উপব অত্যাচার করিবে- আমরা সহ্য করিতে পারিব না।'

কিন্তু বাগ্দীরা রণরঙ্কা। সুতরাং উভয়পক্ষই যুদ্ধের আয়োজনে ত্রুটি রাখলে না। দক্ষিণ রাঢের রণশূর, হরিবর্মদেব, বেণেরা এক দিকে; মহীপাল, রূপা রাজা অন্য দিকে। পরিণামে হিন্দুদেরই জয় হল। কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ক্ষণিক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রশমিত হল। বিহারী সাতগাঁর রাজা নির্বাচিত হল।

মায়া ফিরে এল। কন্যাকে পেয়ে বিহারীর আনন্দের সীমা রইল না। বিহারী রাজা হওয়াতে বেণেদেরও আনন্দ হল। সকল সৈনিকই পুরস্কৃত হল। পিশাচখণ্ডীর ব্রাহ্মণ পুরস্কারের পরিবর্তে একটি রাজসভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। রাজা এতে খুশি হলেন। ভবদেবও রাজি হলেন। রাজসভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে আনন্দ করলেন।

হরপ্রসাদ বেণের মেয়েতে বলেছেন মুসলমান আক্রমণের সময়ে ভারতের নরপতিরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন। জয়দেবের কল্কি অবতারের বর্ণনা হয়তো হর-প্রসাদকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অবলম্বনে বেণের মেয়ের যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা করেছেন হরপ্রসাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে। তখনকার দিনে সাধারণ যোদ্ধা জাতি ছিল ডোম ও বাগ্দী। অন্যান্যেরাও অবশ্য যুদ্ধে যোগ দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম ও মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে এই যুদ্ধ-বর্ণনার চিহ্ন আছে।

বেণের মেয়েতে রাজা হরিবর্মদেব এবং মহীপালের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মহীপালই যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তার প্রমাণ পাওয়া যায় হরিবর্মদেবের উল্লেখে। দ্বিতীয় মহীপাল এবং হরিবর্মদেব সমসাময়িক হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে রূপা রাজার বিদ্রোহের ঘটনাটির ঐতিহাসিক উৎস বিচার করি। ভোজ-বর্মদেবের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় জাতবর্মা দিব্য ও গোবর্ধনকে পরাজিত করেন। দিব্য কৈবর্ত-বিদ্রোহের অধিনায়ক। রামচরিতে ইনিই দিব্বোক নামে অভিহিত। রামচরিত টীকা থেকে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত-বিদ্রোহের নায়ক দিব্যের বংশধর ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভও করেছিলেন। তা হলে দেখতে পাচ্ছি ঐতিহাসিক সূত্র ধরে বিচার করতে গেলে কৈবর্ত-বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য মোট তিনজন নরপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। জাতবর্মা, দ্বিতীয় মহীপাল

এবং রামপাল। জাতবর্মার বংশধর হরিবর্মদেব। দিব্যের বিদ্রোহের সঙ্গে হরিবর্মার কোনো সম্বন্ধ নির্ণীত হচ্ছে না। সুতরাং বেণের মেয়েতে বাগ্দী-বিদ্রোহের সঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহের সম্বন্ধ-স্থাপন দুরূহ। আবার বেণের মেয়ের রূপা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন মহীপাল। ইতিহাসে আছে মহীপাল কৈবর্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। রূপা রাজার সেনাপতি রাজা হরিবর্মদেবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে বলেছেন 'ভবস্ত্যআপদম্' এবং বিদ্রোহকে বলেছেন অলীক বিদ্রোহ। যাই হোক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনায় ঐতিহাসিকতা না থাকলেও তিনি কৈবর্ত-বিদ্রোহের সাদৃশ্যেই বাগ্দী-বিদ্রোহের চিত্রটি এঁকেছেন।

ভবদেব ভট্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী বালবলভীভুজঙ্গ। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন—

'বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল।'[১]

সে যুগের কবির প্রশস্তি লিপিতেও ভবদেব ভট্টের নাম পাই।

সেকালে বণিকদের যে বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন। এমন-কি বণিকরা রাজাদের শাসনকার্যে ডিক্টেটও করতেন।

বেণের মেয়েতে ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্যের পরিচয় পাই। পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্যের কথা সে-যুগের ইতিহাস থেকেই পাওয়া। এই ব্রাহ্মণ্যশক্তিই সে-যুগে প্রধান ছিলেন তার প্রমাণ পাই এঁদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে এবং রাজকার্যে বিভিন্ন পদ-প্রাপ্তিতে। সুতরাং বেণের মেয়েতে যদি এঁদের কথা আত্যন্তিক হয়ে থাকে তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

লুইসিদ্ধা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে এঁকে একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'লুইয়ের জীবৎকাল দশম শতাব্দী বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম'।[২] বেণের মেয়েতে চর্যাগুলি কীর্তনের মতোই গেয় এইরকম পাচ্ছি।[৩] এখানে কোনো ভুল আছে বলে মনে করি না। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে লুইর যোগাযোগ ছিল অনুমান

১. শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব): ১৩৫৯, পৃঃ ২৯২

২. শ্রীসুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী

৩. শ্রীসুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী

করে লুইও তিব্বত নেপাল গিয়েছিলেন এইটি শাস্ত্রী মহাশয়ের মত। কিন্তু লুইর চরিত্রঅঙ্কনে হবপ্রসাদ কল্পনার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

যুদ্ধবর্ণনায় যে অশ্বারোহী, পদাতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে তা সন্ধ্যাকর নন্দীর সাক্ষ্যে ঠিক বলে মনে হয়। তবে বারুদের ব্যবহার সে যুগে ছিল না।

বেণেব মেয়েব সম্পর্কে বাঙালি পাঠক উদাসীন কেন? এর কারণ সম্ভবত কাহিনীটির দুর্বলতা। বস্তুত সে কথা অস্বীকার করবার উপায়ও নেই। গল্পটি অত্যন্ত শিথিল। চবিত্রগুলিব উত্থানপতন বিশেষ নেই। বিকাশও দেখানো হয় নি। গুরুপুত্রের প্রসঙ্গটিই এখানে অত্যধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। কাবণ গুরুপুত্রের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বহুবাব, অথচ প্রত্যক্ষ ঘটনা নেই। উপন্যাসের বিশ্লেষণেব ন্যূনতম দাবিও অস্বীকৃত হয়েছে। ভবদেব, মায়া, বিহারী, লুইসিদ্ধার চবিত্রের কোনো পরিবর্তন নেই। রাজবাজড়ার যে সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে এমন কিছু উচ্চ রচনা-শক্তির পরিচয় দেয় না। কাহিনীটি শেষ হয়েছে হরিবর্মদেবের বাজ্যবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। পরবর্তী বর্ণনা গ্রন্থে শিথিলবদ্ধ। এজন্য উপন্যাসটি দ্বিধাবিভক্ত।

সম্ভবত এই কাবণেই বেণেব মেয়ে কতকটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিতও বটে। কিন্তু অবহেলাব অথবা উপেক্ষাব যে কারণই থাক গ্রন্থটির অন্য মূল্য অনস্বীকার্য। গ্রন্থকাবেব উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। এবং তা সার্থকতায় মণ্ডিত।

আসল কথা, শাস্ত্রীমশায় বেণেব মেয়েতে উপন্যাসের প্রচলিত পথ অনুসরণ কবেন নি। এ উপন্যাসে ইতিহাসেব আধারে রোমান্সেব আতিশয্য নেই। বেণের মেয়েতে তিনি গল্পাকারে বাংলার ইতিহাস পবিবেশন করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবাব জন্যই কাহিনীর অবতারণা। বিহাবী দত্তের কাহিনীব স্বতন্ত্র মূল্য কিছু নেই, কিন্তু সমাজেতিহাসেব দিক থেকে এর মূল্য অপবিসীম। ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বেণের মেয়েতে অনুস্যূত নয়। তথ্য কল্পনাব দ্বারা স্পৃষ্ট। গ্রন্থেব মধ্যে লুইসিদ্ধার প্রাসঙ্গিক স্থান কতটুকু সেইটি বোঝা যাবে লেখকেব উদ্দেশ্য-পরিকল্পনায়। কেবলমাত্র কাহিনীরস পবিবেশন করাব ইচ্ছে থাকলে হরপ্রসাদ নিশ্চয়ই রূপা বাজার দবদবার চিত্রটি এত কবে ফুটিয়ে তুলতেন না। সেকালে সহজিয়া সাধকদের আচার-আচরণ, রাজরাজড়ার বিলাস-ব্যসন, সাধারণ নরনারীর উৎসব-অনুষ্ঠান

এইগুলিই লেখককে আকর্ষণ কবেছে বেশি। গোলাভরা ধান, মুখে মুখে হাসি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু এখন একটা স্বপ্নেব কাহিনী। সেই স্বপ্নজগৎকে বাস্তবে রূপান্তরিত কবেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেণের মেয়েতে।

ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বদা তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন নি সত্য কথা। তবে

'লেখক নির্দিষ্ট স্থান কালেব বেড়াকে একটু আধটু সরিযে নিলে ছবিগুলিকে ঐতিহাসিক বলা চলে।'১

—এইটিও অন্যতম সত্য। এজন্যেই দেখতে পাই বিহাবী দত্তেব সাগর-সঙ্গমে যাত্রার বর্ণনায় লেখক মঙ্গলকাব্যের নৌযাত্রার বর্ণনাটির অনুসরণ করেছেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি-শ্রীপতি ইত্যাদির বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেই কল্পনাকে আশ্রয় কবে বিহারী দত্তের সাগরসঙ্গমে যাত্রাপথ লিপিবদ্ধ। সাগবে ঝড়েব সাক্ষাৎলাভ এবং তা থেকে পবিত্রাণ মঙ্গলকাব্যের নায়কেব সাগরে বিপদেব সম্মুখীন হওয়াব সঙ্গে তুলনীয়। তথাপি মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় গতানুগতিকতা এবং একঘেয়েমি লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক বিবরণ অনেক সময়ই রসগ্রহণে বাধা জন্মায়। হরপ্রসাদ নিজস্ব রচনারীতির মাধ্যমে যাত্রাপথটি বাস্তবতায় ভাস্বর কবে তুলেছেন। লেখক বিগত যুগেব গৌববোজ্জ্বল অধ্যায়কে আত্মপ্রসাদের নিবিড়তায় উপলব্ধি করেছেন। সেকালের ধনী সমাজের কেবল পারাবত ওড়ানোর কাহিনী নয়, বিলাসব্যসনে সুখস্বপ্ন দেখার বিবরণ নয়, বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তাব প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যকেও হরপ্রসাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। মাঝি-মাল্লাদেব একান্ত অসহায় অবস্থাটিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

রূপকথার কল্পনাব জগতেব সঞ্চিত বসভাণ্ডার হরপ্রসাদের এ যুদ্ধ বর্ণনায় বিস্তৃত।

'বাগ্দীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায কেবল বাগ্দী, বাগ্দীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্দী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, সব বাগ্দী সাজ, বাগ্‌দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু বাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদেব কাজ, আর ঘোড়সওয়ারেরাও ডোম। দশহাজার বাগ্‌দী সাজিলে, সঙ্গেসঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজল। তাহারা আগে গিযা রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িযা দেশেব অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—

১. শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড), 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মৃগেল ঘাঘরা বাজে
বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া
সাড়া গেল বামন পাড়া।

ডোমদের সাড়া বামন পাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।'

এ বর্ণনা পাথুরে প্রমাণের নয়—রসিক মনের। পড়তে পড়তে শৈশব-স্মৃতি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও ছড়াকে এইভাবেই দেখেছেন। এই ছড়াগুলির পশ্চাতে যে ইতিহাস, নরনারীর হাসিকান্না অন্তঃশীলা তাকেই প্রকাশ করেছেন অপরূপ ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ। স্কট যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে বড়ো বড়ো 'অথরিটি'র উপর নির্ভর না করে জনজীবনে প্রচলিত গাথাগল্প, ছড়া-গানকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন (এমন কি Ivanhoe নামটি পর্যন্ত) সে রকম শাস্ত্রী মহাশয়ও বেণের মেয়েতে লৌকিক গালগল্পগুলি, কল্পনাজল্পনাগুলিকে মর্যাদা দিয়েছেন। আমাদের স্তূপীকৃত সংস্কারের তরীতে পাল খাটিযে তিনি হাজার বছরের পুরানো বাংলাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন।

রূপকথার আঙ্গিক অবতারণা লেখকের সচেতন লিপিকৌশলের উদাহরণ। হরিবর্মদেবের শিকার-কাহিনীটিও তিনি রূপকথার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতে রাজাদের শিকার-কাহিনী পাই। হরপ্রসাদ সেই দুরবিস্তৃত ঘটনাবলীকে তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন। রূপকথার গল্প যেমন বলেন মা-দিদিমারা। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের একটি অংশ তুলে দিই—

'সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, কত রকম শব্দ করে, গান করে, আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ একদিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্ চিল্ চিল্ চিল্ শব্দ করিত। এক একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর একটার উপর ধাওয়া করিত।'

কেবল রূপকথার ভঙ্গী নয়, স্থানে স্থানে হরপ্রসাদ কথকতার আশ্রয়ও নিয়েছেন। বিশেষত ব্রাহ্মণ গাঞীগোত্র বিচারবিশ্লেষণের বর্ণনায়। ব্রাহ্মণদের কেবল যাজকতাবৃত্তিটিকেই তিনি প্রাধান্য দেন নি, ব্রাহ্মণেরা যে একাধারে 'শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুল্য ছিলেন' এইটিও তিনি বিশদ করেছেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ তুচ্ছ ঘটনাকেও অবহেলা করেন নি।

বিভিন্ন প্রশস্তিলিপি এবং কাব্যগ্রন্থে যে সমস্ত প্রায়-অপরিচিত নাম, সম্বোধনরীতি পাওয়া গেছে হরপ্রসাদ তাদের অবিকৃত রেখেছেন। যেমন বিহারীর ডিঙ্গার নাম মধুকর ; কোনো কোনো ডিঙ্গাতে লেখা ওঁ মণিপদ্মে হুঁ ; মূর্তির বিশেষণ কেয়ূরবান্, কর্ণককুণ্ডলান্, কিরীট, হিরণখরপুর, গ্রন্থ অভিসময়বিভঙ্গ ; ব্যক্তির সম্মানসূচক বিশেষণ, সম্বোধন করবার রীতি—শ্রীশ্রী১০৮ সিদ্ধাচার্য লুইদেব, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী১০৮ হরিবর্মদেব। ভবদেব ভট্টের উপাধি বালবলভীভুজঙ্গ, মন্ত্রের কথা—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং চং বং ইত্যাদি।—এইগুলি প্রাচীনত্বের দ্যোতক, কিন্তু উপস্থাপন-কৌশলে জীর্ণতার জোবরা পরিত্যাগ করে ভাস্বরতায় দীপ্যমান।

শ চী শ চ ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

বীরপূজা

শচীশচন্দ্র বীবত্বেব পূজাবী। 'বাঙ্গালীব বল' উপন্যাস তাব প্রমাণ। কিন্তু বাংলাব বীব বাজাব কাহিনী তখনও ইতিহাসচর্চাব অধীন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকেব মতো শচীশচন্দ্র বাজপুত-কাহিনী অবলম্বন কবলেন।—'বীব-পূজাতে রাজপুত জীবনপ্রভাত'। উপন্যাস লেখাব প্রচেষ্টা শচীশচন্দ্রেব এই প্রথম। 'সূচনা'তে তিনি জানিযেছেন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবে তাঁদেব শিক্ষাকে জনসাধাবণে প্রচাব করাই তাঁব উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল ১৩১২ সালে। পবে বর্ধিতাকাবে বইটিব দ্বিতীয় সংস্কবণ (১৩১৭) হয়। 'বীবপূজা' নামে অন্য একখানি গ্রন্থও ছিল।

জ্ঞাতিবিরোধ বাজপুতজাতিব চিবন্তন সমস্যা। এই সমস্যাকে অবলম্বন কবে শচীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ বচনা কবলেন। শচীশচন্দ্র টডের বইকে উপজীব্য কবেছিলেন। প্রমদা চবিত্র-অঙ্কনে শচীশচন্দ্র বিষবৃক্ষেব দ্বাবা প্রভাবিত হযেছেন। দেবেন্দ্র এবং হীরার নিদর্শন আছে দেবল ও ভবানীব চরিত্রে। ভ্রাতৃভক্তিব প্রভুভক্তিব পবিচয় পাই জনার্দনেব ভূমিকায়, পিতৃব্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ভবানী চরিত্রে।

রাজা গণেশ

শচীশচন্দ্রের 'রাজা গণেশ' নানা কাবণে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'বীবপূজা' ব্যর্থ বচনা। গতানুগতিকতা থেকেও বীরপূজা অব্যাহতি পায় নি। ববং স্বর্ণকুমাবীব 'দীপনির্বাণ' এইদিক থেকে প্রশংসাব দাবি রাখে। কিন্তু শচীশচন্দ্রেব দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বাজা গণেশ' লেখকের রচনাক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শচীশচন্দ্র রীতিমত কল্পনাব রঙিন দীপ জ্বাললেন।

ইতিহাসের মর্যাদা এই উপন্যাসে সর্বত্র বিরাজিত। শচীশচন্দ্র যে সময়ে তাঁর বইটি রচনা করেন সেই সময় ইতিহাসচর্চার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত।

ইতিহাসবিদ্যা নীরস তথ্য-অনুসন্ধিৎসুর গবেষণার বিষয় নয়। ইতিহাসচর্চার পশ্চাতে দেশের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি এসেছে। রাজা গণেশে তার প্রকাশ।

বইটিতে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান বর্ণিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দেশপ্রীতি, প্রজাবাৎসল্য, বীরোচিত নিষ্ঠা, অসমসাহসিকতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশে রাজা গণেশের চরিত্রটি উজ্জ্বল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণের উপর নির্ভর করে শচীশচন্দ্র রাজা গণেশ লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, শচীশচন্দ্রের উপন্যাসে সমসাময়িক যুগমনের পরিচয় আছে।

গ্রন্থটিতে হিন্দুগৌরবগাথা কীর্তিত। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর লেখকের বিদ্বেষ নেই। মুসলমান জাতির প্রতীক জোনাব আলি খাঁ। জোনাব আলি খাঁ সর্বতোভাবে গণেশের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যখন সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে গণেশ মুসলমান পতাকাকে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত, তখন—

'সকলে বিস্মিতনয়নে দেখিল, জোনাব খাঁর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে। তিনি ইসলাম পতাকা পানে চাহিলেন, একবার গণেশনারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর চৈতন্য হারাইয়া ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।'

এই একটি মাত্র দৃশ্যে শচীশচন্দ্র মানুষের বীরত্ব ও সংস্কারকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। চরিত্রের স্বকীয়তায় জোনাব খাঁ তাঁর দুর্বলতা সবলতা নিয়ে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। রাজা গণেশকে লেখক আদর্শ রাজা হিসেবে দেখেছেন। তৃতীয় খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে সুলতানের মৃত্যুদৃশ্যে রাজা গণেশ এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। রাজা সুলতান-অনুগত। কিন্তু অত্যাচারী রাজপুত্র আলিমের ঘোর বিরোধী। সুলতানের অনুরোধেও রাজা কূটনীতির আশ্রয় না নিয়ে আলিমের বিরোধিতা করলেন। এ-বিরোধিতায় রাজা গণেশের চরিত্র প্রকৃত রাজোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই অংশটি নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ দৃশ্যটিকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা এবং দেশানুরাগে দৃশ্যটিকে দীপ্তিময় করে তুলেছে।

আগে বলেছি গ্রন্থটিতে শচীশচন্দ্রের সমসাময়িক কালের মনোভাব বর্তমান। তার পরিচয় পাই বাঙালির মহিমাকীর্তনে। ইতিপূর্বে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির বিশিষ্টতা নিরূপণ করেছিলেন। শচীশচন্দ্র উপন্যাসে তাকেই ভাস্বর করে তুললেন। কোনো কোনো জায়গায় বক্তৃতার মতো শোনালেও লেখকের

এই বাঙালি-প্রীতি অশ্রদ্ধেয় নয়। তবে রানী করুণাময়ীর (রাজা গণেশের পত্নী) কাছে সন্ন্যাসীর উপদেশ কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। মন্দাকিনী (মলয়া) রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। স্ত্রীলোককে পুরুষবেশে সাজিয়ে যত্রতত্র বিচরণ করানো শচীশচন্দ্রের অন্য উপন্যাসেও সুলভ। মন্দাকিনী চরিত্রে শচীশচন্দ্র অনেক কিছু দেখিয়েছেন, কিন্তু সব-কিছুই আরোপিত—চরিত্র থেকে উদ্‌ভূত নয়।

রানী ব্রজসুন্দরী

'রানী ব্রজসুন্দরী'তে কালাপাহাড়ের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত। কালাপাহাড়ের ইতিকথায় শচীশচন্দ্র ঔপন্যাসিকের কল্পনা যোগ করেছেন।

সুলেমান করনানীর কন্যাকে বিবাহ করলেন 'কালাচাঁদ'। হিন্দুধর্মচ্যুত হযে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ স্বধর্মদ্রোহী হলেন। করনানী কালাচাঁদের নাম দিলেন কালাপাহাড। কালাপাহাড়ের হিন্দুবিদ্বেষ বাঁকা পথ নিলে। হিন্দুর দেবদেবী যাগযজ্ঞে অবিশ্বাসী কালাচাঁদ মন্দির ধ্বংসের আযোজন করলেন। উড়িষ্যা অভিযানের মূল ছিল এখানে।

বইটিতে বিরোধের সূত্র দুটি। এক, উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে বাংলার পাঠান সুলতানের। দুই, কালাচাঁদ ও ব্রজবালার। অপর কতগুলি গৌণ বিরোধের সূত্রও রয়েছে। যেমন কালাচাঁদের বন্ধু গদাধরের সঙ্গে ব্রজবালাকে নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ। উড়িষ্যার জগন্নাথ মহিমার অবতারণা। কালাপাহাড় সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য প্রামাণিকরূপে পেযেছি লেখক তাকে যথাযথ রূপ দিযেছেন।[১]

উপন্যাসটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। কালাচাঁদ এবং ব্রজবালার জীবনে এই পাঞ্চভৌতিক প্রভাব দেখানো হয়েছে। রানী ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের ঘটনাটি সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করেছে। শচীশবাবু সম্ভবত রানী ব্রজসুন্দরীর মনের দোলাচল-চিত্ততাকে পরিস্ফুট করবার জন্য বিষয়টিকে এরকম রূপ দিয়েছেন।

বইটিতে কালাপাহাড়ের জীবনী বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণনায়ও লেখকের উল্লাসের অবধি নেই। দুইটি বিষয় সমান প্রাধান্য পাওয়াতে উপন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের দুটি ঘটনাপ্রবাহ সমান্তরাল রেখায়

১. J. N. Sarkar, *History of Bengal, Vol. II*

প্রবাহিত। এদেব মিলনবিন্দু কোথাও নেই। ঘরোযা কাহিনী ইতিবৃত্তের আধাবে স্থাপিত হয় নি। এইটি উপন্যাসেব অন্যতম ত্রুটি।

এই উপন্যাসে উডিষ্যার প্রাচীন কীর্তিব প্রতি লেখকেব সশ্রদ্ধ প্রশংসা 'সীতাবামে'র কথা স্মবণ কবিয়ে দেয। 'বসন্তেব কোকিলে'র অনুকরণে দীর্ঘ খেদোক্তিও দেখতে পাই। বমেশচন্দ্রেব মাধবীকঙ্কণের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি দেখি কালাচাঁদেব কবনানীব কার্যভাব গ্রহণেব সময। নবাবনন্দিনীব প্রেম, দণ্ড, আত্মসমর্পণ বোমান্সেব লক্ষণাক্রান্ত। কালাচাঁদেব জীবনে পবিবর্তন এনে দিয়েছিল নবাবনন্দিনী, কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনেব কোনো পবিচয় না থাকাতে নবাবনন্দিনী লেখকেব সহানুভূতি বঞ্চিত।

কালাপাহাডেব প্রতি লেখকেব সমবেদনাব অন্ত নেই। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে শচীশচন্দ্রেব কাহিনীতে কালাপাহাডের ধ্বংসাত্মক কার্যেব সমর্থন নেই। শচীশচন্দ্র সংস্কাববিমুখ ছিলেন না। কিন্তু তিনি কালাপাহাডকে ধর্মান্তবেব বিধানও দিতে পাবেন নি।

কালাপাহাডেব দ্বিতীয স্ত্রী ভূপবালা (বুনা, ব্রজবালাব ভগ্নী) আদর্শবাদেব চূড়ান্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীব বল

'বাঙ্গালীব বল' (১৩১৮) এককালে বিশেষ খ্যাতি পেযেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পর বাঙালিব খ্যাতি সাবা ভাবতে ছডিযে পডেছিল। গোখ্‌লেব চিবস্মবণীয উক্তিব কথা বাঙালি স্মবণে রেখেছিল। কিন্তু ভেদনীতিই ছিল বাজকুলেব অস্ত্র। এই অবস্থায় শচীশচন্দ্র তাঁব বই লিখলেন। বইটির ঘটনাকাল ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দেব। প্রেবণাস্থল অবশ্যই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব কাল। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> 'ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। গিযাস উদ্দীন, বীবসিংহ, ফতেসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সাদক খাঁ, ধ্রুব গোস্বামী কাল্পনিক চবিত্র। ঘটনাক্ষেত্র আজও বর্তমান। গড়খাই, রানী-দহ, কালীমূর্তি আজও দৃষ্ট হয।
>
> কোনও সমালোচক পুস্তকখানি পডিয়া কোনও সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছিলেন, পুস্তকে তিনটি ভাব দৃষ্ট হয়। যথা—ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক।'

ঐতিহাসিক আলোচনা পবে কবছি। আধ্যাত্মিক অংশেব প্রকাশ ধ্রুব গোস্বামীব অবতারণায়। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব সর্বত্র। সে প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্রও নয়। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকেই উৎসৃষ্ট। বেলাবিবির চরিত্রে 'কপালকুণ্ডলা'র

মতিবিবির ছাপ স্পষ্ট। মতিবিবির মতোই সে সুন্দরী, নায়কের প্রতি তার প্রেম দুর্নিবার্য। সেও হিন্দু, কিন্তু যবনী বলে পরিচিতা। দিল্লীতে তারও গতাগতি। তফাৎ শুধু বেলাবিবির আত্মত্যাগে। মতিবিবির ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন ছিল না। বেলাবিবি যুগাদর্শে পরিকল্পিত। সে তার দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেয়। রণক্ষেত্রে প্রেমিকের পাশে দাঁড়ায়। যুদ্ধ করে এবং একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন স্বল্প।

মায়া এবং বালার (চন্দ্রবালা) চরিত্র সম্পূর্ণ রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। মায়া যেন শ্রী-র (সীতারাম) প্রতিরূপ। মায়ার জন্মরহস্য অজ্ঞাত। উপন্যাসে সে নিয়তির বেশে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থের আকর্ষণীয় চরিত্র নর্মদা। এ চরিত্রটির আবির্ভাব স্বল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু পাঠকের মনে সে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।

বীর সিংহ ফতে সিংহ আদর্শ বাঙালি বীর। এই বীরদ্বয়ের পতন করুণ, কিন্তু মহৎ সম্ভাবনায় মণ্ডিত। ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে সমকালীন ভাবনার পরিচয় লভ্য। সমসাময়িক রাজনীতির অন্যতম প্রভাব ধ্রুব গোস্বামীর রাজ্য-পরিকল্পনায়। আগে বলেছি, বইটির মূল প্রেরণা স্বদেশী উদ্দীপনা থেকে এসেছে। তার প্রমাণ সর্বত্র। একটি উদাহরণ দিই। ফতে সিংহ বীর সিংহকে বলেছেন—

'এখন বুঝিয়াছি যে, আমরা দেশের সেবা করিতে আসিয়াছি।—ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া দেশের মঙ্গল কামনায় সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি।'

উত্তরে বীর সিংহ বলেন—

'এখন তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। দেশের পূজা আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ধর্ম। রাজ্য আমাদের সংসার—প্রজা আমাদের সন্তান। অস্ত্র ও অর্থ পূজার উপকরণ—রাজ পরিচ্ছদ কৌষিক বস্ত্র।'

বলা বাহুল্য, ফতে সিংহ বীর সিংহের উক্তির মধ্যে সে-যুগের বিপ্লবীদের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে অনেকগুলি স্বপ্নের ঘটনা আছে। নর্মদার স্বপ্নবৃত্তান্ত কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্তের অনুরূপ। অজয় নদীর বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। মায়ার বাস্তবজ্ঞানের অভাব, দেবদ্বিজে ভক্তি 'কপালকুণ্ডলা'র অনুরূপ। জয়ার ঈর্ষাবিদ্বেষ স্বাভাবিক, কিন্তু পরিণতি ফিকে।

শচীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক পরিবেশটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালির উত্থান হয়তো কাল্পনিক, কিন্তু সেনাবাহিনীর বর্ণনায়, সমরক্ষেত্রের পরিবেশ-সৃষ্টিতে এবং নদীতীরে সংগ্রামের চিত্র-রচনায় শচীশচন্দ্রের কৃতিত্ব আছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিশেষত্ব হচ্ছে শচীশবাবু কোথাও যবনবিদ্বেষ দেখান নি

হ রি সা ধ ন মু খো পা ধ্যা য়

এক সময়ে হবিসাধন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন।

হবিসাধন মুখোপাধ্যাযেব কিছু উপন্যাসের হিন্দী সংস্কবণ বাংলা উপন্যাস প্রকাশের অচিবকাল মধ্যেই ঘটেছে। এক-একটি সংস্করণ কয়েক মাসেব মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। হবিসাধনবাবুব লেখা অজস্র। কিন্তু বৈচিত্র্য বেশি নেই। একই সমস্যাকে ঘুবিয়ে ফিবিযে বিভিন্ন গ্রন্থ বচিত হযেছে। প্রকাশকবা গল্পখোব পাঠকেব দিকে তাকিয়ে এই-সমস্ত বই ছাপিয়েছেন, নগদ বিদায়ীও পেযেছেন। ফলে সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সস্তা, গতানুগতিক হয়ে পডল। প্রকাশকের 'সিরিজ'-এব দাবি মেটানোই ছিল যেন ঔপন্যাসিকদেব প্রধান কাজ। বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসেব যেমন সিরিজভুক্ত হয়েছিল তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসেও দেখা দিল বঙ্গমহাল সিরিজ, আট আনা সিবিজ (এই সিবিজে অনৈতিহাসিক গল্পও আছে)।

রঙ্গমহাল

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়েব 'বঙ্গমহাল' (১৯০১) এক দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাবণ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসেব ভূমিকা হিসেবে এই বইটিকে গ্রহণ কবা যেতে পাবে। বঙ্গমহালে মোট ছয়টি গল্প আছে। রাজপুত এবং মোগল বাদশার কাহিনীই গল্পগুলির উপজীব্য। ঐতিহাসিক ভিত্তি গল্পগুলিব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু পরিবেশ, নামধাম, রাজা বাদশা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গল্পগুলির পশ্চাতে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও লেখকের রচনাগুণে এগুলিতে রোমান্সেব খাঁটি সুরটিব সঙ্গে আমাদেব পবিচয় করিয়ে দেয়। গল্পগুলি এই—সেলিমা-বেগম, হিবণ্য মন্দির, পান্না-মহল, হীরক-বলয়, রত্ন মঞ্জিল, মতি-মিনার। নামগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায় অন্তঃপুরের চিত্র-রচনা করাই হবিসাধনবাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

নারীর প্রেমই গল্পগুলির প্রাণ। নারীর প্রেমের সাফল্যের পথে নানা

বাধা, নানা জটিলতা। হরিসাধনবাবু প্রেমিক-প্রেমিকার বিচিত্র মানসিকতার প্রকাশ করেছেন। গল্পগুলি বলবার ভঙ্গি কিছু পরিমাণে আবেগাত্মক। লেখকের সহানুভূতি পড়েছে সেখানে যেখানে নারী অসহায়, যেখানে নারীর যৌবন অপচিত।

রচনাকৌশলে হরিসাধন অভিনবত্ব দেখাতে পারেন নি। তিনি পুরানো আঙ্গিকই গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক বিভূতি, অন্তঃপুরের ছলনা ঈর্ষা, নিশীথে গোপন অভিসার, এ-সবই গল্পগুলিতে আছে। উঁচু সুরে বাঁধা নায়ক-নায়িকার আদর্শবাদী রূপও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু বইটির প্রধান আকর্ষণ গল্পরসে এবং নরনারীর ভাববিশ্লেষণে। হরিসাধনবাবুর পরবর্তী উপন্যাস-গুলিতে এই-সমস্ত ব্যাপারই লক্ষ্য করি। সেলিমা, নূরজাহান ইত্যাদিই অন্য নাম নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলিতে উপস্থিত। উপন্যাসগুলিতে ভাবদ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে লেখক আতিশয্যের পরিচয় দিয়েছেন। অযথা গল্পকে দীর্ঘ করেছেন, উপকাহিনীর উপর জোর দিয়েছেন। বঙ্গমহালের গল্পগুলিতে ভাবের আতিশয্য নেই এ কথা বলি না, কিন্তু গল্পের পরিসর ছোট হওয়াতে স্বভাবতই লেখকের দৃষ্টি ছিল গল্পের গতির দিকে। কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছবার চেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি যে-সকল নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন তারা অনেকেই রাজা কিংবা বাদশার বংশধর। কিন্তু নারী-মানসের সরল আন্তরিক সুরটি যে চিরন্তন খাতে প্রবাহিত তাকে হরিসাধন সুন্দররূপে ফুটিয়েছেন। পাঠক অতীতেও বর্তমানের নরনারীর প্রতিরূপ দেখতে পেয়ে অতীতের সঙ্গে একটা সাযুজ্য অনুভব করে।

হরিসাধনবাবু বঙ্গমহাল সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা। 'বঙ্গমহাল' বইটি সচিত্র। এই কারণেও পাঠকের কাছে এর আদর হয়েছিল।

শীশ্‌মহল

হরিসাধনবাবুর 'শীশ্‌মহল' সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। বইটি বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের প্যাটার্নে লিখিত। পাত্রপাত্রীর বক্তব্য নিজেরাই উপস্থিত করেছে। উপন্যাসটির দুটি অংশ। প্রথম তস্‌বীরের মূল্য, দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ। তস্‌বীরের মূল্য অংশে আকবর এবং পাঠান বীর সোহানীর দ্বন্দ্ব বর্ণিত, ঋণ পরিশোধে মালববীর রাজবাহাদুর এবং আকবর-সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁর

দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ভাসা ভাসা ধরনের। কাহিনীর মূল অংশ হল সোহানীর পত্নী গুল্‌সানা ইস্কান্দার খাঁর প্রেম এবং পরে মানবেশ্বরের কন্যা রুবিয়ার প্রতি ইস্কান্দারের প্রেম।

কাহিনীর প্রথম অংশে চমৎকারিত্ব আছে। এ চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে ইস্কান্দার খাঁর রূপতৃষ্ণা বর্ণনায়, কুলসম-শেখজীর সম্বন্ধে, গুল্‌সানার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পতিপ্রেমের অবিচলতায়। কাহিনীর মধ্যে আকস্মিকতার স্থান আছে সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেরকম রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ তেমন কিছু দোষাবহ নয়। সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁর শৌর্যবীর্য ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে রূপমোহ কিভাবে বীর নায়কের পতনকে অনিবার্য করে তোলে তারও পরিচয় এ গ্রন্থে আছে। ইস্কান্দার খাঁর সদাজাগ্রত সৈনিকবুদ্ধি, অতন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠা সব-কিছুই গুল্‌সানার উপস্থিতিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নারীপ্রেমের এই দাহ ও দীপ্তি লেখক যথাযথ বর্ণনা করেছেন। কুলসমের প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং তাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তর্দাহের পরিচয়ে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। এই ঘটনার সমাবেশে রোমাঞ্চকর ঘটনারও একটা বাস্তব ভিত্তি রচিত হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত দুর্বল। এই অংশে প্রেমের সেই চিরাচরিত বর্ণনা—রূপমোহ, মুহুর্মুহু আকস্মিক ঘটনার সূত্রপাত, রঙ্গমহলের রহস্য বর্ণনা। সবগুলিই একঘেয়ে, গতানুগতিক। শাহজামান ফকিরের ঘটনাটির মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। ফকিরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বেমানান।

গুল্‌সানার চরিত্র এই অংশে অলৌকিকতার সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে নারী কোমলে-কঠোরে দাহে-দীপ্তিতে প্রথম অংশে বাস্তব রূপ লাভ করেছে, পরবর্তী অংশে তার আদর্শবাদ পরোপকারবৃত্তি এবং ধর্মাশ্রয় একান্ত অপ্রত্যাশিত। চরিত্রটির পরিণতি কার্যকারণহীন।

তস্‌বীরওয়ালীর ঘটনাটি অবশ্যই রাজসিংহের অনুকরণে রচিত। সোহানীর দুর্গে প্রবেশের পর ইস্কান্দার কর্তৃক দুর্গের সৌন্দর্যবর্ণনা অশোভন। সৈনিকের জীবনে এ-জাতীয় ঘটনা সম্ভব নয়। ঘন ঘন স্বপ্নদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ।

নূরমহল

'নূরমহল' (১৩২০) বৃহৎ উপন্যাস। মোট উনসত্তরটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। নূরমহলের কাহিনী নূরজাহানকে কেন্দ্র করে রচিত। নূরজাহান, শের

আফগান, যোধবাঈ, আকবর ইত্যাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নূরজাহানের বিবাহ-পূর্ব জীবনের কাহিনীই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য। শের আফগানের সঙ্গে তাঁর প্রেমের লীলা গ্রন্থটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। আকবর-পুত্র সেলিমের নূরজাহানের প্রতি প্রেম সে প্রেমলীলায় আবর্ত সৃষ্টি করল। লেখক নূরজাহানের দোলাচলচিত্ততা পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। 'নিবেদন' অংশে লেখক বলেছেন—

নূরমহল প্রকাশিত হইল। ইহা ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম জীবনের উজ্জ্বল চিত্র। "মেহের উন্নিসা" কি করিয়া "নূরমহল" হইয়াছিলেন, তাহাই এ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে চিত্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।'

মেহের উন্নিসার এই বিবর্তন সম্পূর্ণ প্রেমের ইতিহাস। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহের জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন। লেখকের নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে সেলিমার ঘটনার অবতারণায়, মোগল হারেমের বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনায়। গভীর নিশীথে রঙ্গমহলের অপরিচিত, রহস্যময় দৃশ্যের বর্ণনার দ্বারা লেখক বিস্ময় সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। শের আফগান, সেলিমের প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনায়ও লেখক উৎসাহ বোধ করেছেন। এতে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়ে নি। বরং অত্যন্ত শিথিল বর্ণনার দ্বারা লেখক কাহিনীটির গতি ব্যাহত করেছেন।

সেলিমার কার্যকলাপে চরিত্রোচিত সংগতি নেই। সে নিয়তি, এবং নিয়তির মতোই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্ন। আবুল ফজলের মৃত্যুর দৃশ্যটিতে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছে। মানসিংহের চরিত্র এ গ্রন্থে একটু ভিন্ন রকমের। লেখক আবুল ফজলের ইতিহাস পড়েছিলেন। অনেক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে তিনি আবুল ফজলের উপর নির্ভর দিয়েছেন।

'কঙ্কণচোর' (১৯১৬), 'লালচিঠি', 'মতিমহল', 'শাহজাদা খসরু', 'পান্নার প্রতিশোধ', 'দেওয়ানা' ইত্যাদি হরিসাধনের অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শরৎকুমার রায়

মোহনলাল

'মোহনলাল' (১৯০৬) সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রকাশকেব নিবেদনেব অংশটি উদ্ধাবযোগ্য।

'এই পুস্তক বহুদিন পূর্বে বচিত হইযা প্রায তিন বৎসব হইল মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইয়াছিল। নানা অনিবার্য কাবণে ইহাব প্রকাশে বিলম্ব ঘটিযাছে। ইহা বাঙলার মুসলমান পতন সময়েব চিত্র ও চবিত্র লইযা লিখিত। বর্তমান পুস্তকে ঐ সমযেব প্রথমাংশেব বিববণ বিবৃত হইযাছে। পুস্তকেব আকাব বৃহৎ হইযা পডায় এই গ্রন্থে তৎসমযেব সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান কবায় সুবিধা হইল না। তজ্জন্য ইহাতে যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও আখ্যানাংশেব ত্রুটি লক্ষিত হইবে তাহা ভবিষ্যতে পূবণেব চেষ্টা কবা যাইবে।' বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে এ ত্রুটি পূবণ কবা আব সম্ভবপর হয নি।

'মোহনলাল' গ্রন্থটিব আবম্ভ হযেছে উর্মিলা প্রসঙ্গ দিযে। কিন্তু উমীচাঁদই মুখ্য স্থান অধিকাব কবেছে। উমীচাঁদ প্রথমে বানী ভবানীব গৃহে থেকে রামকৃষ্ণেব কাছে অর্থলাভেব আশায় ছিল। এমন সময়ে সেখানে মোহনলাল-পত্নী উর্মিলা এল। উর্মিলা আশ্রয পেল। উমীচাঁদ উর্মিলাব রূপে মুগ্ধ এবং বামা দাসীব সাহাযে উর্মিলাকে হস্তগত করবাব চেষ্টা কবলে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। উমীচাঁদকে মুণ্ডিতমস্তক কবে বাজবাডি থেকে বহিষ্কৃত কবা হল। ওদিকে নবাব আলীবর্দী অন্তিম শয্যায সিবাজকে তাঁর উত্তরাধিকাবী করে যাবাব সংকল্প কবেন। এতে ঘাসিটি বেগম ক্ষুব্ধ হযে ঢাকাতে রাজবল্লভেব নিকট পত্র প্রেবণ কবলেন। সে পত্র সরাইখানায উমীচাঁদেব হস্তগত হল। সেই সময়েই মীবজাফবপুত্র মীবণেব সাক্ষাৎ পেয়ে চতুব উমী মীবণেব বন্ধু সেজে মুর্শিদাবাদে এল। মুর্শিদাবাদে এসে উমীচাঁদ আপন উন্নতিব চেষ্টায় লেগে বইল। সবল মীরণকে প্রলোভিত করে উমীচাঁদ অর্থ সংগ্রহ কবলে। ঘাসিটিব চিঠি দেখিয়ে সিবাজ, মীবজাফর ইত্যাদিব বিশ্বাস উৎপাদন করলে। মীরণ ইয়াবলতিফেব ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত ছিল। উমা এই সুযোগে মীরণকে

তারাসুন্দরীর কথা বললে। মীরণ উমীর কথায় বিশ্বাস করে তারাসুন্দরীকে পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ল। সিরাজের আদেশ ছিল রাজবল্লভকে বন্দী করা এবং ঘাসিটিকে নজরবন্দী করা। কিন্তু মীরজাফর রাজবল্লভ ও ঘাসিটি সিরাজের আদেশ অমান্য করলে। তখন সিরাজ উমীচাঁদ, ইয়ারলতিফ, মীরণের সামনে মীরজাফরকে ভর্ৎসনা করলে। নগর পাহারার জন্য ইয়ারলতিফ এবং তার সহকারী উমীচাঁদ নিযুক্ত হল। উমীচাঁদ সিরাজের কাছ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বন্দী করার জন্য দুখানি পরওয়ানা নিয়ে এল। ঘাঁটিতে পাহারা দেবার সময় একদিন তারাসুন্দরীর দাসী রামার সাক্ষাৎ পেল। মোহনলাল ঢাকা থেকে সিরাজ-সন্নিধানে আসার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, তখন সন্ন্যাসী ভৈরবানন্দ মোহনলালকে আশ্রয় দিলে। এই সন্ন্যাসী নাটোর-রাজবাড়ির প্রণম্য ব্যক্তি। সন্ন্যাসী মোহনলালের সম্যক পরিচয় জেনে উর্মিলাকে নিয়ে এলেন মোহনলালের কাছে। মোহনলাল উর্মিলাকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তারাসুন্দরীও একদিন দেখে গেলেন। এখন তারাসুন্দরী উর্মিলার খবর নেবার জন্য রামা দাসীকে চিঠি দিয়ে পাঠাল। সঙ্গে কিছু গহনাপত্র। রামা উমীচাঁদের ঘাঁটিতে বন্দী হল। উর্মিলাকে লেখা তারার চিঠি উমী হস্তগত করলে। তারা বন্ধুকে 'উমী' সম্বোধন করেছিল। উমীচাঁদ এর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলে। কেননা তারা যে এই চিঠি উমীচাঁদকেই লিখেছে তা মীরণকে বোঝানো যাবে। আবার উর্মিলার সংবাদও পাওয়া গেল। এইভাবে উমীচাঁদ এক দিকে নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করতে ও পরের সর্বনাশ করতে লাগল। এদিকে রাজা রামকৃষ্ণকে একদিন উমীচাঁদ গ্রেপ্তার করলে। রামকৃষ্ণ উমীচাঁদের এবম্বিধ উন্নতি দেখে বিস্মিত হল। উমীচাঁদ দুর্বল রামকৃষ্ণের নিকট তদীয় ভগ্নী তারাসুন্দরীর নামে কলঙ্ক রটাল। তারাসুন্দরী যে মীরণের প্রণয়াভিলাষী উমীচাঁদ তার প্রমাণ দিলে। সরল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করলে। উমীচাঁদ রামকৃষ্ণকে আট লক্ষ টাকা পাবার প্রতিশ্রুতিতে ফাঁড়ি থেকে ছেড়ে দিলে। উমীচাঁদ তার পূর্ব অপমান ভুলতে পারে নি। 'নিষাদ-উমীচাঁদ' উমরবেগের সহায়তায় এবং রামা দাসীর মাধ্যমে তারার সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হল। তারার স্বামী রঘুনাথ লাহিড়ী দরিদ্র। এই কারণে নির্ধন রঘুনাথ তারাকে সুনজরে দেখতেন না। উমরবেগের কাছ থেকে উমীচাঁদ রঘুনাথের সঙ্গে তারার মনোমালিন্য ছিল এইটি জানতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মীরণের তস্বীর এবং তারাকে লেখা

মীরণের চিঠি বামা দাসীকে দিয়ে রঘুনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে একদিন উমীচাঁদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভৈরবানন্দের আশ্রম আক্রমণ করলে। মোহনলালকে আত্মপরিচয় দিয়ে মোহনলালের বিশ্বাস উৎপাদন করে উমীচাঁদ মোহনলালকে সিরাজ সমীপে পাঠিয়ে দিলে। অসহায়া ঊর্মিলাকে ইত্যবসরে বামার সহায়তায় উমীচাঁদ হরণ করে নিলে। ঊর্মিলা উমীচাঁদের দ্বারা অপমানিত হল। উমীচাঁদ বাইরে গেলে ঊর্মিলা সাহসে ভর করে একাকী পালিয়ে গেল মোহনলালের উদ্দেশ্যে। মোহনলালের বাড়ি পৌঁছে মোহনলালকে সে দেখতে পেলে না। মোহনলালের আসার আশায় তার চিত্ত যখন অধীর সেই সময়ে ইয়ারলতিফ সংবাদ নিয়ে এল যে মোহনলাল সেই রাত্রিতে নবাবের কাছেই থাকবে। ইয়ার ঊর্মিলাকে দেখতে পেলে। 'বেওয়ারিস মাল'কে হস্তগত করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে তার আদরের বধূ বেগম থাকে। বধূ একবার ইয়ারের ভালোবাসায় সন্দিহান হয়ে তার নিজের দেশ লক্ষ্ণৌ চলে যাবে স্থির করেছিল। পথে অসীম কষ্ট সহ্য করে ভৈরবানন্দ সন্ন্যাসীর সহায়তায় সে ইয়ারের গৃহে পুনরায় ফিরে এসেছিল। সুতরাং বধূ এবং ঊর্মিলার মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। উভয়েই সন্ন্যাসী কর্তৃক উদ্ধার পেয়েছে এবং সন্ন্যাসীর প্রতি উভয়েই কৃতজ্ঞ।

বৃদ্ধ আলীবর্দীর মৃত্যুর সময়ে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। এক পক্ষে ঘাসিটি, রাজবল্লভ, মীরজাফর, অন্য দিকে সিরাজ। মোহনলাল সিরাজের সহায়ক। সিরাজ কৌশলে মতিঝিল আক্রমণ করে ঘাসিটিকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন। উমীচাঁদ বন্দী হল। এই প্রথম উমীচাঁদের পরাজয়। উমী নিজের বিপদ বুঝতে পারলে। সিরাজ উমীকে ছেড়ে দিলে। উমী গৃহে এসে দেখলে ঊর্মিলা পালিয়েছে। ক্রোধে উমী দিশেহারা হল। এমন সময় তার আত্মীয় হাজারিমল্ল রামকৃষ্ণের দেয় দশ লক্ষ টাকার হুণ্ডি নিয়ে এল। অর্থ পেয়ে উমী এই কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে। কলকাতায় গিয়ে পুনরায় ব্যবসা করবার তালে রইল সে। সিরাজের কাছে বিদায় নিতে গেলে সিরাজ তাকে কাজের ভার দিয়ে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিলেন। মীরজাফরও কলকাতায় ইংরেজদের সিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য উমীচাঁদকে পরামর্শ দিলেন। উমী মীরজাফরের কাছ থেকেও প্রচুর ধন পেলে। উমীচাঁদ বুঝে নিলে যে সিরাজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। তা নলিনীদলগত জলবৎ। উমীচাঁদ এইভাবে প্রচুর অর্থ লাভ করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলিকাতাভিমুখী

হল। কিন্তু যাবাব আগেও সে বানী ভবানীর বড়নগবেব বাড়ি আক্রমণ কবলে। ওদিকে সিরাজেব সঙ্গে ইংবেজদেব যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। কাশিমবাজাবেব কুঠী আক্রান্ত হলে ইংবেজবা উমীচাঁদকে দোষী সাব্যস্ত কবে তাব গৃহ আক্রমণ কবলে। ওদিকে মোহনলাল সিবাজকে সিংহাসনে নিষ্কণ্টক জেনে উর্মিলাব খোঁজে এল। সন্ন্যাসীব আশ্রমে এসে উর্মিলাকে দেখতে পেলে না। মোহনলাল পবে উমীচাঁদেব সমস্ত চক্রান্ত জানতে পাবলে। ক্রোধে অধীর হয়ে মোহনলাল কাশিমবাজাবেব কুঠী আক্রমণ কবতে গিযে উমীচাঁদেব গৃহে উপস্থিত হল। উমীচাঁদকে নিহত কবতে উদ্যত হলে উর্মী তাব পদতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মোহনলালও যুদ্ধ কবতে কবতে আহত হয়ে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান হলে দেখতে পেল সে বাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভেব গৃহে। সেখানে কৃষ্ণবল্লভ এবং তাব ভগ্নী (মোহনলালেব বাগ্‌দত্তা) ও মাতা ইংবেজেব বন্দী। কৃষ্ণবল্লভেব ভগ্নী শোভা মোহনলালেব নিকট তাব প্রণয় নিবেদন কবে ইহলীলা ত্যাগ কবলে। মোহনলাল উদ্‌ভ্রান্তেব মতো চলে এল। তাব পব বড়নগবে তাবাসুন্দবীব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলে। তাবাব স্বামী বঘুনাথও স্ত্রীব উপব অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ কবে জর্জবিত হচ্ছিলেন। পবে তিনিও মাবা যান। বামকৃষ্ণ ভগ্নীব কলঙ্ক বিশ্বাস কবেছিলেন। জগৎ-সংসাব ত্যাগ কবে বৈবাগ্যসাধনে মুক্তি এই তিনি একমাত্র আচবণীয় ধর্ম মনে কবলেন। বানী ভবানীব আব বিশেষ কোনো সংবাদ গ্রন্থে নেই।

মোহনলাল সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং বইটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসেব নিদর্শন। সিবাজদ্দৌলাব সিংহাসন লাভ কি সংকটময় মুহূর্তে ঘটেছিল তাব বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকেছেন শবৎবাবু। ইতিহাসেব বঙ্গমঞ্চে যে কয়টি পাত্রপাত্রীকে শবৎবাবু উপ-স্থাপিত কবেছেন তাদেব প্রত্যেকেবই চবিত্র-বিশ্লেষণেব মধ্য দিয়ে শরৎবাবু বাজ-নীতিব জটিলতা এবং অনিশ্চযতাকে ফুটিয়েছেন। বস্তুত পলাশিব যুদ্ধ বাঙালির জীবনে একটি বেদনাময স্মৃতি। অতীতের সে করুণ ইতিহাস প্রকাশে সবচেযে বড় বাধা উচ্ছ্বাস। নবীনচন্দ্র সেন তাঁব পলাশিব যুদ্ধ কাব্যে সে স্মৃতিকে মূর্ত কবেছেন। কিন্তু তাঁব উচ্ছ্বাসেব তরঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই 'পলাশিব যুদ্ধে'র সাহিত্য-রূপটি ফোটে নি। তথাপি নবীনচন্দ্রেব মহত্তম কীর্তি হচ্ছে মোহনলাল-পবিকল্পনাব মৌলিকতায়। মোহনলালের মধ্য দিয়ে বাঙালির বীরত্বপিপাসা অনেকখানি মিটেছিল। শবৎবাবুর বইটিব পশ্চাতে নবীনচন্দ্রেব পলাশির যুদ্ধেব—বিশেষ করে ঐ কাব্যেব মোহনলাল চরিত্রটির—প্রেরণা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ

নেই। শরৎবাবুর কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি কোথাও উচ্ছ্বাসের দ্বারা সীমা ছাড়িয়ে যান নি। তাঁর ভাষা পর্বতের চূড়া স্পর্শ করে না। সানুদেশেই তার অধিষ্ঠান। কিন্তু মানবভাগ্যের করুণমধুর রূপটি প্রকাশ করতে এই ভাষাই সক্ষম। অশ্বারোহীর মতো তার গতি উদ্দাম নয়, এ ভাষা পদাতিকের মতো। এ ভাষার গতি সতর্ক কিন্তু অব্যর্থসন্ধানী। লেখক উমীচাঁদ, উমর, মীরণ, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ খাঁর চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটি বাঁককে স্পষ্ট করেছেন। পাঠকও ষড়যন্ত্রের ভীষণতা, খলের ক্রুরতার স্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। শরৎবাবু চরিত্রগুলিকে যন্ত্ররূপে গড়েন নি। তিনি মানুষের খলতা নীচতার অন্তরালে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন থাকে তারও ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থের নাম যদিও মোহনলাল, তথাপি এই বইয়ের প্রধান চরিত্র, উমীচাঁদ। খল উমী মাকড়সার মতো তার লূতাতন্তু প্রসারিত করেছে। সকলেই উমীর ফাঁদে পা দিয়েছিল। উমীর গ্রাস থেকে কেউই মুক্তি পায় নি। রানী ভবানী, তারাসুন্দরী, উর্মিলা, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, মীরণ, উমর, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, মোহনলাল, সিরাজদ্দৌলা সকলেই উমীচাঁদের ছলনায় ভুলেছিলেন। শরৎবাবু উমীচাঁদের পাপ প্রবৃত্তিকে এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন যে তা একাধারে যেমন বাস্তবসম্মত হয়েছে তেমনি অন্য দিকে সাহিত্যে পাপচরিত্র অঙ্কন-কৌশলের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই চরিত্রটি স্বতঃই সেক্সপীয়রের ইয়াগো এবং শাইলকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শরৎবাবু উমীচাঁদ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঐ দুটি চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উমীচাঁদের "চিঠি"র বৃত্তান্ত ইয়াগোর রুমাল প্রদর্শনের দ্বারা ওথেলোর ঈর্ষা উৎপাদনের অনুরূপ, অর্থলিপ্সা শাইলক সদৃশ।

গ্রন্থটির ত্রুটিবিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করতে হয়। রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য এবং শ্রীজী ও ভৈরবানন্দ সন্ন্যাসীর কাহিনী অতিপল্লবিত। বিশেষত মূল কাহিনীর সঙ্গে এর বিশেষ যোগ নেই। উপন্যাসটির শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদে ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যায়। উমীচাঁদের কলিকাতা গমনের পর তার কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। উর্মিলারও বিশেষ কোনো সংবাদ পাই না। পাঠকের অতৃপ্তিও সেইখানে। রাজবল্লভের কন্যা শোভার কাহিনী গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। মোহনলাল চরিত্রটি আদর্শবাদের দ্বারা রঞ্জিত।

দুর্গাদাস লাহিড়ী

রানী ভবানী

দুর্গাদাস লাহিড়ীব 'বানী ভবানী' (১৩১৬) সমসামযিককালে খ্যাতি পেযেছিল। পনেবো দিনেব মধ্যে বইটিব দ্বিতীয় সংস্কবণ বাব হয। ১২৯১ সালে লেখক সংক্ষেপে বানী ভবানী (দ্বাদশ নাবী)ব জীবন আলোচনা কবেছিলেন। কিছুকালেব মধ্যেই হাবাণচন্দ্র বক্ষিতেব 'বানী ভবানী' প্রকাশিত হয। কিন্তু হাবাণচন্দ্রেব গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বস্তুই ছিল প্রধান। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে দুর্গাদাসবাবুব গ্রন্থখানিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কবে।

মোট দুটি খণ্ডে বানী ভবানীব বিবাহ থেকে তাঁব শেষ জীবন পর্যন্ত গ্রন্থে স্থান পেযেছে। বামজীবনেব পুত্রবধূ বানী ভবানী। বামজীবনেব ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ এবং বামকান্তেব মধ্যে শত্রুতা ছিল। এই শত্রুতা রামজীবনেব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে বাডতে থাকে। বামকান্ত অত প্যাঁচ বুঝতেন না। তিনি ছিলেন উদাব কিন্তু চঞ্চল। দেওয়ান দযাবামই সম্পত্তি দেখতেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদেব চক্রান্তে বামকান্ত দেওয়ানকে পদচ্যুত কবলেন। বাজ্য হাবিযে বামকান্তের চেতনা হল। নবাবদববাবে গিযে তিনি দেওযানকে খুঁজে বাব কবলেন। এ দিকে দেবীপ্রসাদ নাটোবেব বাজ্যাধিপতি হয়ে অত্যাচাব নিপীডন কবতে লাগল। দেওয়ান দয়াবাম বামকান্তেব শোচনীয় অবস্থা বুঝতে পারল। প্রভুভক্ত দেওয়ান বামকান্তেব সাহায্যে এগিয়ে এল। দয়াবামকে বানী ভবানী তাঁব গহনা দিলেন। দযাবাম নবাব আলিবর্দীকে বলে কয়ে দেবীপ্রসাদকে বন্দী কববাব জন্য বাজী কবালেন। নবাব সৈন্যসামন্ত গিয়ে দেবীপ্রসাদেব বাজ্য আক্রমণ করল। দেবীপ্রসাদ পবাজিত হয়ে বন্দী হল। বামকান্ত পুনবায় নাটোব রাজ্য পেলেন। বানী ভবানীর অনুবোধেই বামকান্ত দযাবামকে সাহায্য কবতে বলেছিলেন। সুতবাং এবাব থেকে রানী ভবানীব পরামর্শ যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে থাকে। বানী নানা সৎপবামর্শ দিয়ে, জনহিতকব কার্য করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। সিবাজের নবাব হবার পর যখন দেশেব প্রতিনিধিবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল তখন রানী ভবানী এদের ষডযন্ত্রের ফাঁক ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু রানী

ভবানীর পরামর্শ উপেক্ষিত হল। 'ইংবেজ বাজ্য জয় কবলে। বণিকেব মানদণ্ড শাসনদণ্ড রূপে দেখা দিতে লাগল। বানী ভবানীব বাজ্যেব উপবও শ্যেনদৃষ্টি পডল। বানী বাজ্য হাবাতে আবম্ভ কবলেন। শেষ জীবনে তিনি অশেষ দুঃখ পেয়েছিলেন।

বানী ভবানীব আত্মন্ত জীবন-কাহিনী বাংলাদেশেব ঐতিহাসিক ঘটনা-বর্তেব এক স্মবণীয় অধ্যায। পলাশিব যুদ্ধে নাটোবেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কি ছিল সে নিযে ঐতিহাসিক গবেষণাব এখনো শেষ হয নি। অথচ বাজনৈতিক উত্থানপতনেব সঙ্গে নাটোবও আবর্তিত হযেছিল এ কথা ইতিহাসসম্মত। সেই কাবণে লাহিডীমশায সিবাজেব নবাবীপ্রাপ্তি এবং পলাশি-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবেছেন। মূল কাহিনীব সঙ্গে নবাবী আমলাতন্ত্রেব যোগসূত্রটি দেখানো হযেছে।

দুর্গাদাস লাহিডীব গ্রন্থেব নাম বানী ভবানী। কিন্তু বানীব ঘটনাবলীব সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাব যোগাযোগ ক্ষীণসূত্রে যুক্ত। এজন্য বানীব চবিত্রটি ভালো কবে ফোটে নি। কেবলমাত্র দানধ্যান, উৎসব-অনুষ্ঠানেব কাহিনী বানীব মহত্ত্বেব পবিচয দেয সন্দেহ নেই, কিন্তু এব সঙ্গে ঐতিহাসিক আবর্তেব ধ্বনিটি ক্ষীণ, শিথিলাবিন্যস্ত।

বইটিতে যে বঙ্কিমচন্দ্রেব আনন্দমঠেব অনুকবণ আছে তাব প্রমাণ সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। আনন্দমঠেব 'স্বামী'দেব অনুকবণে দুর্গাদাসবাবুও সন্ন্যাসী আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবেছেন—হিন্দুবাজ্য পুনরুদ্ধাবেব স্বপ্ন এই-সকল সন্ন্যাসীবাও দেখেছেন। এব মধ্যে একটি চবিত্র অঙ্কনে দুর্গাদাসবাবু বিশেষ কৃতিত্বেব দাবি করতে পাবেন। সে কৃত্তিবাস। বানীব পিতা আত্মাবামেব কর্মচারী কৃত্তিবাস যেভাবে প্রভুভক্তি এবং তাবাকে বক্ষা কববাব জন্য আত্মবলি দিযেছে তা সর্বকালেব পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ কবে। ছিযাত্তরের মন্বন্তব, সিবাজেব অত্যাচাব, বাজনৈতিক ষডযন্ত্র ইত্যাদিব মধ্যে ঐতিহাসিক পবিবেশটি মন্দ ফোটে নি। কাহিনীটি শিথিল না হলে উপন্যাসটিব উৎকর্ষ বাডত।

রাজা রামকৃষ্ণ

'রাজা রামকৃষ্ণ' ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'রানী ভবানী' লেখবার

সময়েই দুর্গাদাস লাহিড়ীর রানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের জীবনী লেখবার ইচ্ছে ছিল। সেই কারণে সেই সময়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

গোপাল নামে ছেলেটি কিভাবে ধীরে ধীরে সংসারধর্ম ছেড়ে দিয়ে কালীসাধক হয়েছিলেন তারই জীবনবৃত্তান্ত লিখতে দুর্গাদাসবাবু উৎসাহী হয়েছিলেন। গোপালের রানী ভবানী প্রদত্ত নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের গোড়া থেকেই সংসারবিরাগ দেখা যায়। রানী সেই কারণে তাকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু সংসার-আসক্তি রামকৃষ্ণের হল না। বাংলাদেশে তখন বড়ই দুর্দিন। সিরাজের পতনের পর মীরজাফর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তার পর ইংরেজের আশ্রয়পুষ্ট নবাবরা বাংলাদেশ শোষণ করতে লাগলেন। রানী ভবানীও ইংরেজের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। রামকৃষ্ণের সম্পত্তি ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে গেল। এক দিকে সংসার অন্য দিকে অধ্যাত্মলোকের প্রতি আকর্ষণ। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে রামকৃষ্ণ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন। পরিশেষে কালীর আশ্রয়-ছায়াই তিনি সম্বল করলেন। রানী ভবানীর মধ্যেই তিনি মাতৃশক্তি প্রত্যক্ষ করলেন।

গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। পাঁচটি খণ্ডের আরম্ভেই গীতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং গীতোক্ত ধর্মসাধনার বীজই রামকৃষ্ণের জীবনে কিভাবে প্রকাশ পেল তার ইতিকথন হচ্ছে এই উপন্যাস।

এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মীরজাফর ভূমিকা। পাপাত্মার পরিণাম দেখিয়ে দুর্গাদাসবাবু জাতিকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন। এইসঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের কথা উল্লেখ করতে হয়। গ্রন্থে নন্দকুমারের স্থান খুব বেশি নয়। কিন্তু নন্দকুমারের দোলাচলচিত্ততার বাস্তবানুগ ছবি সুন্দর ফুটেছে। সতীত্বের আদর্শ রূপ ফুটেছে রামকৃষ্ণর স্ত্রী সুন্দরীর মাধ্যমে। ধর্মের উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয়েছে রামকৃষ্ণের সর্বস্বত্যাগের মধ্যে, আর সনাতন ধর্ম কীর্তিত হয়েছে শ্রীজীব দ্বারা।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'লক্ষ্মণ সেন' (১৯২০) উপন্যাসে জয়দেব পদ্মাবতী কাহিনী আছে। লক্ষ্মণ সেন এবং তার বিপর্যয় বর্ণনায় কাল্পনিকতার আশ্রয়ই বেশী।

ব ঙ্কি ম - প র ব র্তী অ ন্যা ন্য ঔ প ন্যা সি ক

হারাণচন্দ্র রক্ষিত

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' (১৩০৪) প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের পর প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা দেখা গেল। এর মধ্যে সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হারাণচন্দ্রের অবলম্বনও ছিল এই গ্রন্থটি। কোথাও উল্লেখ না থাকলেও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যও যে হারাণচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই। গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যই তার প্রমাণ। 'কায়স্থ বংশাবলী' থেকেও হারাণচন্দ্র তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভূমিকায় হারাণচন্দ্র বলেছেন—

'বাঙ্গালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন না,—তাই এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা। উপন্যাসের যথাসাধ্য পরিপুষ্টির জন্য, আমাকে অনেকস্থলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কোথাও সত্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। খুব বড় একটা আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যতটা ইতিহাসের গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া অনিবার্য হয়, আমি ততটা গিয়াছি মাত্র। খুঁটিনাটি ধরিয়া এ কথার বাদানুবাদ করিলে, হয়ত আমার এ মত টিকিবে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, উপন্যাস ইতিহাস নহে।'

সত্যচরণ শাস্ত্রীর বইয়ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে হারাণচন্দ্র নিঃসন্দেহ। সেই কারণে ইতিহাসের অপলাপ নেই বলে তিনি দাবি করেছেন। 'বড় একটা আদর্শ' মানে লেখক প্রতাপাদিত্যের মহিমা সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা বলতে রবীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অনুমান করি। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা লেখক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। ভূমিকাতে তিনি উপন্যাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। হারাণচন্দ্র ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়ের সঙ্গে প্রতাপের যে মনোমালিন্য দেখিয়েছেন তা অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের বিচ্যুতির প্রশ্নটি এখানে অপ্রয়োজনীয়। তথ্যকে লেখক যেভাবে যুগোচিত আদর্শে রূপায়িত করেছেন ঐতিহাসিকের আপত্তি সেখানে। প্রতাপাদিত্য লেখকের কাছে বঙ্গের বীর সন্তান। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম পুরোহিত। হারাণচন্দ্র প্রতাপের নিষ্ঠুর

কার্যের যেভাবে সমর্থন কবেছেন তা থেকে বোঝা যায় বঙ্গবীবের এই আদর্শ লেখক যুগোচিত ইতিহাসচর্চা থেকে সংগ্রহ কবেছেন। আগে বলেছি লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফুলজানি রোমাম্বরাজ্যেব আধিবাসিনী। সে শ্রী-র আদর্শে পবিকল্পিত। এবং শ্রী-ব অনুকবণে ফুলজানিও উড়িষ্যাফেবত সন্ন্যাসিনী। উপন্যাসটিতে সেই নীতিকথা অতিকথনে পর্যবসিত হযেছে। দাতা কর্ণেব আদর্শে প্রতাপেব মহিষীদান হাস্যকব দৃষ্টান্ত।

বানী ভবানী

'রানী ভবানী' (১৩১০) লেখকের কথায় একটু 'অভিনব' পন্থায় বচিত।

'রানী ভবানী যে হিসাবে দার্শনিক কাব্য বা ধর্মমূলক উপন্যাস, সে হিসাবে প্রত্যক্ষ ঘটনামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে।'

রানী ভবানীব শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উপন্যাসটির বর্ণনীয় বিষয। বানী ভবানীকে লেখক ভগবানেবই অংশ বলে মনে কবেছেন। ভক্তিব আবেগে গ্রন্থটি বচিত। তাব প্রমাণ গ্রন্থশেষে লেখকেব সই 'সেবক—হাবাণচন্দ্র বক্ষিত'। অক্ষয়কুমাব মৈত্রেযেব প্রবন্ধ লেখকেব অবলম্বন। অপব উৎস লোকনাথ ঘোষেব *The History of the Indian Chiefs, Rajas, Zemindar etc.*

'মন্ত্রের সাধন' (১৩০৫), 'প্রতিভা সুন্দবী', 'জ্যোতির্ময়ী' (১৩০৭) অপব ঐতিহাসিক উপন্যাস।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

স্বপ্নসুন্দবী

'স্বপ্নসুন্দরী' (১৩১৫) সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাস। নিবেদনে লেখক লিখেছেন—

'১৮৫৭ সালেব প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে জীবিত মিষ্টার জে. এফ. ফাটোমি (Mr J. F Fahtoni) গ্রন্থকারের একখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইল। তাহার সমস্ত ঘটনা ইহাতে নাই। এবং নূতন কথাও অনেক প্রকাশিত করা হইয়াছে।'

একটি ইংরেজ পরিবাব (মিঃ ল্যাভেটব) সিপাহীদেব দ্বাবা লাঞ্ছিত হয়ে

ইতস্তত বিচরণ কবে কিভাবে পুনবায শান্তি ফিবে পেল তাবই কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে ‘স্বপ্নসুন্দবী’তে। অপব একটি উপাখ্যান জিনাত ও ফাবহাতেব প্রেম-কাহিনীও গ্রন্থটিব অনেকখানি জাযগা জুড়েছে।

সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে বচিত বইগুলিতে বিদ্রোহেব নাযকেব কার্যাবলীই লেখকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে বেশি। এই বইতে নায়কদেব অনুচববৃন্দেব কার্যকলাপেব বিববণ স্থান পেযেছে। ফাবহাত ও জিনাতেব প্রেমকাহিনীব মধ্যে অলৌকিকতা মুসলমানী কেচ্ছাব অনুরূপ। সম্ভবত মুসলমানদেব প্রেম-কাহিনীব আদর্শ হিসাবে এই কেচ্ছাব আদর্শ গ্রহণ কবতে ফাটোমিকে প্রলোভিত কবে থাকবে। স্বপ্নসুন্দবী ভিখাবিনীরূপ প্রহেলিকা। ভিখাবিনী লেখকেব প্রচাবেব বাহন। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে ফাটোমিব মতামত দেশীয লেখকদেব মতোই। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকেব কোনো মোহ ছিল না। দেশীয ও ইংবেজ লেখকেব মত হিসাবে এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য—

‘ইংবেজ ন্যাযবান ও জ্ঞানবান জাতি। ভাবতবাসী শিক্ষাদীক্ষা ভুলিযা গিযাছে। ক্ষুদ্রত্ব ইহাদেব অস্থি মজ্জায মিশিযা গিযাছে। ইহাদেব উন্নতিব জন্য এক আদর্শসমাজেব প্রযোজন। স্বীকার কবি, মানুষ মাত্রেবই দোষ আছে, ইংবেজও নির্দোষ নহে, কিন্তু তাহাদেব জ্ঞানানুশীলন, তাহাদের বিজ্ঞান অনুশীলন, তাহাদেব অর্থ ও বাণিজ্য নীতি এবং সর্বাপেক্ষা তাহাদেব স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি ভারতবাসীব শিক্ষণীয। একদিন ভাবতবাসী জগতেব নিকট সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ছিল কিন্তু তাহা বলিযা এখন কি হইবে? পূর্ণিমাব দিন সমস্ত আকাশে জ্যোৎস্নোদ্ভাসিত ছিল বলিযা অমাবস্যার দিন কি হইবে? সে দিন একটি তাবকাব আলোবই লক্ষ্যস্থানীয হওযা কর্তব্য।’

কাহিনীনির্মাণে কৃতিত্ব কিছু নেই। অভিনবত্বও নেই। অত্যন্ত শিথিল প্লট। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে যে বাঙালিব আগ্রহ ছিল এই বইটি তাব প্রমাণ।

সুবেন্দ্রমোহন ‘যোগরানী’ (১৯১১) নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। লেখকেব বক্তব্য: ‘বঙ্কিমবাবুব প্রসাদে বাঙ্গালী পাঠক সীতাবামকে চিনিয়াছেন—যোগরানী উপন্যাসে বাজা উদয়নাবাযণেব কাহিনী বিবৃত কবিতে চেষ্টা কবিলাম।’

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযেব ‘শোভাসিংহ’ (১৩:৫) নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বই। লেখাতে পূবগামীদেব অনুসবণ থাকলেও যোগেন্দ্রনাথ ভাব-দৃষ্টিতে মৌলিকতাব পাবচয দিযেছিলেন।

'শোভাসিংহ' উপন্যাসে যোগেন্দ্রনাথ মোগল-শাসকের পতনের সময়ের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিতুয়া-বর্দার জমিদার বর্ধমান-রাজকুমারী মানকুমারীর প্রণয়াসক্ত। জমিদার শোভাসিংহ অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। বাহুবলের উপর অত্যধিক আস্থাসম্পন্ন শোভাসিংহ গুরু শঙ্কররামের আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তিনি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে নিহত করলেন। তাঁর এই কাজে সহায়তা করলেন উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ। রহিম খাঁ মোগলবিদ্বেষী। পাঠানরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর। উভয়ের শত্রু মোগল। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। শোভাসিংহ এবং রহিম আপাতত মোগল উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হল। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম মোগল সহায়তার জন্য যশোহর চাক্‌লার মির্জানবে ফৌজদার নূরউল্লার সাহায্য চাইলে। নূরউল্লার দেওয়ান রামভদ্র এবং তার পুত্র সুবোধরাম জগৎরামের সহায়তায় এগিয়ে এল শোভাসিংহের উচ্ছেদের জন্য। জগৎরামও চেষ্টা করতে লাগল। মোগল ফৌজদার নূরউল্লাও এগিয়ে এল। এ দিকে শোভাসিংহ বর্ধমানাধিপকে পরাজিত করে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। রহিম এবং শোভাসিংহ দেশ লুণ্ঠনে ব্রতী হলেন। তাঁরা ক্ষুদ্রতর এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জন দিলেন। নূরউল্লা শোভাসিংহের কাছে পরাজয় বরণ করল। শোভাসিংহ রহিম খাঁর অত্যাচারের ফলে একটি সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটে গেল। সেইটি হল ইংরেজের সুতানটী ইত্যাদি গ্রাম ক্রয় এবং দুর্গনির্মাণের অধিকার লাভ। ইংরেজরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এবং দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতিতে সৈন্যবল সংগ্রহে ব্যস্ত রইল। সে যাই হোক, জগৎরাম শোভাসিংহকে হুগলীতে আক্রমণ করলে। শোভা এবং রহিম খাঁ পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। শোভা-সিংহ বর্ধমান অভিমুখে চললেন মানকুমারী পাবার আশায়। মানকুমারীর সাক্ষাৎ তিনি পেলেন বটে, কিন্তু মানকুমারীর হাতেই তিনি জীবন বিসর্জন দিলেন। মানকুমারীও আত্মহত্যা করল। জগৎরাম এসে দেখল সব শেষ হয়ে গেছে। শোভাসিংহের এই শোচনীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। শংকররাম বুঝতে পারলেন ইংরেজ অধিকার আসন্ন। প্রসঙ্গত উপন্যাসটিতে নূরউল্লা ও তার দুই বিবি মুন্না এবং করিমন্নেসার কাহিনী স্থান পেয়েছে। নূরউল্লা বিলাসী, আয়েশী, আমোদপ্রিয়। করিমন্নেসার চক্রান্তে নূরউল্লা মুন্নাবিবির চরিত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বহিষ্কৃত করে দেন। মুন্না পাগলিনীর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল শোভাসিংহের শিবিরে, মোগলের শিবিরে। একমাত্র

উদ্দেশ্য কবিমন্নেসাব নিধন। কবিমন্নেসা নিহত হল। মুন্না শেষ পর্যন্ত নূরউল্লাব সঙ্গে মিলিত হল।

বলা বাহুল্য, নূবউল্লা-মুন্না-কবিমন্নেসার কাহিনী গ্রন্থেব অপ্রযোজনীয অংশ। যোগেন্দ্রনাথ বোমান্সপ্রিয পাঠকদেব জন্য এই কাহিনীগুলি উদ্ভাবন করেছেন। সন্ন্যাসী-যোগী-বৈষ্ণবী চবিত্রে বাস্তবতাব স্পর্শমাত্র নেই। এই সবই বোমান্সেব উদাহবণ। শোভাসিংহেব আবির্ভাবও বোমান্সসুলভ পবিবেশে। কিন্তু এই-সকলকে ছাপিযে উঠেছে তদানীন্তন ইতিহাসেব করুণ অথচ বাস্তব দিকটি। ইংবেজেব বৈঠকে বঙ্গেব জমিদাবদেব সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিব দিক দিযে সুদূবপ্রসাবী। শোভাসিংহেব অত্যাচার ইংবেজদেব পবম আনন্দেব বিষয় হযে দাঁড়িয়েছিল। এই পথেই বাংলাদেশে শনি প্রবেশ কবেছিল। এইটি ঐতিহাসিক সত্য। শোভাসিংহেব মধ্যে মহত্ত্বেব বীজ ছিল না। জগৎবামেব ভাষায় সে ডকু-ডাকাত। ভাবতবর্ষে হিন্দুবাজ্যস্থাপন তাঁব ক্ষমতায় ছিল না। কিন্তু তিনিই পরোক্ষভাবে ইংবেজদেব সাদব আহ্বান জানিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথেব কৃতিত্ব এই যে তিনি শোভাসিংহেব আবির্ভাবকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন নি। যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি থাকলে একটি ঘটনাব মধ্যে বৃহত্তব সম্ভাবনাব বীজকে দেখা যায় যোগেন্দ্রনাথেব তা ছিল। এই কাবণে এই বইটিব বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য। ভারতচন্দ্র এক সভাসিংহেব নাম কবেছেন। এই সভাসিংহ এবং শোভাসিংহ এক ব্যক্তি কি না বলা দুষ্কব।[১]

দীনেন্দ্রকুমার রায়

দীনেন্দ্রকুমাব বাযেব 'নানা সাহেব' (১৯২৯) সিপাহী বিদ্রোহেব কাহিনী। দীনেন্দ্রকুমারের পবিচয বাংলা সাহিত্যে প্রধানত বহস্য লহবী সিবিজ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে। ডিটেকটিভ উপন্যাসের অজস্রতা এবং জনপ্রিয়তাব জন্য দীনেন্দ্রকুমারের অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা পাঠক মনে রাখে নি। কিন্তু তাঁর 'পল্লী-চিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র', 'পল্লী-চবিত্র' এককালে বাংলার জনসমাজে সমাদৃত ছিল। 'নানা সাহেবে'র জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। ইতিপূর্বে চণ্ডীচরণ সেন 'নানা

১. এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাযেব ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা।

সাহেবের কাহিনীকে বিস্তৃত কবে বলেছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু সেই কাহিনীকে নিজের মতো কবে বলেছেন।

নানা সাহেবেব বিচিত্র কার্যকলাপ আমবা অন্যত্র আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য চণ্ডীচবণ সেন)। দীনেন্দ্রবাবু নানা সাহেব সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা শিক্ষিত বাঙালিব কামনাব প্রতিধ্বনি। উপন্যাসটি সম্বন্ধে দীনেন্দ্রবাবু বলেছেন—

'ইহা নানা ধুন্দুপান্তর বিফল চেষ্টার ও ভাগ্য পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী সত্য কাহিনী সিপাহী যুদ্ধের প্রধান নাযকের সাংঘাতিক ভ্রমেব অনতিরঞ্জিত চিত্র। নবহত্যা ও অরাজকতার বিস্তার অধঃপতিত পরপদানত দেশের উদ্ধাবেব উপায নহে—ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ তাহার জ্বলন্ত জীবন্ত প্রমাণ।'

অন্যত্রও বলেছেন, নানা সাহেব ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিব জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিযেছিলেন। স্বদেশপ্রাণতা তাঁব মধ্যে ছিল না।

শূযাব এবং গোমাংস ভক্ষণেব ভীতি থেকে সিপাহীবিদ্রোহেব সূচনা। নিকটতম কাবণ হিসেবে আমবা এই তথ্যটি পাই। চণ্ডীচবণবাবু এই ঘটনাটিকে বিস্তৃত আকাবে উপস্থাপিত কবেছেন। দীনেন্দ্রবাবু স্বরূপপুবেব গ্রামবাসীদেব সংলাপেব মধ্য দিযে প্রকৃত উত্তেজনাব স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদেব অলৌকিক বিশ্বাসেব নিদর্শন হিসাবে মহাবানী ভিক্টোবিযাব স্বপ্ন-দর্শনেব কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদেব উপন্যাসে এবকম অলৌকিক কাহিনীব ছডাছডি। সুতবাং মহাবানী যবন এবং হিন্দু উচ্ছেদেব স্বপ্ন দেখতে পাবেন বৈকি। আবাব এই বিদ্রোহে ইংবেজদেব ভীতিব নিদর্শন বযেছে কানপুবেব দুর্গেব মহিলাদেব সংলাপেব মধ্যে। মোট কথা, ইতিহাসকে জঁাকালো রূপ দেবাব জন্য দীনেন্দ্রবাবু কল্পনাব আশ্রয নিতে কুণ্ঠিত হন নি। আগে বলেছি, নানাব কার্যকলাপেব প্রতি দীনেন্দ্রবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। তাই নানাব বিশেষণ 'নিষ্ঠুবতাব অবতাব', নানাব স্ত্রী সুমিত্রা বাঈ স্বামী সম্বন্ধে ভাবেন, অদূবদর্শী, কোপনস্বভাব, দর্পান্ধ, দুরাকাঙ্ক্ষী।

ষষ্ঠ পবিচ্ছেদে নানাব বামবাজত্বেব বর্ণনা পাই। নানাব নিষ্ঠুবতাব স্বাক্ষর দীনেন্দ্রবাবু কয়েকটি লোমহর্ষক দৃশ্যেব মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত কবেছেন। এ বর্ণনা বাস্তবসম্মত। ইংবেজ ঐতিহাসিকবা তাব বিববণ দিয়েছেন। অত্যা-চারের 'এ-পিঠ' দেখিয়ে দীনেন্দ্রকুমাব ক্ষান্ত হন নি। 'ও-পিঠ' দেখিয়েছেন শঙ্কবেব মা এবং স্ত্রীর উপব ম্যাকেঞ্জী বার্নার্ডের অত্যাচারেব কাহিনী উদ্ঘাটন

করে। এ ক্ষেত্রে রোগ সাহেবের ক্ষেত্রমণির (নীলদর্পণ) উপর অত্যাচারের দৃশ্যটি অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

নানা সাহেব উপন্যাসটিতে একটি উপকাহিনী স্থান পেয়েছে। সেইটি হল শঙ্কর, প্রভুদয়াল এবং অলকা ইত্যাদির কাহিনী। কাহিনীটির উৎস অবশ্যই শশিচন্দ্র দত্তের *Shunker, A Tale of the Indian mutiny of 1857*। দীনেন্দ্রকুমার শশিচন্দ্রের কাহিনীটিকে বিস্তৃত করেছেন। শঙ্করের স্ত্রীর উপর ম্যাকেঞ্জী বার্নার্ডের পাশবিক অত্যাচার এবং শঙ্করের প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের একটি দিককে লেখক পরিস্ফুট করেছেন।

নানা সাহেব উপন্যাসে দীনেন্দ্রবাবু সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর নির্দিষ্ট কোনো মত উপস্থাপিত করেন নি। এর কারণও আছে। লেখক সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করতে পারেন নি। অপর দিকে ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যও তাঁকে উদ্দীপিত করেছে। এই কারণে একবার 'এক দিক' আর একবার 'অপর দিক', একবার 'এ পিঠ' আর একবার 'ও পিঠ' বর্ণনা করেছেন। অরবিন্দের (লেখক অরবিন্দের গৃহশিক্ষক ছিলেন) প্রেরণা লেখককে উৎসাহ যুগিয়েছিল। সেজন্য দেখি জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি রোমন্থনে লেখকের উৎসাহ সমধিক। নানার অত্যাচার কাহিনী বর্ণনার পর দীনেন্দ্রকুমারের এই মূল্যবান উক্তিটি উদ্ধৃত করছি—

'পরলোকবাসিনী বিদেশিনী মাতৃগণ ও ভগিনীগণ! ভারতের ভাগ্যাকাশের ধূমকেতুতুল্য নানার পৈশাচিক অত্যাচারে তোমরা আত্মবিসর্জন করিয়া দুর্বহ জীবনভার হইতে মুক্তিলাভ করিলে বটে কিন্তু নানা সাহেবের সেই দুর্বহ পাপের ভার আজ তাহার ত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে সমভাবে বহন করিয়া নিত্য লাঞ্ছনার কশাঘাতে ও দুঃসহ বেদনার অশ্রুপাতে তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে।'

গ্রন্থের ফলশ্রুতি এই।

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'দরাফ খাঁ' ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে লেখক 'রামপ্রসাদ', 'বামাক্ষেপা' রচনা করেছিলেন। এগুলিতে লেখক ইতিবৃত্তের আড়ালে ধর্মকথার অবতারণা করেছেন। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে 'পৌরাণিক উপন্যাস'ও এককালে সমাদৃত

হয়েছিল। কিছু কিছু কল্পনা মিশানো ছিল। এক সময়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে একজাতীয় উপন্যাস লেখা হচ্ছিল যাব নাম দেওয়া হযেছে 'ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস'। সকলেই যে এ নাম ব্যবহাব কবেছেন তা নয, কিন্তু কোনো ধর্মপ্রাণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিযে উপন্যাস বচনা কবার প্রবৃত্তিব মূলে ছিল এই মিশ্র অনুভূতি। মূলত এই উপন্যাসগুলিব আবেদন ধর্মবোধেব কাছে। ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এঁবা পৌবাণিক চবিত্র নির্বাচন না কবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি নির্বাচন কবেছিলেন এই মাত্র তফাৎ। শচীশ-চন্দ্রেব 'সনাতন গোস্বামী' উপন্যাসটিব কথা এই প্রসঙ্গে স্মবণ করতে পাবি। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ধর্মচর্চা তো ছিলই। কিন্তু সেখানে ইতিহাসই প্রধান। এই 'ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস'গুলিতে ধর্মই মুখ্য, ইতিহাস অপ্রধান।

দবাফ খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যোগীন্দ্রবাবুব উপন্যাস থেকে জানতে পাবি তিনি ছিলেন হিন্দুবংশজাত। দবাফ খাঁ ত্রিবেণীব নিকটে দ্বাববাসিনী গ্রামে এক মুসলমান জমিদাব মেহের আলিব আশ্রয়ে লালিত হন। কালে তাঁব নাম হয দবাফ খাঁ। তিনি একজন অজ্ঞাতনামা বালিকাব (মেহেব আলিব আশ্রিতা) পাণিগ্রহণ কবেন। কন্যাব নাম মতিযা। এই মতিযাও হিন্দু-বংশজাত। মেহেব আলিব মৃত্যুব পব দরাফ খাঁ বিবাট জমিদাবীব মালিক হন। জ্ঞাতি নাজেম আলি দবাফ খাঁব বিরুদ্ধে চক্রান্ত কবে। দবাফ বনবীবেব সাহায্যে সংগ্রামে জযলাভ কবেন। ধীবে ধীরে দরাফেব মধ্যে অধ্যাত্মপ্রবণতা দেখা দেয়। একটি অলৌকিক ঘটনা তাঁব জীবনে পরিবর্তন এনে দেয। তিনি গঙ্গাদেবীব ভক্ত হয়ে পডেন। এব পব তীর্থভ্রমণে বেবিযে তিনি তাঁর জন্মদাত্রীর সাক্ষাৎ পান। নিজদেশে এসে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ কবেন। আবার বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুকাল পবে ত্রিবেণীর ঘাটে সমাধিলাভ করেন। মতিয়াও সেই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গঙ্গায় তাঁদের দেহ ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দবাফ খাঁ সম্বন্ধে কিংবদন্তীই ছিল লেখকেব মূল অবলম্বন। লোকেব মুখে মুখে ফিবে কিংবদন্তীগুলি নানা আকার ধাবণ কবেছিল। যোগীন্দ্রবাবু লোক-প্রচলিত এই বস্তুগুলি খুঁটিয়ে দেখেন নি। বরং সাগ্রহে উদ্ধার করেছেন। যোগীন্দ্রবাবুব উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যাত্মাব জীবন বর্ণনা, ঐতিহাসিকেব তথ্যপ্রীতি তাঁব ছিল না।

দরাফ খাঁ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায লিখেছেন।[১] কৌতূহলী পাঠকদের এই প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দরাফ খাঁর উল্লেখ শিলালেখেও পাওয়া যায়। এমন-কি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও দরাফ খাঁর পরিচয পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে—

'ত্রিবেণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শয কাজী॥'

এই দফর খাঁ গাজীই দরাফ খাঁ। যাকুব আলির 'ছহি বড জঙ্গনামা'-তে আছে—

'ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান॥'

এইগুলিই প্রমাণ করছে দরাফ খাঁর প্রাচীনত্ব।

জয়কুমার বর্ধন রায

ত্রিপুরার রাজকর্মচারী জযকুমার বর্ধন রাযের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাযক সমসের গাজী। সমসের গাজী পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তি। অন্তত আলিবর্দীর রাজত্বকালে সমসের যে খ্যাতি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ ত্রিপুরার রাজমালায় আছে। সমসের গাজীর লোকান্তরের বেশ কিছুকাল পরেও তাঁর স্মৃতি যে জনসাধারণের মধ্যে অম্লান ছিল তার নিদর্শন রয়েছে মীর হবিবের 'গাজীনামা'য। এই গাজীনামা বইটির বিস্তৃত বিবরণ[২] পেয়েছি। নোযাখালি অঞ্চলে সমসেরের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি এতই বেড়ে যায যে তিনি প্রজাদের নিষ্কর ভূমি দান করতে আরম্ভ করেন।

ত্রিপুরায থাকাকালে জযকুমারবাবু নিশ্চযই 'গাজীনামা'র সঙ্গে পরিচিত হন। জযকুমারবাবুর গ্রন্থ রচনার সমযে সমসেরের কীর্তিকলাপ জনসমাজে সপ্রশংস শ্রদ্ধা লাভ করে আসছিল। জযকুমারবাবু রাজকর্মচারী হওয়াতে নথি-পত্র দেখবার সুযোগ বেশি পেয়েছিলেন নিশ্চযই। সেই কারণে 'অদৃষ্ট চক্র' বইখানি তথ্যবহুল এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বাক্ষরে দীপ্যমান। নোযাখালি

১. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায, 'দরাপ খাঁ গাজী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ ১৩৫৪

২. শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ, এবং সেই অঞ্চলের স্থানের নামকরণে জয়কুমার অভ্রান্ত ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

বাল্যকাল থেকে সমসের সাহসী বীব বলে পরিচিত। পিতাও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সমসেরের আশ্রিত বেজা খাঁ সমসেরের সাহস-বীরত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। নোয়াখালিতে বতনপুব দুর্গেব অধিপতি বসির খাঁর অত্যাচারে দেশ যখন উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল তখন সমসেব বসিরকে দমন করেন। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিবে আসে। সমসের যখন ক্ষমতা পেল তখন তিনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তাব বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ কবে সমসেব বলীয়ান হয়ে উঠলেন। সমসেরের এই ক্ষমতা-প্রাপ্তিতে ত্রিপুবাবাজ শঙ্কিত হলেন। ত্রিপুবার অধিপতি সমসেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান কবলেন। ত্রিপুবার সৈন্য পরাজিত হল। কোনো-এক সময়ে সমসেরও বন্দী হলেন। কিন্তু কৌশলে সমসের মুক্তিলাভ করে ত্রিপুরাব বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ত্রিপুবাবাজ সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। সমসেব এইভাবে ত্রিপুরার সামন্ত বাজা হিসাবে দেশ শাসন কবতে লাগলেন। কিন্তু রেজা খাঁ সমসেরের এই গৌববে শান্তি পেলেন না। সমসেরের ভগ্নী গুলনেয়ার বেজা খাঁর রূপে মুগ্ধ হযে বেজাকে বিবাহ কবলে। অচিবে গুলনেয়াব তাব ভুল বুঝতে পারলে। সে গৃহত্যাগী হল। রেজা খাঁ নবাবফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সমসেরকে প্রলোভিত কবলেন। সমসেরেব পত্নী বেলা বেগমের নিষেধ সত্ত্বেও সমসের রেজা খাঁর ফাঁদে জড়িযে পড়লেন। সমসেরকে অপহরণ করে একদিন নবাব-গুপ্তচররা ফেণী নদী দিয়ে পালিয়ে গেল। পথে গুপ্তঘাতকের হস্তে সমসেরের মৃত্যু হয়।

'অদৃষ্ট চক্র' বইটিব পবিচয় লিখে দিয়েছেন আব-একজন ঔপন্যাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী। তিনি সমসেবকে সীতারাম রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতিহাসে কিন্তু সমসেবকে 'ডাকাইত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাজত্ব লাভের পর সমসেব অবশ্য নানা সদনুষ্ঠান দ্বারা নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করেন। জয়কুমাববাবুব বর্ণনার সঙ্গে ইতিহাসের গবমিল প্রচুব। সমসেরের শেষ জীবন বর্ণনায় তিনি অনৈতিহাসিক লোকপ্রচলিত গালগল্পে আস্থা স্থাপন কবেছিলেন। জয়কুমাববাবুব গ্রন্থে যেটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে তিনি এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানেব সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। সমসেরের বেলা বেগমের প্রতি ভবরানীর বাৎসল্যভাব এবং ভবরানীকে সমসেরের মা বলে

সম্বোধন, সমসেরের গুরু ভীমপ্রসাদের প্রতি ভক্তি এই সবই হিন্দু-মুসলমান প্রীতির জন্য উদ্ভাবিত। এই-সকল বর্ণনা প্রচারগন্ধী হওয়াতে বর্ণবিহীন এবং একঘেয়ে। প্রেমবর্ণনাতেও (গুলনেয়ার-বেজা খাঁ, সমসের-বেলা, আমিনা-জাফর আলি) লেখক গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। সমসেরের রাজ্যপ্রাপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উল্লসিত হয়েছিল। এর পশ্চাতে যে রাজনৈতিক কারণ ছিল জয়কুমারবাবু উপসংহারে সে কথা বলেছেন। নবাবী আমলের তখন ভগ্নদশা। ত্রিপুরা রাজ্যে গৃহবিবাদ। আভ্যন্তরীণ অভাব-অনটন প্রজাদের নবাবী শাসন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে উদ্‌বেজিত করেছিল। সমসেরকে এজন্য ত্রাণকর্তা বলে মনে হয়েছিল। সমসেরের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা সম্ভবত একটি লোকপ্রচলিত গল্প থেকে পাওয়া। কথিত আছে, সমসের কালীসাধক ছিলেন। এবং এর জন্যই সমসেরের ধর্মসাধনা রাজ্যপালন অপেক্ষা বৃহত্তর হয়ে উঠলে তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'ডঙ্কা নিশান' ১৩৩০ সালে প্রবাসীতে ধারাবাহিক বার হচ্ছিল। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১] সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান-পিপাসা পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে প্রাপ্ত। তাঁর কবিতায় ইতিহাস-প্রীতির পরিচয় পেয়েছি। সে ইতিহাস কবিকল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত নয় —স্থির বিচার ও তথ্যের যাথার্থ্যে তা দীপ্যমান। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য ঔপন্যাসিকবৃন্দ কেবলমাত্র রোমান্সসৃষ্টির আত্যন্তিক মোহে ইতিহাসকে বিকৃত করছিলেন। এর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল।[২] সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখেও অতীতের তথ্যের প্রতি কবিদৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। ফলে উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হলেও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্প-চাতুর্য লক্ষ্য করা যায়।

মগধ ও বৈশালীর দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির বিষয়। এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত সন্ধিতে নিষ্পত্তি হয়। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই সন্ধি হচ্ছে যবন বিতাড়নের

১. রাখালদাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, প্রবাসী, ১৩৩০ মাঘ

পূর্বাভাস। চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হয়ে যবন অভিযান কবেছিলেন। ভাবতেব বৃহত্তব ঐক্যেব জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন উপন্যাসটিব অন্যতম ফলশ্রুতি।

অসম্পূর্ণ উপন্যাসটিব পূর্ণবিচাব সম্ভব নয। লক্ষণীয, উপন্যাসটি চলিত ভাষায লিখিত। সত্যেন্দ্রনাথ মৌর্যযুগেব পবিবেশ সৃষ্টিব জন্য সে যুগেব বীতি-নীতিব পূর্ণ পবিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধাস্ত্র, পরিখা, বণকৌশল, প্রজাপুঞ্জেব সাহস ও তিতিক্ষা সত্যেন্দ্রনাথেব বর্ণনায উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বল্প হলেও চন্দ্রগুপ্তেব যেটুকু পবিচয় উপন্যাসটিতে আছে তা দীপ্তিময। পর্বতবাসীব চবিত্র বর্ণনায় আবণ্যক সাবল্যেব মনোহব চিত্র এঁকেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। গোয়ালাদেব রূপায়ণেও তাঁব কৃতিত্ব কম নয। বইটি ছাপা নেই। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনার দু-একটি নিদর্শন দিচ্ছি—

'আমরা যে সময়কার কথা বল্‌ছি তখন এই দশসিদ্ধিক নন্দের চতুরঙ্গ সেনার ডঙ্কা ধ্বনিতে চির-বিদ্রোহী ও চির-স্বাধীনতাপ্রিয় বৈশালী নগরের দ্বার-গ্রাম পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর, চীনাংশুকের তৈরী—রক্তমাখা চিলের ডানার মতন মগধসম্রাটের বিজয়োদ্ধত নিশানগুলো যেন বৈশালীবাসীদেব শেষ স্বাধীনতাটুকু মাংসের টুক্‌রোর মতন ছোঁ দিয়ে কেড়ে নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে।···দুর্গেব চারিদিকে ত্রিশ হাত চওড়া বিশ হাত গভীর পরিখা, পরিখায় পোষা কুমীরের দঙ্গল। তার পর কাঁটার বেড়া। তারপব জানুভঞ্জনী ত্রিশূলের বেড়া। এত সত্ত্বেও মগধ-সৈন্যের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নগরবাসীরা তাদের উপর কখনো বা যন্ত্র-সাহায্যে যমদণ্ডের মতন গুরুভার লোহার সজারু দেবদণ্ড নিক্ষেপ করে একসঙ্গে অনেককে জখম করছে, কখনো বা উপর থেকে তপ্ত তেল ঢেলে মনের ঝাল্ মেটাচ্ছে, আবাব কখনো বা রাশি রাশি এঁটো পাতা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করছে।'

সীমা-সাক্ষীব বর্ণনাতে সে-যুগেব অদ্ভুত বিশ্বাসেব একটি দুর্লভ নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথ দিয়েছেন—

'সীমা-সাক্ষী জানেন না? যাদের মধ্যে সন্ধি পাকা হবে তাদের দুই তরফের দু'জন জীয়ন্ত লোককে দুটো গর্ত কেটে পিঠোপিঠিভাবে পুঁতে ফেলা হয়। পাহাড়ীদের বিশ্বাস এরা মরে ভূত হয়ে নিজের নিজের স্বদেশের সীমা রক্ষা করে। জীয়ন্ত বিদেশী বা বিদেশীর ভূত কাউকে নিজের এলাকায ঢুক্‌তে দেয় না। এদেরি বলে সীমা-সাক্ষী। পাহাড়ীরা এদের প্রাণান্তে চটায় না। এ কথা আমি পাহাড়ীদেব মুখে অনেকবার শুনেছি। আমার বিবেচনায় এরূপ একটা অনুষ্ঠান করে বাখা মন্দ নয়।'

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ইতিহাসে দৈন্যের অবধি নেই। পুরাণ-ইতিহাস যমজ ভাইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। জনশ্রুতি, গালগল্পগুলি তথ্যের অভাবে 'অথরিটি'র মূল্য লাভ করেছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ অতথ্যকে দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল খনন-আবিষ্কারেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস। মুসলমান আমলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে মুসলমান ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক উপাদানের নিতান্ত অভাব ছিল। ভারতবাসীর কাছে কিছুকাল আগেও হিন্দুযুগ ছিল কল্পনার বস্তু, ধ্যানগম্য আদর্শ। এ বস্তু ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দিত। অতএব তাম্রশাসন, শিলালিপির উপর নির্ভর করতে হল। খননকার্য চলতে লাগল সর্বত্র। রাখালদাসের এ বিদ্যায় আগেই হাতে-খড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আবিষ্কার করলেন মহেঞ্জোদরোর পুরাকীর্তি। এ আবিষ্কারে তাঁর আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই ছিল। তিনি বলেছেন, It comes once in age—এ উক্তি অহমিকার নয়, সত্যের।

তথাপি ইতিহাস রচনা করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে উপাদানের অভাব লেখককে পীড়িত করেছিল। তিনি বলেছেন—

'যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।'[১]

উপন্যাস রচনা করে তিনি এ অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। রাখালদাসের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের কঙ্কালে মেদ মাংস যোজনা করেছেন। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

---

১. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ), ভূমিকা

ইতিহাসকে রাখালদাস পলিটিক্সের সেবাদাসী[১] করেন নি। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে রাখালদাসের পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মতো। পাশ্চাত্য উপন্যাসে ইতিহাস-অনুগতির অভাব নেই। এমনকি এক-এক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের আকার-প্রকার নিয়ে পর্যন্ত সূক্ষ্ম গবেষণা হয়েছে। স্কটের উপন্যাসে তীরের মাপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনার বিরাম নেই। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই দৈন্য যখন আমাদের দেশে আকাশপ্রমাণ সেখানে কল্পনার আশ্রয়ে একটি যুগকে জীবন্ত করে তুলতে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করবার আকাঙ্ক্ষাই যথেষ্ট নয়। রাখালদাসের জীবনী থেকে জানতে পারি উপন্যাস রচনার সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ তিরস্কার লেখক নীরবে হজম করেন নি। রাখালদাসের সামনে ছিল ম্যাসপেরোর (G. Maspero) আদর্শ। ম্যাসপেরো এক দিকে প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অন্য দিকে সেই-সমস্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন মিশরকে উপন্যাসে শিল্প-গৌরবে ভূষিত করেছেন। রাখালদাস এই পথের পথিক।

রাখালদাসের আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্ব নিয়েই উপন্যাস রচিত হয়েছিল। রাখালদাস হিন্দুযুগকেই প্রধানভাবে আশ্রয় করলেন। সে-যুগের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রথম তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

রাখালদাস যে প্রবল স্বদেশ-প্রেরণা থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেন— সে প্রেরণা উদ্দীপনা প্রাচীন কালে প্রসারিত হয়েছে। পারসিকরা যখন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তখন প্রবল স্বদেশী উদ্দীপনাই গ্রীসকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।[২] এই স্বদেশী প্রেরণাই হেরোডোটসের মতো ঐতিহাসিকের জন্ম দিয়েছিল। গুপ্তযুগে হুন আক্রমণ এ রকম একটি ঘটনা। রাখালদাস হুণদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযানকে বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। দেশের সত্তা হুন আক্রমণে আলোড়িত, দেশবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্যে উদ্দীপিত। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযান মহৎ গৌরবে চিত্রিত হয়েছে। প্রশ্ন হল সে-যুগে এরকম কোনো স্বদেশ-প্রেরণা ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায়,

১. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪

২. A. B. Keith, ***History of Sanskrit Literature***

নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেইটি গ্রীসবাসীর অনুরূপ কি না তা বলা দুরূহ। রাখালদাস উপন্যাসে সে-যুগের ইতিহাসকে সমসাময়িক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে দেখেছেন। তিনি বাংলার হেরোডোটস।

রাখালদাসের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে,[১] কিন্তু সেই-সব গ্রন্থে তিনি দেশের সামাজিক অবস্থার বিশেষ পর্যালোচনা করেন নি। উপন্যাসগুলিতে তিনি সে অভাব পূরণ করেছেন। সেকালের কেবল যুদ্ধবর্ণনা নয়—মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার ছবিও এঁকেছেন। এই হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলি ইতিহাসের পরিপূরক।

রাখালদাসের উপন্যাসেও দৈবজ্ঞের গণনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস দেখি। এগুলি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব।

আরও একটি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুখানি উপন্যাস[২] এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম তিনখানি উপন্যাস[৩] মিলিয়ে নিলে আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে পতনের একটা পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। অর্থাৎ অশোকের সময় থেকে মুসলমান আক্রমণ-পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি পূর্ণরূপ এই উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাবে। গুরু হরপ্রসাদের সঙ্গে রাখালদাসের এই আর-এক যোগ।

শশাঙ্ক

'শশাঙ্ক' রাখালদাসের প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। উপন্যাসটি রাখালদাসের শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উৎসর্গিত। 'পাষাণের কথা'[৪] থেকেই বুঝতে পারি লেখক ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন—

"পাষাণের কথা'[৪] মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া দুই বৎসর পরে 'শশাঙ্ক' আরব্ধ হইয়াছিল।'

এবারে আর গল্পাকারে ইতিহাস নয়, খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন রাখালদাস।

---

১. রমাপ্রসাদ চন্দ. 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', প্রবাসী, ১৩৩৭

২. কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে

৩. শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা

৪. পাষাণের কথা উপন্যাস নয়। গল্পচ্ছলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কথা। এই বইটিকে রাখালদাসের উপন্যাসগুলির পটভূমিকা বলতে পারি।

প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে কথাসাহিত্যের 'প্রশস্ত সমতল বর্ত্ম' আশ্রয় করার কারণ হিসেবে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নজির দেখিয়েছেন। মৃণালিনী ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ঘটনাসংস্থান মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকাল।

'মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইযা আমরা মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ শশাঙ্ক রচিত হইল।'

শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অনুমানগুলি করেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনা সিদ্ধান্তের স্তরে পড়ে না। অতএব কল্পনার একান্ত প্রয়োজন। নিছক কল্পনা ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অশ্রদ্ধেয় এবং বর্জনীয়। সম্ভবত এই কারণেও লেখক উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, লেখক উৎসর্গপত্রে লিখেছেন, 'যাঁহার অপূর্ব শিক্ষা ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ দ্বন্দ্বযুগের ইতিহাস অবলম্বনে উপাখ্যান রচিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ'—এই থেকে বোঝা যায় শশাঙ্ককে লেখক এই ধর্মকলহের একজন নেতারূপে দেখেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছিলেন।

শশাঙ্কের একস্থানে লেখক বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র উল্লেখ করেছেন[১], আবার হিউয়েন সাঙয়ের অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যত্র। তথাপি মনে হয় লেখক তাঁর উপন্যাস রচনায় এ দুটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গবেষণা অবশ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) আগেই পেয়েছি। শশাঙ্ক উপন্যাস রচনায় প্রধানত শিলালিপি তাম্রশাসনগুলিই রাখালদাসের অবলম্বন ছিল।

রাখালদাসের অনুসরণে শশাঙ্কের কথা বলি। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছিলেন, এইটি হিউয়েন সাঙের অভিমত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে দুষ্টাত্মা বলেছেন। শশাঙ্কের বোধিবৃক্ষ ছেদন করার কথা ছাড়াও চীনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের আরও কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন গৌড়াধিপ। হর্ষচরিতে শশাঙ্ক 'দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ'। হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের

---

১. 'Historically we may say that the work is of minimal value, though in our paucity of actual records it is something even to have this!''—A. B. Keith, ***History of Sanskrit Literature.***

মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাখালদাস উভয় মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। রাজ্যবর্ধন দুর্দান্ত হূনদের পরাজিত করেছেন, মালবাধিপকেও পরাজিত করেন। সুতরাং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় নিহত করেছিলেন এইটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেখক শেষে বলেছেন, দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক সসৈন্যে রাজ্যবর্ধনকে আক্রমণ করে নিহত করেন। শশাঙ্ক-রাজ্যবর্ধন ঘটনা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি।[১] কিন্তু রাখালদাসের উপন্যাসে এই ঘটনাটি তাঁর নিজের মত অনুযায়ীই বর্ণিত এবং ঘটনাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্ট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'মগধ গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।' ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই। বস্তুত রাখালদাস বিশেষ তথ্য পানও নি। সুস্থিবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মা। তিনি কামরূপ অধিপতি। ভাস্করবর্মা কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। শশাঙ্ক এঁকে যুদ্ধে পরাজিতও করেছিলেন। ভাস্করবর্মার সঙ্গে যে শশাঙ্কের যোগসূত্র ছিল এ কথাও রাখালদাস বলেছেন। হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধেই যে শশাঙ্ক নিহত হন সে কথা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার পত্নী ছিলেন। রাজ্যশ্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে রাখালদাস তা বিশ্বাস করেন না।

শশাঙ্ককে নিয়ে এখন পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত অনেক সমস্যারই সমাধান হয় নি। নূতন তথ্যের অভাবে শশাঙ্ক সমস্যা এখন পর্যন্ত অনুমানের স্তরে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে কল্পনা ও অনুমান যথেষ্ট আছে। তথ্যবিরলতা শশাঙ্কের পূর্ণজীবনী রচনার প্রতিবন্ধক। কিন্তু রাখালদাস তথ্যের দৈন্য সত্ত্বেও শশাঙ্ককে অবলম্বন করে মৌলিক গবেষণা করেছেন। রাখালদাস দেখালেন শশাঙ্ক থেকে ইতিহাসের নূতন অধ্যায় শুরু। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে।[২] রমেশচন্দ্র অবশ্য বলেছেন,

---

১ R. C. Majumdar · *History of Bengal*, Vol. I (Appendix).

২ "Beginning his life as a vassal chief, he made himself master of Gauda, Magadha, Utkala and Kongada, and consolidated his position by defeating the powerful Moukharis", R. C Majumdar, ed *History of Bengal.*

'Mr R. D. Banerji's view that Sasanka was the son or nephew of Mahasengupta has hardly any basis to stand upon.'

রাখালদাসের একটি গুরুতর ভ্রান্তির দিকে ঐতিহাসিকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক রোটাসগড়ের শিলালিপির সাক্ষ্যে গুপ্তসম্রাটদের সামন্ত হতে পারেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্ত এবং শশাঙ্ক এক ব্যক্তি নন। আর যদি এঁরা একও হন তথাপি গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে শশাঙ্কের বংশগত আত্মীয়তা আবিষ্কার করা দুরূহ।

আসলে গুপ্তসম্রাটদের পতনের সময় শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে। এবং গুপ্ত-সম্রাটরা যেভাবে রাজনীতি পরিচালিত করতেন শশাঙ্কও সেইভাবে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন।[১]

আর-একটি কথা। উপন্যাসে রাখালদাস দেখিয়েছেন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসঙ্ঘের সম্মিলিত অভিযানকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা। চীনীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্টের শশাঙ্ক বিরূপতার কথা আগে বলেছি। শশাঙ্কের সম্বন্ধে এঁদের অপব্যাখ্যাকে দূর করবার দায়িত্বও লেখক গ্রহণ করেছিলেন। বাণভট্ট আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রাখালদাস এই কারণে বৌদ্ধ যড়যন্ত্রের কাহিনী বলেছেন। হর্ষ সম্বন্ধেও তিনি এক জায়গায় কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়[২], সেই কারণে রাখালদাসের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু একটি কথা আছে। উপন্যাসে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘট্টের কাহিনীটি আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে শশাঙ্কের বীরত্ব কাহিনী নেপথ্যে থেকে গেছে। রাখালদাস বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কিছু পরিমাণে নির্মম হয়েছেন। এ নির্মমতা আবেগসঞ্জাত। এ কারণে তিনিও কতকটা পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। শশাঙ্ক স্বদেশপ্রেমিক। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ প্রাধান্য পাওয়াতে গ্রন্থের এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যুত। বৌদ্ধভিক্ষু দেশানন্দ কিংবা বসুগুপ্ত-চরিত্র অঙ্কনে রাখালদাস মাত্রা অতিক্রম করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো

---

১. He was the first Historical ruler of Bengal who not only dreamt imperial dreams, but also succeeded in realising them. He laid the foundations of the imperial fabric in the shape of realised hopes and ideals on which the Palas built at on later age —R C. Majumdar, ed. *History of Bengal*, Vol I

২. রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা

রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারেব বিচিত্র উপায়ে ধনসম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন। রাখালদাস বসুমিত্রকে ভিক্ষু হবাব যে কাবণ দেখিয়েছেন 'বেণেব মেয়ে'তে মায়াব ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য কবি। তরলা যুথিকাকে বসুমিত্রেব ভিক্ষু হবাব কাবণ বলেছে এইভাবে,

'ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধসংঘের হস্তে পতিত হয। এই জনাই চাকমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধসংঘের নিকট বলি দিতেছে।'

বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্রাচার্য (শক্রসেন) যেভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র বচনা কবেছে তাতে ইতিহাসেব যুক্তিনির্ভব তথ্যেব উপব অতিবিক্ত মাত্রায পীডন কবা হয়েছে বলে মনে কবি।

প্রভাকববর্ধনেব সঙ্গে মহাসেনগুপ্তেব বিবোধেব ইঙ্গিতটি অনৈতিহাসিক। উপন্যাসে দেখি প্রভাকববর্ধন পাটলিপুত্রে মহাসেনগুপ্তেব কাছে এলে পাটলিপুত্রেব নাগবিকদেব সঙ্গে থানেশ্বরেব সৈন্যেব বিবোধ দেখা দেয। মহাসেনগুপ্ত প্রভাকববর্ধনেব সঙ্গে একজন অধীন প্রজাব ন্যায ব্যবহাব কবেছেন। নিঃসন্দেহে প্রভাকববধন তখন একজন প্রভাবশালী নবপতি। কিন্তু কলচুবি বাজেব আক্রমণেব ভযে মহাসেনগুপ্তই প্রভাকবেব বাজসভায আশ্রয নিযেছিলেন। প্রভাকব পাটলিপুত্রে আসেন নি—আশ্রয নেওযাতে মনে হয় প্রভাকবের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তেব সম্পর্ক আত্মীযতাসূত্রে প্রীতিবই ছিল। বাখালদাসেব বর্ণনায় অনৈতিহাসিকতা সত্ত্বেও তখনকাব বাজনীতিব অনুসবণ কবলে ঘটনাটিব সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না হবাবই সম্ভাবনা। বিশেষত হর্ষবর্ধনেব সঙ্গে শশাঙ্কেব বিবোধেব দিকে লক্ষ্য বেখেই বাখালদাস ঘটনাটিব উপর গুরুত্ব আবোপ করেছেন।

মহাসেনগুপ্তেব বাজকার্য পরিচালনা সে-যুগেব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শশাঙ্কেব পিঙ্গলকেশের বর্ণনা ঐতিহাসিকতাব দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। বিশেষত উপন্যাসে এই তথ্যটি বোমান্সেব দীপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছে।

বাখালদাস ইতিহাসেব ইঙ্গিতকে অনুসবণ কবে যশোধবল-বীবেন্দ্রসিংহ-লতিকাব জীবনবৃত্তান্ত বচনা কবেছেন। যশোধবলেব মধ্যে প্রভুভক্তির চবম রূপ লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলেব মিলনদৃশ্যটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল।

শশাঙ্কেব বাল্যজীবনটি রাখালদাসেব কল্পিত। এব পশ্চাতে কোনো

ঐতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে অংশটিকে দুর্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক। শশাঙ্কের বাল্যজীবন অনেকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। উপন্যাসটিতে ঘটনার ভিড় অত্যন্ত বেশি। ফলে শশাঙ্কের ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অনুদ্‌ঘাটিত। চিত্রার মৃত্যুর জন্যে শশাঙ্ক দায়ী এবং লতিকার ট্র্যাজেডির মূলেও তিনি। এ দুটি নারীর প্রতি শশাঙ্কের আচরণ উপন্যাসের যুক্তিসম্মত পথ ধরে চলে নি। চিত্রার বিবাহবাসরে শশাঙ্কের আচরণ অনেকটা অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবে চিত্রার চরিত্র স্বল্পপরিসরে অঙ্কিত হলেও মোটামুটি মন্দ হয় নি। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ-ব্যাকুলতা লেখক ফাঁকে ফাঁকে আমাদের জানিয়েছেন। শশাঙ্কের পতনের কারণ সম্বন্ধেও লেখক দুর্বল কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। সে কৈফিয়ৎ ইতিহাসসম্মত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর জন্যে দায়ী অদৃষ্ট। শক্রসেন শশাঙ্কের ভবিষদ্‌বাণী করেছেন। সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সারসংকলন করে শক্রসেন বলেছেন, মোহবশে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটবে, তবে স্কন্দগুপ্ত বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হবে আর শশাঙ্ক বিদেশে স্বদেশীদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মৃত্যু বরণ করবে। উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—শশাঙ্কের রাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু। ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় লেখক সার্থক।

আগে বৌদ্ধদের সম্পর্কে লেখকের মনোভাবের আলোচনা করেছি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। স্কটও 'আইভ্যানহো'তে স্যাক্সন জাতির বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নরম্যানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। Freeman স্কটের এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রাখালদাসের চিত্রও ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নয়।[১] তবে রাখালদাসের বর্ণনায় অতিশয্যটুকু ছেড়ে দিলে বৌদ্ধ চিত্রটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শশাঙ্ক সম্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো-আনাই কল্পনা। তথাপি তিনি এই কল্পনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি মধ্যযুগের তথ্যবিরলতার মধ্যে রাখালদাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নদশাকে নিজ কল্পনাবলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে মনোহারিত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমাবেশই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরণাদ্রি দুর্গ, প্রতিষ্ঠান দুর্গ, শতদ্রু নদীর যুদ্ধ, মেঘনার যুদ্ধ এগুলি লেখকের মৌলিক উদ্ভাবনা।

১. শ্রীসুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী

বিপণিস্বামিনী বঙ্কিমচন্দ্রের পানওয়ালীর প্রতিরূপ। শশাঙ্ক, চিত্রা, মাধব-গুপ্তের নদীতীরে বালুকাখেলা মাধবীকঙ্কণের শ্রীশচন্দ্র-নরেন্দ্র-হেমলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তরলার দৌত্য ঈষৎ তরল হলেও মন্দ নয়। নৌসৈন্যের কথা সম্ভবত রাখালদাস 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' গৌড়বাণীর উল্লেখে অনুমান করেছেন। নবীন কৈবর্তের সৈন্যসজ্জা রামচরিতে উল্লিখিত কৈবর্তবিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। শক্রসেনের বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ নাথযোগীদের আচরণের অনুরূপ।

ধর্মপাল

শশাঙ্কের পর ১৩২২ সালে 'ধর্মপাল' প্রকাশিত হল। শশাঙ্ক গৌড়াধিপ হলেও তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখক অঙ্কিত করেছেন। হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে শশাঙ্ক তাঁর মূল উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারেন নি। রণক্ষেত্রে লতিকার কাছে তাঁর খেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অথচ শশাঙ্ক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেরও। সুতরাং শশাঙ্কের পর বাংলার অদ্বিতীয় বীর ধর্মপালকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'শশাঙ্ককে লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এইজন্য "শশাঙ্কের" পরে "ধর্মপাল" লিখিত হইয়াছে'। এই উদ্দেশ্য ছাড়া শশাঙ্কের অনুরূপ ইতিহাসের সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। বাংলার ইতিহাসের সে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল।[১] সে যুগের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করায় গ্রন্থটির মর্যাদা বেড়েছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বাংলার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'গৌড়রাজমালা'য় পাওয়া যায়। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'গৌড়লেখমালা'যও বাংলার

---

১. শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

'Bengal, which had lost all political homogenity and had almost been eliminated as a factor in Indian politics suddenly emerged under him as the most powerful state in Northern India —R C Majumdar and A D Pusalker: ***Age of the Imperial Kanauj.***

ইতিহাসেব এই পর্বটিব বিস্তৃত বিববণ পাচ্ছি। তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গেব জাতীয় ইতিহাসে'ব উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন কবেন নি। বলা বাহুল্য, বাখালদাসেব নিজেব গবেষণাই 'ধর্মপালে' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাহিনীটি এই।—

গুপ্ত সাম্রাজ্যেব পতনদশায দেশে অবাজকতা দেখা দিয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তবাজাবা একে অপবেব বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। আত্মকলহে জর্জবিত বাংলাদেশ তখন মরুভূমিব আকাব ধাবণ কবেছিল। লুণ্ঠতবাজ, গ্রাম পোড়ানো, নবহত্যা এই-সমস্ত কাজে সামন্তনবপতিবৃন্দেব উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। এই অবস্থায দেশেব জনসাধাবণ একজন সুশাসকেব অভাব বোধ কবছিল। এমন সময়ে গৌড়দেশ-অধিপতি গোপালদেব সামন্তনবপতিবৃন্দেব হাত থেকে গোকর্ণদুর্গ বক্ষা কবলেন। গোপালদেবেব অসীম বীবত্বে মুগ্ধ হযে সামন্তনবপতিবা গোপালদেবকেই তাঁদেব সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত কবলেন।

গোপালদেবেব পুত্র ধর্মপালেব মাযেব নাম দেদ্দদেবী। গোকর্ণেব যুদ্ধে তিনিও ছিলেন। দুর্গস্বামিনীব কন্যা কল্যাণীকে বক্ষা কববাব জন্যে ধর্মপাল তাকে নিযে বনপ্রদেশে চলে এসেছিলেন। কল্যাণী বক্ষাকর্তা ধর্মপালেব প্রেমে পডল। ধর্মপালও কল্যাণীকে ভালবাসলেন।

গোপালদেবেব সমযে বাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিবে এসেছিল। তিন বৎসব পব গোপালদেবেব মৃত্যু হয।

ভাবতবর্ষে তখন যুদ্ধ লেগেই ছিল। গুর্জববাজ এবং বাষ্ট্রকূটপতি সে সমযে ভাবতবর্ষে প্রবল প্রতাপে বাজত্ব কবছেন। কান্যকুব্জবাজ ইন্দ্রাযুধ গুর্জববাজেব প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। ইন্দ্রাযুধ জ্যেষ্ঠ বজ্রাযুধেব পুত্র চক্রাযুধকে বাজ্যের অধিকাব থেকে বঞ্চিত কবেছিলেন। চক্রাযুধ গৌড়দেশে এলেন। তখন গৌড়াধিপ ধর্মপাল। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দেব কাছে ধর্মপাল চক্রাযুধকে সর্বপ্রকাব সাহাধ্য কববেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। বিশ্বানন্দেব সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহায্য পেলেন। সদ্ধর্ম এবং সদ্ধর্মীদেব বক্ষা কববাব প্রতিশ্রুতিও ধর্মপাল দিলেন। ধর্মপাল কল্যাণীব প্রণয়াসক্ত। কিন্তু বিবাহে বাববাব বাধা পডছিল। পিতাব মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই শুভবিবাহে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। এব পব ধর্ম-পালেব যুদ্ধযাত্রা। গুর্জরবাজ-বাণভট্টেব সঙ্গে যুদ্ধে বাঙালি সৈন্য অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রাযুধ রাজত্ব পেল। কিন্তু যুদ্ধ থামল না। অবশেষে

রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সহায়তায় বাংলা দেশ রক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজা যখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটপতির কন্যাকে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। আবার যুদ্ধ বাধল। বাংলার সৈন্য শেষ সংগ্রাম করলে। গোবিন্দ বাঙালি সৈন্যের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে। কিন্তু কল্যাণী তখন মৃত্যুপথযাত্রী। দেশের মঙ্গলের জন্যে কল্যাণীর জীবন উৎসর্গিত হল। কল্যাণীর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটবংশের কন্যা রন্নাদেবীর সঙ্গে ধর্মপালের বিবাহ হল। ধর্মপালদেবের রাজত্বের বিস্তৃত ঘটনা বাহুল্যভয়েই সম্ভবত রাখালদাস বর্ণনা করেন নি।

এবারে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি বিচার করি।

খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে গোপালদেবের রাজপদে বৃত হবার ঘটনাটি গৃহীত।[১] তাম্রশাসনটি এই রকম—

‘প্রজাবৃন্দ সেই বপ্যটের পুত্র নৃপতিশিরচূড়ামণি শ্রীগোপালকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন দেশে মৎস্যন্যায় দূরীভূত করবার জন্য। দিগন্তে বিস্তৃত যাঁর সনাতনযশোরাশি জ্যোৎস্নাধবলিত পূর্ণিমা রজনীর দ্বারা কথঞ্চিত অনুকৃত হতে পারে।’

মাৎস্যন্যায় বলতে সাধারণভাবে অরাজকতা বুঝি। প্রবলের উপর দুর্বলের অত্যাচার, রাজ্যে দণ্ডশক্তির অভাব মাৎস্যন্যায়ের পরিচয়। এর সঙ্গে তিব্বতীলামা তারনাথের বিবরণ মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় গোপালদেবের পূর্ববর্তী গৌড় দেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। অশান্তি-অরাজকতায় দেশ ছিন্নভিন্ন। রাজসভায় চক্রান্ত—অন্তঃপুরেও ব্যভিচার ষড়যন্ত্র। তার উপর পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এ অবস্থা থেকে মুক্তিকামনায় প্রজারা গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত করলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ধর্মপালে’ দেশের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি প্রজাদের দ্বারাই গোপালদেব নির্বাচিত হন এই মতটি মেনে নেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামন্তদের দ্বারা গোপালদেব নির্বাচিত হন। এ জন্যেই গোকর্ণদুর্গের কাহিনীটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সম্ভবত এইটি নূতন তথ্য বলে উপন্যাসে এ কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকার করেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে আর বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। একান্ত কল্পনার উপর নির্ভর করেন নি বলে গোপালদেবের কাহিনীকে রাখালদাস বিস্তৃত করেন নি। দেদ্দদেবীর উল্লেখও ইতিহাসে আছে।

১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা

ধর্মপালেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য বয়েছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ এবং নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়েশ্বব ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান নায়ক।[১] গোপালদেবেব[২] সময়েই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই কাবণে ধর্মপাল বাজ্যবিস্তাবে মনোযোগ দিতে পারলেন। চক্রায়ুধ যে ইন্দ্রায়ুধেব পুত্র নয়, নগেন্দ্রনাথ বসুব এই মতকে বাখালদাস নানা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত কবেছেন। বাখালদাস বলেছেন, খালিমপুবেব তাম্রশাসনেব সাক্ষ্যেই বোঝা যায চক্রায়ুধ ধর্মপাল কর্তৃক বাজত্ব পান।

'।তান মনোহব ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ মৎস্য মদ্র কুরু যদু, যবন অবন্তি গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদেব নবপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ—চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিযা কীর্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকমল উদ্ধৃত কবাইযা কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।'[৩]

এই লিপিই বাখালদাসকে বজ্রায়ুধ এবং চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ প্রসঙ্গ অবতাবণায় সাহায্য কবেছে। বাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দেব সঙ্গে ধর্মপালেব বিবোধেব কাবণটি কি জানা যায না। এই কাবণটি অজ্ঞাত বলে বাখালদাস বণ্ণা দেবীর প্রসঙ্গটিকে কৌশলে স্থাপন কবেছেন। কেউ কেউ অনুমান কবেন ধর্মপাল বৃদ্ধ বয়সে বণ্ণা দেবীব পাণিগ্রহণ কবেন। সে যাই হোক, বাখালদাসেব এ কল্পনা উপন্যাসেব দিক থেকে সার্থক, আমাদেব বাস্তববোধ জাগাতে সাহায্য কবে। ইতিহাসে এ বকম ঘটনাব অভাব নেই। সুতবাং ঐতিহাসিক পবিবেশেব দিক থেকে ঘটনাটিব প্রযোজনীযতা অনস্বীকার্য। ঘটনাব সম্ভাব্যতাব দিক দিযেও বাখালদাসেব এ কল্পনা উচ্চ প্রশংসাব যোগ্য। বাণভট্ট-কাহিনী নিযে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'বাঙ্গলাব ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে। কল্পনাব আশ্রয় দেখতে পাওয়া যায সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ ইত্যাদিব চবিত্র পবিকল্পনাতে। গুর্জরবাজেব সঙ্গে আর্যসংঘেব কোন সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওযা যায না। বুদ্ধভদ্র গোপনে গুর্জববাজেব সঙ্গে ষডযন্ত্র কবে বাংলায গুর্জববাজেব আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেযেছিলেন। বৌদ্ধধর্মেব এই অধঃপতনেব চিত্র লেখকেব ইতিহাসেব সম্বন্ধে বিশেষ ধাবণাসঞ্জাত। বজ্রযানী হীনযানী, মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন কলহে মুখব। 'কৃষ্ণসর্প' নারায়ণ ঘোষেব মৃত্যু হযেছে সম্ভবত বজ্রযানী বৌদ্ধ বলে। মহাযানী সম্প্রদায ধর্মপালেব

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২. R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, *Age of the Imperial Kanauj*

৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা

সহায়তায আত্মবক্ষা এবং আত্ম-প্রসাবে উন্মুখ, আবাব বুদ্ধভদ্র ইত্যাদি বৌদ্ধেবা সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মেব প্রসাবেব আশায গুর্জরবাজেব প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধভদ্রেব ব্যর্থতাব কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত।

তবে ধর্মপালেব কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা। ধর্মপাল-কল্যাণী প্রসঙ্গও উপেক্ষিত হয নি। ধর্মপালেব কল্যাণীব প্রতি আসক্তিব চিত্রটি বাস্তবসম্মত উপাযে বর্ণনা কবা হযেছে। প্রশস্তিলিপিব সাহায্যে ধর্মপালেব চিত্রটি বাখালদাস রূপায়িত কবেছেন। লেখক ধর্মপালেব প্রকৃত গৌবব এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। কল্যাণীব আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায দীপ্যমান। বণ্ণা দেবীব বিবাহ প্রসঙ্গে বাজ্যে যখন যুদ্ধ আসন্ন হযে উঠল তখন সাধাবণ নবনাবীব কল্যাণীব প্রতি বিরূপতা কযেকটি দৃশ্যে সুন্দব ফুটেছে।

ধর্মপালে বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব লক্ষিত হয। মাৎস্যন্যাযেব ফলে অবাজকতাব দৃশ্যটি আনন্দমঠেব মন্বন্তবেব চিত্রটিব অনুকবণে বচিত। বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ আনন্দমঠেব চবিত্রগুলিকে স্মবণ কবিযে দেয়। বিশেষত ধর্মপালেব উত্থানেব মূলে বিশ্বানন্দেব প্রভাব অনেকটা দাযী। জনাদন, অগবা দিগ এবং বিপদেব ক্ষেত্রে নিজে অগ্রসব হযে বিশ্বানন্দ ধর্মপালকে সাহায্য কবেছে। এ কাহিনী কল্পিত হলেও ঐতিহাসিক পবিবেশে বেমানান হয নি।

ভীষ্মেব চবিত্র আদর্শবাদেব দ্বাবা অনুবঞ্জিত। দেশেব জন্যে তাব আত্মত্যাগ গৌববদীপ্তি লাভ কবেছে। ধর্মপালেব ভীষ্ম পৌবাণিক ভীষ্মেব কথা অবশ্যই স্মবণ কবিযে দেয।

'ধর্মপালে' যে স্বদেশপ্রেবণা আছে সেটি 'করুণা'তে আবও পবিস্ফুট। কেউ কেউ করুণাব প্রভাব ধর্মপালে দেখতে পান। এ ঠিক নয। কেননা 'ধর্মপাল' ১৩২২ সালে ছাপা হয় আব 'করুণা' উপাসনা পত্রিকায ১৩২৪ সাল পর্যন্ত বেরিযেছিল। ববং ধর্মপালেব অনেক চবিত্র যেমন কল্যাণী, পুরুষোত্তম ভীষ্মদেব, করুণায অকণা, ঋষভদেব এবং অগ্নিগুপ্তেব উপব প্রভাব ফেলেছে।

ধর্মপালেব আবম্ভটি দুর্গেশনন্দিনীব কথা মনে কবিযে দেয। দুর্গস্বামিনীব কন্যাব প্রতি প্রেম ঐতিহাসিক উপন্যাসেব একটি সহজ ও বহুলব্যবহৃত উপাদান।

করুণা

'করুণা' ধাবাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেবিয়েছিল। পবে ১৩২৪

সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'ইহা "শশাঙ্কের" ন্যায় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকামাত্র, ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না।' গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন বক্তৃতাকারে। ইতিহাসচর্চার এক পরিণাম 'করুণা' উপন্যাস।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে তিনি গুপ্ত যুগকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেন? এর কারণ বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি প্রকরণ, তার মধ্যে একটি উত্তরাপথের ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি করলেন, উপন্যাসেও তাকে যথাযথ রাখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতের ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলির বর্ণনা করাও লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক।

তা ছাড়া বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যোগাযোগের অন্যতর কারণ উল্লেখ করেছেন।

'ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড় বঙ্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।'১

সুতরাং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে বাঙ্গালার ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্কন্দগুপ্ত-শশাঙ্ক-ধর্মপাল এই ইতিহাসের ক্রমপরিণত রূপ।

আবার হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের রূপটিকেও ভুললে চলবে না। কেননা লেখক এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সে আলোচনা যথাস্থানে করব। এই বিরোধের রূপটি গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ এ রকম একটা ধারণা লেখকের ছিল।

কিন্তু 'করুণা'তে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের স্বদেশ-প্রেরণা। স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে লেখকের ধারণা ছিল অনুকূল। তিনি একস্থানে বলেছেন,

১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, 'ভূমিকা'

'He was the last great hero of Magadha who realised that it was his duty to defend the gates of India with the last drop of his blood He spent his whole life in the performance of this noble task and at the end of it sacrificed himself cheerfully in the performance of this sacred duty '১

দেশেব জন্য এ বকম আত্মোৎসর্গ রাখালদাসকে মুগ্ধ করেছিল। রাখালদাসেব এই বিস্ময়বিমুগ্ধ চেতনা থেকে 'করুণা'র সৃষ্টি।

কাহিনীও শশাঙ্কেব মতো শিথিল নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক বোমান্স বলতে যা বুঝি সেই-রকম প্লট করুণায় আছে।

'করুণা'র নায়ক স্কন্দগুপ্ত প্রথম কুমাবগুপ্তেব জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম কুমাবগুপ্তেব রাজত্বে বিলাসব্যসনেব প্রাচুর্য ছিল। রাজশক্তিব এক প্রধান অংশ এই বিলাস-কলাকুতূহলে নিবিষ্ট। এমন-কি বাজা কুমারগুপ্ত পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে গণিকা ইন্দ্রলেখার কন্যা অনন্তাদেবীর আসক্ত। বৃদ্ধ মহানায়ক দামোদবগুপ্ত বাজাকে বাধা দেবাব চেষ্টা কবেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালন্ধব থেকে কুমাবগুপ্তেব ভ্রাতা গোবিন্দগুপ্তকে ডেকে আনলেন বাজ্য এবং রাজাকে সর্বনাশ থেকে বক্ষা করবাব জন্য। বাজা যখন বিবাহে উদ্যত তখন তাঁব চেষ্টায তা বোধ হল। এই বিবাহেব মূলে ছিল এক বৃহত্তর ষডযন্ত্র। কুমাবগুপ্তেব মৃত্যুব পব স্কন্দগুপ্ত বাজা হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতিব আশা নেই—এই কারণে বৌদ্ধধর্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাজাব সঙ্গে অনন্তাদেবীব বিবাহ দেবাব বন্দোবস্ত কবলে।

ওদিকে উত্তরাপথে বাব বার দুর্ধর্ষ হূন জাতি ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবছিল। এই আক্রমণ থেকে ভাবতকে বক্ষা কববাব দায়িত্ব মগধেব। সুতবাং বাজধানীব গোলযোগ থামিযে স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র ইত্যাদি সকলে হূন আক্রমণ প্রতিবোধেব জন্য প্রস্তুত হল। বাহ্লীকতীরে, বক্ষুতীবে গুপ্ত সেনানীব সমাবেশ হল। হূন আক্রমণেব বিরুদ্ধে বীবত্বের সঙ্গে সংগ্রাম কবে অগ্নিগুপ্ত দেহত্যাগ করলেন। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অন্যান্য সেনার সাহায্যে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ কবে হূন আক্রমণ প্রতিবোধ কবলেন। জয়েব আনন্দে সকলে আত্মহাবা। সকলে জয়লাভ করে দেশে ফিবে এল। মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে উঠল। পট্টমহাদেবী পুত্রেব বিজয়বার্তায় আনন্দিত। তাঁব পালিতা কন্যা করুণা এবং অরুণা। করুণা গৌডদেশীয় সেনাপতি যুবরাজেব সখা ভানুমিত্রেব পত্নী। অরুণা স্কন্দগুপ্তের বাগদত্তা। আবাব হূন আক্রমণ শুরু হল। অরুণাকে বিবাহ না কবেই স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধযাত্রা করলেন।

---

১. R. D. Banerji, *Age of the Imperial Guptas*

হবিবল-ইন্দ্রলেখাব চক্রান্তে পুনবায় অনন্তাদেবী মহাবাজেব সামনে এল। মহাবাজেব চিত্ত টলমল। পট্টমহাদেবী সব শুনলেন। তিনি আত্মহত্যা করে আত্মাবমাননা থেকে মুক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায্যে যখন এই বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি চন্দ্রসেন অরুণাব উপব অত্যাচাব কবতে চাইলে। ক্ষোভে-রোষে অরুণা কোনো বকমে আত্মবক্ষা কবে পাটলিপুত্র পবিত্যাগ করলেন। এক সন্ন্যাসী অরুণাকে পলাযনে সাহায্য কবলেন।

হূনযুদ্ধে যুববাজ স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র অসীম বীবত্ব প্রদর্শন কবলেন। এমন সমযে পাটলিপুত্রেব সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগুপ্তেব কাছে বাজ্যেব বিশৃঙ্খলাব সংবাদ বললে। গোবিন্দগুপ্ত দ্রুত পাটলিপুত্র অভিমুখে বওনা হলেন। অগ্নি আগেই জ্বলেছে, এবাব তাব অঙ্গারের চিহ্ন লক্ষিত হবে। মহাপ্রতীহাব কৃষ্ণগুপ্ত বাহ্লীকতীবে যুববাজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, 'ভীষণ অত্যাচাবে গুপ্তকুললক্ষ্মী বিচলিতা। গুপ্তকুলরবি, তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবিতে আর্যাবর্তে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।'

বাজ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খলা। সব অনন্তাদেবীব আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে অনন্তাদেবীব অনুবোধে বৃদ্ধ মন্ত্রী দামোদব শর্মাকে বন্দী কববাব আদেশ দিলেন। চন্দ্রসেন স্কন্দগুপ্তকে বন্দী কববাব আদেশ নিযে বাহ্লীকে এল। হূনযুদ্ধে সেনাপতি চন্দ্রসেন। যুববাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুবে হূনেবা আক্রমণ কবে করুণাকে হরণ কবলে। করুণা তাব পব থেকে হূনদেব কাছে দেবী রূপে পবিচিতা। স্কন্দগুপ্ত ও ভানুমিত্র করুণাব সন্ধানে এসে বিফল হলেন। ভানুমিত্র করুণাব শোকে প্রায় উন্মত্ত। শতদ্রুতীবেব যুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত পুনবায বিজয়ী হলেন। বক্ষুতীবেব যুদ্ধের পব অনন্তাদেবী যুববাজকে ডেকে পাঠালেন। কেননা গোবিন্দগুপ্তেব চেষ্টায অনন্তাদেবী এখনও আপন ক্ষমতাব যথেচ্ছ ব্যবহাব কবতে পাবেন নি। স্কন্দগুপ্তেব জয়লাভে অনন্তাদেবী এবং বৌদ্ধবা আশঙ্কিত হল।

যুববাজ পাটলিপুত্রে এলে মগধবাসী তাঁব উপযুক্ত অভ্যর্থনা কবলে। কিন্তু মাতাব মৃত্যুতে বাজ্যেব অশান্তিতে যুববাজেব শান্তি ছিল না। এব পব যুববাজ অরুণাব সঙ্গে দেখা কবলেন। অরুণা তখন আশ্রমবালিকা। যুববাজকে দেখে তাব পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। অরুণা এবং যুবরাজেব বিবাহ হল। পাটলিপুত্রেব চরম অধঃপতনেব পবিচয় পাই গণিকা ইন্দ্রলেখাব সখী মদনিকার ব্যবহাবে। গৌল্মিক সেনাপতি দেবধর মদনিকা-কর্তৃক

অপমানিত। হর্ষগুপ্ত মদনিকাকে প্রহার করলেন। মদনিকার প্ররোচনায় দেবধবেব মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হল। দেবধব এবং তাব নবপরিণীতা স্ত্রী উভয়েই আত্মহত্যা কবে বাজ্যের অনাচাবেব দিকটি প্রকাশ কবে দিলে। কুমারগুপ্ত লজ্জায় পালিযে গেলেন। এব পবও কুমাবগুপ্তেব চেতনা ফিবে আসে নি। স্কন্দগুপ্ত একেব পব এক যুদ্ধ কবে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হাবালেন। গল্পের ফলশ্রুতি বন্ধুবর্মা এবং মুবারিগুপ্তেব কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়—

'স্কন্দ গিযাছে, মহারাজপুত্র গিযাছেন, বৈষ্ণব অভিজাতসম্প্রদায় গিযাছে, আর্যসংঘর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে সদ্ধর্মি, উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক, দেশ, ধর্ম, পুর্বস্মৃতি বিসর্জন দিযা, মগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিযা, তাহার পরিবর্তে আর্যসংঘ সদ্ধর্মেব উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।'

ইতিহাসেব উপাদান বিচাবে লেখকেব সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ কবি। 'স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, কুমাবগুপ্ত, বন্ধুবর্মা, চক্রপালিত, হর্ষগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্কন্দগুপ্তেব হূনযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক কথাই কাল্পনিক।' বাখালদাস বলেছেন তিনি *Fleet's Corpusus Inscriptionum Indicarum* থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ কবেছেন। ডক্টব স্বকুমাব সেন বলেছেন, সে-যুগেব কবিব প্রশস্তিলিপিও লেখকেব সহাযক হযেছিল। পববর্তী আবিষ্কাবেব ফলে 'তোরমানকে এখন আব স্কন্দগুপ্তেব সমসামযিক বলিতে পাবা যায না এবং ইহা স্থিব যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হূনগণ গুপ্ত সাম্রাজ্য অধিকাব করিতে পাবে নাই। স্কন্দগুপ্তেব দুই পুরুষ পবে তোবমান মালব অধিকাব কবিযাছিল।'

পুবগুপ্তেব লিপিতে স্কন্দগুপ্তেব নাম পাওযা যায না। এব কাবণ কি? এখানে অনুমান ভিন্ন উপায় নেই। সম্ভবত পুবগুপ্তেব সঙ্গে স্কন্দগুপ্তেব বনিবনা ছিল না। এবং বাজ্যে অধিকাব নিযে এঁদেব মধ্যে গোলযোগ ঘটবাবও সম্ভাবনা। পুবগুপ্ত তা হলে কি স্কন্দগুপ্তেব বৈমাত্রেয? এব থেকে এ অনুমান স্বাভাবিক যে স্কন্দগুপ্ত কুমাবগুপ্তেব প্রথম মহিষী অনন্তাদেবীব পুত্র। অনন্তা-দেবীর পবিচয়ও ঐতিহাসিক। ইতিহাস থেকে এই সূত্রটিকে নিয়ে লেখক স্কন্দগুপ্ত এবং পুবগুপ্তেব কাহিনী রচনা কবেছেন। জ্যেষ্ঠকে উত্তরা-ধিকাব থেকে বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটনা। হযতো এর মধ্যে কুমারগুপ্তেব পত্নী অনন্তাদেবীব প্রবোচনা ছিল। যদি এই প্ররোচনা থেকে থাকে তবে অনন্তাদেবীর উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যায় না। অথচ অনন্তাদেবীর

নামে সে বকম কোনো কলঙ্ক ইতিহাসে নেই। সুতবাং লেখক ভিলেন ইন্দ্রলেখাকে সৃষ্টি কবেছেন। অত্যাচার-অনাচাবেব দায়িত্ব ইন্দ্রলেখাব উপবেই এসে পড়ে। আবার কুমাবগুপ্তেব দীর্ঘ বাজত্বকালে এটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাসী হযে পড়েন। তাঁব সময় থেকেই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যেব অধঃপতন শুরু। কুমাবগুপ্তেব অধঃপতনেব প্রকৃত কাবণ কি তা জানা না থাকলেও লেখক-প্রদর্শিত পথকে একেবাবে অবহেলা কবা যায় না। সুতবাং রাখালদাসেব কল্পনা উপন্যাসেব বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে কবি।

ইতিহাসে স্কন্দগুপ্তেব কোনো পত্নীব উল্লেখ পাওযা যায না। যে-সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে তাব মধ্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁব পত্নীর উল্লেখ দেখতে পেযেছেন। মনে কবি, সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণাব চিত্রটি অঙ্কন কবেছেন। স্কন্দগুপ্তেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বচনাব উৎসস্থল ভিটবী গ্রামেব শিলা। অন্তর্বেদীব যুদ্ধও ঐতিহাসিক। উপন্যাসেব প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়ই বাখালদাস তার বাবানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালযেব বক্তৃতামালায তথ্যপ্রমাণযোগে ব্যবহাব কবেছিলেন। লক্ষণীয—আজ পর্যন্ত স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয নি। দেবধব এবং অমিযাব কাহিনীব মধ্যে ঐতিহাসিকতা কিছু নেই। তবে লেখকেব পবিবেশ বচনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। বোহিতাশ্ব দুর্গ ঐতিহাসিক। এই দুর্গেব অধিপতিবা যে গুপ্তসাম্রাজ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জডিত ছিলেন তাতে সন্দেহেব অবকাশ নেই।

গোবিন্দগুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায না। কেউ কেউ মনে করেন তিনি মালব দেশেব অধিপতি ছিলেন। ভানুমিত্র-করুণা কাহিনী লেখকেব কল্পনাপ্রসূত। মগধেব সঙ্গে গৌডেব সংযোগসাধনেব জন্য লেখকেব এই পবিকল্পনা নিশ্চযই প্রশংসাব দাবি বাখে। গল্পেব শেষে লেখক বৌদ্ধধর্ম প্রচাবেব কথা উত্থাপন কবেছেন। থানেশ্ববাজ এবং যশোধর্মেব ঐতিহাসিকতাব সাক্ষ্যে লেখক এই কথা বলেছেন। এই বাজাদেব সমযে বৌদ্ধধর্ম আবাব নবজীবন লাভ কবে এ কথা সর্বজনবিদিত।

কাহিনীটিকে লেখক কতগুলি ভাগে সাজিযেছেন—বোধিসত্ত্বায় অগ্নি, অঙ্গার, ভস্ম। প্রথম ভাগকে 'বোধিসত্ত্বায' বলায় লেখকেব অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা স্থিব ধাবণা কবা যায়। সমগ্র কাহিনীটিব মধ্যে কুমাবগুপ্তের দুর্বলতা এবং হিন্দুসৈনিকেব বীবত্বেব কথা বলা সত্ত্বেও লেখক মূল কথা এতে বলেন নি।

গল্পের ফলশ্রুতি থেকে বোঝা যায় গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য দায়ী বৌদ্ধ প্রবোচনা এবং ষড়যন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই হিন্দুরাজত্বে অগ্নি জ্বলে উঠল। তারই অঙ্গার এবং ভস্মের চিহ্ন স্কন্দগুপ্তের পরিসমাপ্তিতে। দেখা যাবে, ইন্দ্রলেখা এবং হরিবলের ষড়যন্ত্রের একটি অধ্যায়ের শিরোনামাতে আছে 'অগ্নিতে ইন্ধন', আর একটিতে আছে 'অগ্নি জ্বলিল'। এর পর এই অনুমান স্বাভাবিক যে বৌদ্ধরাই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। বাহ্লীকবীর ব্রাহ্মণের কাছে হরিবল স্পষ্টত স্বীকার করেছে যে হূন আক্রমণ আসলে রাজ্যের পক্ষে অভিশাপ নয়—আশীর্বাদ। পুরগুপ্তর হূনদের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষার পশ্চাতেও বৌদ্ধদের আশঙ্কা জয়যুক্ত হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের মৌলিক দিকটি উপন্যাসেও বিস্তৃত হয়েছে। হরিবলের উক্তি থেকে জানতে পারি বৌদ্ধদের আসল শত্রু—গুপ্তরাজকুল। হূনরা যেমন তাদের শত্রু, গোবিন্দ, দামোদর স্কন্দ আর বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি শত্রু। 'শত্রুবিনাশে শত্রক্ষয় হউক, সাম্রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট।'

কিন্তু 'করুণা'য় এই দিকটি প্রকাশিত হলেও 'শশাঙ্ক'র মতো এ বস্তু আত্যন্তিক হয়ে ওঠে নি। পূর্বে বলেছি প্রবল স্বদেশপ্রেরণা থেকেই এই কাহিনী রাখালদাস লিখেছিলেন। কতগুলি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করি।

অগ্নিগুপ্তের আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায় দীপ্যমান—'দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, দেবতার জন্য, রমণী ও ব্রাহ্মণের জন্য কয়জন মরিতে পারে? যে পারে সে মানুষ নহে, দেবতা।' এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অগ্নিগুপ্ত হূনযুদ্ধে নিহত হন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও—

'যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি রক্ষা করিয়া মরিব' এইটি ছিল তার মূল মন্ত্র।'

গ্রহাচার্যের আকাঙ্ক্ষা আসলে রাখালদাসের নিজেরও আকাঙ্ক্ষা—

'অগ্নিগুপ্ত, আবার আসিও—দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও।'

অগ্নিগুপ্ত আসলে গুপ্তকুলরবি স্কন্দগুপ্তেরই অংশ। স্কন্দগুপ্তের জীবনেও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখি। মাতৃভূমি রক্ষার উদগ্র বাসনা স্কন্দগুপ্তকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। শিলালেখের সাক্ষ্যে রাখালদাসও স্কন্দগুপ্তকে নারায়ণ বাসুদেব রূপেই চিত্রিত করেছেন। দুষ্কৃতকারীর দমন এবং সাধু-ব্যক্তির পরিত্রাণ এইটি তাঁর জীবনের লক্ষ্য। রামাকণ্ঠের ধ্বনিতে স্কন্দগুপ্তের আসল পরিচয় পাই—

'কে সে মাগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্যাবর্তের পরিত্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্তা, বক্ষুবাহ্লীক ও শতদ্রুর যুদ্ধজেতা। বন্ধুগণ, সে মাগধ, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরমাত্মীয়, তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত।'

লেখক স্কন্দগুপ্তের জবানিতে বিংশ শতাব্দীর জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক কালের বিভেদও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। অগ্নিগুপ্তের জবানিতে অন্তর্বিরোধে রাজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত—

'কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ সূচিত হইবে সেইদিন চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের সাম্রাজ্য শতধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। পুষ্যমিত্র ধূলিমুষ্টির জন্য স্বর্ণমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইও না।'

স্কন্দগুপ্তের ট্র্যাজেডি পাঠকের সমবেদনা জাগায়। রাষ্ট্রনীতির কুটিলচক্রে নিবেদিত হয়েছে স্কন্দগুপ্তের পত্নী অরুণাদেবীর দেহ। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ চরিত্রটিকে অলোকসামান্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে। দেবধর-অমিয়া কাহিনী শিথিলবদ্ধ। কিন্তু 'স্বামীধর্মে'র রূপটি পরিস্ফুট করার জন্য এর সার্থকতা।

গ্রন্থটির নাম 'করুণা'। এবং করুণা চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দুর্বলতা সর্বাধিক। করুণার উন্মত্ত অবস্থা এবং হূনদের মাতারূপে গৃহীত হবার কাহিনী প্রহেলিকার স্তরে উপনীত। ঋষবদের সংস্কৃত বিদূষক চরিত্রের উন্নত সংস্করণ। শৌণ্ডিকালয়ের চিত্রও মৃচ্ছকটিকের আদর্শে চিত্রিত। ইন্দ্রলেখা ভিলেন জাতীয় চরিত্র। হরিবলকে রাখালদাস বলেছেন বৌদ্ধাধম। তাঁর ধারণা অনুযায়ীই এই চরিত্র অঙ্কিত।

ময়ূখ

মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করার পর রাখালদাসের দৃষ্টি পড়ল মোগল রাজত্বের প্রতি। লেখক ভূমিকাতে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচার করেছেন।

'ময়ূখে'র কাহিনীটি এই: পর্তুগীজ অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত। বাংলাদেশের জমিদারপুত্র ময়ূখ পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার প্রণয়ী ললিতা। পর্তুগীজরা ললিতাকে হরণ করে নিলে। ময়ূখ যথাসাধ্য বাধা দিয়ে আহত হল। এমন সময়ে ময়ূখ সপ্তগ্রামবাসী বণিক গোকুলবিহারী সেনের আশ্রয় পেলে। বণিক এবং ময়ূখ পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে।

উভয়েই দেশেব এই অত্যাচাব নিবাবণেব জন্য সম্রাটের সাহায্যের কথা ভাবলে। গোকুলবিহাবী সেনেব চেষ্টায ময়ূখ সপ্তগ্রামে এল। এখানে বাদশাহের পালিতা কন্যা গুলরুখ ময়ূখেব অনুপম দেহকান্তি দেখে তাকে ভালোবাসলে এবং ময়ূখকে লাভ কববাব জন্য নানা উপায় চিন্তা কবতে লাগল। সপ্তগ্রামেও পর্তুগীজেবা অত্যাচাব নিপীড়ন কবছিল। ময়ূখ নিজেও বাধা দেবাব চেষ্টা কবে আহত হল। ইতিপূর্বেই ময়ূখেব পবিচয সপ্তগ্রামেব মোগল শাসনকর্তা আসদ খাঁ জানতে পেবেছিলেন। সপ্তগ্রামেব যুদ্ধে গুলরুখও বন্দী হল। ছাডা পেয়ে ময়ূখকে আহত অবস্থায দেখে তাকে বজবায নিযে এল। ময়ূখের তখন স্মৃতিভ্রংশ। গুলরুখকে ললিতা মনে কবলে। ললিতা পর্তুগীজ অত্যাচাবে উন্মত্ত হযে হুগলিব কাছে বিনোদিনী বৈষ্ণবীব গৃহে আশ্রয পেযেছিল। ময়ূখ সেখানে এলে উভযেব পূর্বেব কথা মনে পডল। গুলরুখ আশ্রমে এল। বিনোদিনী বৈষ্ণবী ময়ূখ ললিতা গুলরুখ দিল্লীতে উপনীত। গুলরুখ ময়ূখকে বাদশাহেব অন্তঃপুবে আনবাব ব্যবস্থা কবলে। ময়ূখ বাদশাহেব কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদাব নিযুক্ত হল। যেদিন সে মনসবদাব নিযুক্ত হল সেদিনই গুলরুখেব প্রেবিত লোকজন ময়ূখকে হতচেতন কবে মোগল-অন্তঃপুবে নিযে এল। ললিতাব সঙ্গে ময়ূখেব বিবাহেব সব ঠিকঠাক ছিল। গুলরুখ ময়ূখেব কাছে প্রেমভিক্ষা করলে। তা উপেক্ষিত হল। সুতবাং তাব প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নির্দিষ্ট হল। ময়ূখকে যখন ফাঁসিমঞ্চে চডানো হল তখন নাটকীয ভাবে মমতাজেব আবির্ভাবে ময়ূখ বক্ষা পেল। শাহজাহান সমস্ত শুনতে পেলেন। গুলরুখ আপন কৃতকর্মেব কথা নিবেদন কবলে। এব পব ময়ূখ হুগলি-অধিকাবকালে মোগলসেনাব সাহায্য কবলে। বিজযী ময়ূখ ললিতাকে বিবাহ কবে সম্রাটেব সঙ্গে মিলিত হল মমতাজেব সমাধিব পাশে। মমতাজেব স্মৃতি সকলেব মধ্যে প্রেমেব উদাব ভাবনা এনে দিলে।

ময়ূখ-ললিতা-গুলরুখেব কাহিনী বমেশচন্দ্রেব মাধবীকঙ্কণেব কথা স্মবণ কবিযে দেয়। নবেন্দ্রেব মতো ময়ূখও ভাগ্যবিডম্বিত, পিতাব অধিকাববঞ্চিত। হেমলতাব জন্য এবং পিতাব বাজ্য উদ্ধাব কবাব আশায নবেন্দ্র মোগল-বাজপুত দ্বন্দ্বে জড়িযে পডেছিল। জেলেখাব আবির্ভাব নবেন্দ্রেব জীবনে অবিস্মবণীয় ঘটনা। জেলেখা প্রেমবঞ্চিত। ময়ূখও পর্তুগীজ-মোগল দ্বন্দ্বে নিজেকে জডিযেছে, গুলরুখেব প্রেমকে সেও প্রত্যাখ্যান কবেছে। জেলেখা মৃত্যুববণ কবে প্রেমেব দীপ্তিতে ভাস্বব, গুলরুখ চোখ অন্ধ করে রূপতৃষ্ণা জয়

করেছে। উভয়ের প্রেমেই মহত্ত্বের দিক আছে। সাদৃশ্য আরও আছে। মিল যেমন আছে, অমিলকেও তেমনি উপেক্ষা করা যায় না। নরেন্দ্রের পরিণতি ময়ূখের মতো মিলনে নয়। জেলেখা তাতারী, গুলরুখ বাদশাহ-পালিতা। বৃদ্ধের প্রশ্নে ময়ূখ সম্বন্ধে গুলরুখই বলেছিল 'আমার খসম'। উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালকুণ্ডলার মতিবিবির উক্তির প্রতিধ্বনি।

লেখক পর্তুগীজ হার্মাদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে' পর্তুগীজ মগ দস্যুদের নৃশংসতার কথা বলেছেন। গঞ্জালিসের উল্লেখ প্রতাপচন্দ্রও করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের নরহরি সরকারের কথা জানতেন কি না জানি না, তবে চৈতন্যদাসের নির্যাতনের কাহিনী ময়ূখ-ললিতার ঘটনারই অনুরূপ। শিষ্যকে গচ্ছিত রেখে নরহরি পর্তুগীজদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। শিষ্য লোচনদাসের প্রশংসা করে মধ্যযুগে কবি লিখেছিলেন "গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ'।[1] রাখালদাসও চৈতন্যদাসের উপর পর্তুগীজ পাদ্রীর অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার জীবন্ত চিত্র দিয়েছেন। পর্তুগীজেরা পরবর্তী ইংরেজ পাদ্রীদের মতো শিক্ষা-উপদেশের বিশেষ ধার ধারত না।

তথাপি রাখালদাসের রচনায় আতিশয্য লক্ষণীয়! যে সময়ে ময়ূখ বেরোয় তার অনেক আগেই পর্তুগীজদের বিবরণ বেরিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির স্মৃতিতে মধ্যযুগের কবিবর্ণিত পর্তুগীজ-দস্যুতার বিবরণগুলিই দৃঢ়মূল হয়েছিল। রাখালদাসও এই স্মৃতির উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন।[2] ফলে কিছুটা তথ্য কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে রাখালদাস পর্তুগীজ-নৃশংসতার দিকটিকেই স্পষ্ট করেছেন। ম্যানরিকের উক্তি যে মিথ্যা সেইটি প্রমাণ করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পর্তুগীজ ধর্মান্তরকরণের পাশাপাশি চৈতন্যদাসের কৃষ্ণভক্তির জয়ঘোষণা কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈতন্যদাসের চিত্রে আদর্শবাদ থাকলেও তা বিশেষ বেমানান হয় নি। চৈতন্যদাসের ভূমিকা স্পষ্ট এবং সাহিত্যগুণোপেত।

বাঙালিবীর ময়ূখের প্রথম যুদ্ধটি রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত। রোমান্সের আতিশয্য লক্ষিত হয় সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনে। 'ধর্মপালে' বিশ্বানন্দ-অমৃতানন্দের চরিত্রেও এই রোমান্সপ্রবণতা জয়ী হয়েছে। ময়ূখের ভাগ্যবিচার, জাহাঙ্গীর-

---

১. শ্রীসুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী

২ T. K. Roy Choudhury, *Bengal under Akbar and Jahangir*

নগরে তাঁব আবির্ভাব, সম্রাট শাহজাহানেব সন্ন্যাসীব কাছে নতিস্বীকাব কিছুটা আকস্মিক। চণ্ডীচরণ সেনেব বামেশ্ববেব আচরণ এবং সন্ন্যাসীর ব্যবহাব প্রায় অনুরূপ। সম্রাটমহিষী মমতাজের আকস্মিক আবির্ভাবও অনুরূপ রোমান্স-ভাবনাদীপ্ত।

ময়ূখেব ঐতিহাসিক পবিবেশটি সুন্দবভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশে বিধি-বিধানেব প্রতি সমাজনাযকদেব আত্যন্তিক আস্থা দেখি। সেইটি পবিস্ফুট হযেছে ললিতা-অপহবণেব পব পল্লীসমাজেব বিচাবেব দৃশ্যটিতে।

মোগল বাজদববাবেব বর্ণনায লেখক বঙ্কিমেব প্রভাবমুক্ত। দেওয়ান-ই-খাস গোসলখানা ইত্যাদি বর্ণনায় বাখালদাস কল্পনাব আশ্রয় নিযেছেন। পরিবেশ বচনাব দিক থেকে এব মূল্য অপবিসীম। মোগল-অন্তঃপুবেব বর্ণনায় লেখক বমেশচন্দ্রেব অনুসবণ করেছেন। জাহানাবাব স্বেচ্ছাচাবিতা 'মাধবীকঙ্কণে'ব জাহানাবার কথা অবশ্যই স্মবণ কবিযে দেয়।

সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তাতাব বমণী এবং কাল্‌মকেব বিনোদিনী বৈষ্ণবীব গৃহে হানা দেওযাব দৃশ্যটি। এ বর্ণনায ঈষৎ স্থূলতা আছে সত্য, কিন্তু এ স্থূলতা বাস্তবসম্মত। তাতাব রমণী সবাব পান কবে, উপপতি গ্রহণে সে নির্বিচাব, মোগল হাবেমেব নানা গুপ্ত প্রযোজনে সে প্রধান সহায়িকা। কিন্তু কাল্‌মকেব প্রশ্নে সে যখন বলে, 'মোগল বাদশাহেব অন্দবমহলেব চাকবী, আব বাঙ্গালা মুলুকেব জবান, আব মরুভূমি এই তিনই সমান।' তখন এই বমণীব জীবনকাহিনীব চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ কবে। বমেশচন্দ্রেব মোগলদাসী তাতাবী জেলেখাব বর্ণনা আবেগেব পথ অনুসবণ কবেছে—বাখালদাস লঘু চালে একই বক্তব্য প্রকাশ কবেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে শাহজাহানেব পবিচয় বিশেষ নেই। ময়ূখে 'আশিক ও মাসুকে'র চিত্র কেবল ময়ূখ-গুলরুখেব বর্ণনাতেই নয় শাহজাহান মমতাজের চিত্র-রচনাতেও দীপ্যমান। এজন্য বোধ হয বাখালদাস সকলেব মিলনস্থলটি নির্বাচন কবেছেন মমতাজেব সমাধির পার্শ্বে। ললিতা, গুলরুখ, ময়ূখ, শাহজাহান, চৈতন্যদাস উদাব মানবপ্রেমে এসে মিলিত হযেছে মমতাজেব সমাধিপাশে। গুলরুখের যৌবনেব উচ্ছৃঙ্খলতা যখন নির্বাপিত, তখন ময়ূখ গুলরুখেব বেদনায় দীর্ণচিত্ত, ললিতাও গুলরুখের নৈকট্য অনুভব কবে, চৈতন্যদাসেব মানবতা করুণ-মধুব রূপ নেয়।

অসীম

'অসীম' দীর্ঘকাল ধরে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি জ্যেষ্ঠপুত্র অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত।

'অসীম' রচিত হয়েছে সম্রাট ফররুখসিয়রের রাজত্বের পটভূমিকায়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'অসীম' সত্যসত্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'এক অসীম ও মণিয়া ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নারী চরিত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।' 'শশাঙ্কে'র ভূমিকায় রাখালদাস বলেছিলেন মোগলশাসনের সময় বাঙালিজাতির অধঃপতন ঘটেছিল। রাখালদাসের এ মত কতটা সমীচীন সে বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু রাখালদাস সম্ভবত এই কারণেই বাঙালিবীর-চরিত্র অবলম্বন করে জাতির অধঃপতনের সময়েও দু-একটি উজ্জ্বল চিত্র রচনা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন।

'অসীম' দীর্ঘ রচনা। অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস হিসাবে বইটির আদর হয় নি। ভারতবর্ষ-সম্পাদক বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।[১] কাহিনীটি এই—

আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মোগলরাজ্য পতনোন্মুখ। রাজধানীর বিশৃঙ্খলা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুবাদাররা ঘন ঘন সম্রাটের পরিবর্তনে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বাদশাহ আলমের পর আজীম্-উশ্-শানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কলহ দেখা দেয়। আজীম্-উশ্-শানের পুত্র ফররুখসিয়র বাংলার কানুনগো হরনারায়ণের ভ্রাতা অসীম এবং ভূপেন্দ্রের পরিচিত। অসীমের গৃহে শান্তি ছিল না বলে ফররুখসিয়রের সঙ্গে দিল্লীর পথে পাটনা চলে আসে। পাটনায় অসীম মণিয়া বাঈয়ের সাক্ষাৎ পেলে। মণিয়া বাঈ অসীমের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। অসীম মণিয়ার প্রতি স্নেহ অনুভব করে, কিন্তু প্রেমের প্রশ্নে বিচলিত হয়। ওদিকে অসীমের সংবাদ জানবার জন্যে হরনারায়ণ পাটনাতে নবীন পরামাণিক এবং সরস্বতী বৈষ্ণবীকে পাঠান। অসীমের নামে গ্রামে কুৎসা রটনা হল গ্রামেরই একটি মেয়ে দুর্গাকে জড়িয়ে। হরনারায়ণও সমাজচ্যুত হয়ে পাটনায় চলে এলেন সপরিবারে। পাটনাতে অসীম-দুর্গা-মণিয়া কাহিনীর বর্ণনাই গ্রন্থের মূল বিষয়। মণিয়া অসীমকে লাভ করবার কোনো আশা নেই

১. শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪

দেখে হরনারায়ণের উপদেশমত বৈষ্ণব আচারে দীক্ষিত হল। ঘটনাক্রমে অসীম শৈলকে বিবাহ করলে। ফররুখসিয়র সম্রাট হয়ে অসীমকে হাজারমনসবদার করে বাংলার রুকনপুরের শাসনভার দিলেন।

এর পর দশ বছর অতিক্রান্ত। দিল্লীতে সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র লেগেই ছিল। ফররুখসিয়রের তখন চরম দুর্দশা। অসীম ও ভূপেন্দ্র রাজার এই দুর্দশার সময়ে দিল্লী এল। সম্রাট পরাজিত এবং বন্দী। ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। ফররুখসিয়রেরও মৃত্যু হল। অসীম মণিয়ার সঙ্গে চলল বৈষ্ণবের আরাধ্যদেবতা গোপালের সন্ধানে।

পুত্র অসীমের মৃত্যুশয্যায় রাখালদাস এই বই আরম্ভ করেছিলেন। শেষজীবনে রাখালদাস নিজেও দুঃখযন্ত্রণা পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল হতাশা। এজন্য 'অসীম' গ্রন্থে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার কথাই বার বার শুনি। ফররুখসিয়র সম্রাটপুত্র, কিন্তু তিনি সুজার কথা স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়েন— আশার পথ দেখতে পান না। মণিয়া পাটনার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, বাঈজী-জীবনে তার অর্থসচ্ছলতা অতি সহজেই ঘটতে পারত, কিন্তু অসীমের আশায় সে তার রূপকে ধিক্কার দিয়েছে, দুঃখকে চিরসঙ্গী করেছে। অন্ধ ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে, দুর্গার জীবনেও বৃন্দাবন আশ্রয় হয়েছে, সর্বোপরি গ্রন্থের নায়ক অসীম রায় মনসবদার হয়েও জীবনে একটা ব্যর্থতার সুরই অনুভব করেছে। এ-সব দেখে মনে হয় রাখালদাস তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দিকটিই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবনার জন্য উপন্যাসটিতে রচনাগত শিথিলতা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। ইতিহাস এ উপন্যাস-বৃত্তের একটি রেখা মাত্র। কেন্দ্রস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের আবর্ত লক্ষ্য করা যায় না। পাটনার ঘটনার অতি-বিস্তৃতি গ্রন্থটির অন্যতম ত্রুটি। এ বর্ণনায় যতটুকু সত্য আছে তা যে-কোনো সামাজিক উপন্যাসে স্থান পেলে আপত্তি ওঠবার কারণ থাকত না। রাখালদাস সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। এ উপন্যাসে সামাজিক উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভেদরেখাটি অবলুপ্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'ময়ূখে'ও সামাজিক বিশ্লেষণ আছে কিন্তু সেইটি সেখানে বেমানান হয় নি। গ্রন্থটিতে ত্রিবিক্রমের আচরণে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। অসীমের বিবাহও কতকটা আকস্মিক।

আরও এক কথা, দুর্গা-অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে হরনারায়ণের সতর্কতা এবং

জালবিস্তার অতিকথনদোষে দুষ্ট। বিষয়টি ক্ষুদ্র, এর জন্য এতটা স্থান নেবার প্রয়োজন ছিল না।

বৈষ্ণবভাব সুর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাজী, মণিয়া, দুর্গা এবং অসীমের মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু 'ধর্মপালে'র বালক চরিত্রে, 'ময়ূখে' চৈতন্যদাসের ভূমিকায়। এই-সব উপন্যাসে যা ছিল বীজাকারে 'অসীমে' তাই পত্রপল্লবে বিস্তৃত।

লুৎফ উল্লা

রাখালদাসের 'লুৎফ উল্লা' মাসিক বসুমতীতে ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত বার হয়েছিল। উপন্যাসটি বৃহৎ নয়। বসুমতীর সব সংখ্যায় লুৎফ উল্লার কাহিনী প্রকাশিত হয় নি। এ উপন্যাসে মোগল শাসনের শেষ দৃশ্যকে পটভূমিকা করা হয়েছে।

লুৎফ উল্লার কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃশ্যগুলি নাদির শাহের অত্যাচারের ঘটনা, মহম্মদ শাহের কাপুরুষতা, মন্ত্রী ফৌজদারের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রজাসাধারণের অকথ্য জ্বালাযন্ত্রণাভোগের বর্ণনা। এরই মধ্যে লেখক বাংলার আমীর আনন্দরাম, সুজাউদ্দীনের পুত্র আক্রমজমান খাঁ, নুরবাঈ এবং জগবাঈর কথা বলেছেন। আনন্দরাম ফকির শাহ লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে কি করে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের পূর্বে এবং আক্রমণের সময়ে প্রজাসাধারণের জন্যে অকাতরে সাহায্য করেছেন তার কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। বাংলাদেশ থেকে আনন্দরাম দিল্লীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থান পান। এদের দয়া এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাম মুগ্ধ হন। এই সময় দিল্লীর অবস্থা শোচনীয়।

'তখনও নুরবাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না।'[১]

আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও তিনি উদারচিত্ত। এই কারণে লুৎফ উল্লাকে তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে রাজ্যে নাদির শাহের বিরুদ্ধে

১. মাসিক বসুমতী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

প্রচণ্ড অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীব ওমরাহ, বাঈজী সকলের পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহাবে মুগ্ধ। মহম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে নাদিব শাহকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। নূরবাঈ মুক্তি চাইলে। সে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ নর্তকী। নাদিব শাহ তাকে পাবস্যে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করলেন। নূরবাঈ আনন্দবামেব সাহায্য প্রার্থনা কবলে। আনন্দবাম নূরবাঈকে রক্ষা কবলেন। কিন্তু নূববাঈয়েব অদর্শনে বাজ্যে নাদিব শাহ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। তখন নূববাঈ আপন সুখ বিসর্জন দিয়ে প্রজাব মঙ্গলেব জন্যে দিল্লীতে ফিরে এল। আনন্দরাম বন্দী হলেন। তাঁর বীরত্বের পবীক্ষা হল। দেখা গেল তাঁকে বেঁধে বাখতে পারে এমন শক্তি নাদিবেরও নেই। এব পব নাদির দিল্লীব ধনদৌলত ও অসংখ্য বন্দী দাসদাসী নিয়ে পারস্য যাত্রা করবাব মনস্থ করলেন। নূববাই, আনন্দবাম কৌশলে অনেক প্রজাকে মথুরা অভিমুখে পাঠিযে দিলেন। পবে আনন্দবাম আক্রমজমান খাঁ নূববাঈ এবং পদ্মিনী নাদিবেব বন্দীরূপে পারস্য অভিমুখে চলল। পথে এরাই অন্য বন্দীদেব মুক্ত কবে দিতে লাগল। নাদিব এই ব্যাপাব দেখে বিচাবের জন্যে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের উপর সমস্ত দোষ আবোপ কবে শাস্তি প্রার্থনা কবলে। নাদিব এদেব মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন।

'তখন শাহান শাহ নাদির শাহ নামিয়া আসিয়া নুরবাঈব বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে আমার হুকুমে তলোযাব পড়তে পারে না। দেশে ফিরে যাও। সকলে মুক্ত। অসম্ভাবিত করুণায় সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপুত হৃদয়ে বিজেতার পদতলে লুটাইয' পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, সে মূর্ছিত হইযা পড়িয়াছিল।'১

রাখালদাস নাদির শাহেব আক্রমণেব সময়ে ভারতবর্ষেব যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবসম্মত এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। চিন কিলিচ খাঁ, সাদাৎআলিব দ্বন্দ্বে, আমীব ওমবাহেব কূটনীতিতে তখন দিল্লী দববার বিক্ষুব্ধ। বাদশাহরা আসলে মন্ত্রী আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। নাদির শাহেব অত্যাচারেব বর্ণনা সর্বজনবিদিত। জাট অধিবাসীদের কথাও ঐতিহাসিক।

যে উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে রাখালদাস হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেব উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন সে প্রেরণার একান্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখা যায়। 'অসীম' থেকেই এই দুর্বলতাব সূত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চবিত্র এ গ্রন্থে

১. মাসিক বসুমতী, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ

নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। মণিয়া বাঈ নূরবাঈয়েব পূর্বসূরী, আনন্দরাম অসীমের নবসংস্করণ।

এনায়েৎউল্লার পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতা, মহম্মদ শাহের নূরবাঈয়েব প্রতি আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে ব্যর্থতা 'অসীম' উপন্যাসের কথা স্মরণ কবিয়ে দেয়। মহম্মদ শাহের করুণ দিকটি রাখালদাসেব ব্যক্তিগত জীবনেব সঙ্গে তুলনীয়।

উপন্যাস হিসেবে লুৎফ উল্লা সার্থক নয়। কোনো চবিত্রের বিশেষত্ব নেই, বিকাশ নেই। সকল চবিত্রই একঘেয়ে, গতানুগতিক। তবে নূরবাঈয়েব উদারতা মর্মস্পর্শী। দেশেব প্রতি আন্তরিক প্রীতিব পবিচয় পাই নূরবাঈয়েব একটি উক্তিতে। নাদিব শাহ্ পাবস্যেব ঐশ্বর্য বর্ণনা কবে নূববাঈকে প্রলোভিত কববাব চেষ্টা কবলে নূববাঈ বলেছিল—

'বুলন্দপনা, যা চোখে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা,—জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।'১

পদ্মিনীব প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকিব শাহ্ লুৎফ উল্লার লচ্ছেদার বাবড়ীব প্রতি আসক্তি এবং লোভেব বর্ণনায় বাখালদাসেব বচনাবীতির লঘুতা পীডাদায়ক এবং বিষয়টিব বিস্তৃতিও অনাবশ্যক ছিল। উপন্যাসটিব লুৎফ উল্লা নামও সার্থক নয়।

ধ্রুবা

এই উপন্যাসটি প্রবাসীতে ১৩৩৮ সালেব কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাব হয়। রাখালদাস লুৎফ উল্লাব মতো এটিকেও গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছেন,

'পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক ও তহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাস পূর্বে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পূর্বে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা ঐতিহাসিক না হইলেও ইহার মুখ্য আখ্যানবস্তু ঐতিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাজশক্তির পতনের অন্যতম কারণ লক্ষিত হইবে।'

১. মাসিক বসুমতী, ১৩৩৪ চৈত্র

উপন্যাসটি লুৎফ উল্লার আগের লেখা।

যে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বড়ো বেশি ছিল। কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। 'পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার মত বৃদ্ধেব আশায় পথ চাহিয়া আছে।' এইটি গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত কি? নাটকাকাবে রচিত হয়েছিল বলে উপন্যাসটিতে কয়েকটি নাটকীয় আবেগময় মুহূর্তেব সুন্দব উপস্থাপন দেখি।

পরিশিষ্ট

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকগণের (বর্ণানুক্রমিক) এবং গ্রন্থের একটি তালিকা দিলাম। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কতগুলি আসলে জীবনীপর্যায়ের গ্রন্থ। আবার কতগুলি গল্পমাত্র। প্রথমে গ্রন্থকার পরে গ্রন্থনাম ও বন্ধনীতে প্রকাশকাল দেওয়া হল।

অজ্ঞাত, অপূর্ব কাবাবাস (১৮৭১) বিভাবতী (১৮৭১) কমলাবতী (১৮৭২) সবোজিনী (১৮৭২) বিজয় সিংহ (১৮৭৪) অপূর্ব সহবাস (১৮৭৪) বনবালা (১৮৮২)। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পলাশী সূচনা (১৯১০)। অনুরূপা দেবী, বামগড (?) ত্রিবেণী (?)। অবিনাশচন্দ্র দত্ত, বিজলী (১৯০৩)। অমলানন্দ বসু, বামেশ্বর দুর্গ (১৯১২)। অম্বিকাচরণ গুপ্ত, কপট সন্ন্যাসী (১৮৭৪), পুবাণ কাগজ (১৮৯৯), কমলে কণ্টক (?)। আনন্দচন্দ্র মিত্র, বাজকুমারী (১৮৭৯)। আবু মহম্মদ ইসমাইল হাসান, ঈশা খাঁ ও বায় চৌধুবানী (১৯১৬)। 'আশালতা' প্রণেতা, ভ্রমব (১৩১৬ দ্বি, স)। আশুতোষ বিশ্বাস, বীরজয় উপাখ্যান (১৮৬৯)। উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ভারতীয় উপন্যাস (১৮৮০)। উমেশচন্দ্র বিশ্বাস, সমর বাসনা (১৮৭৭)। উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতাপসংহাব (১৮৭৯)। একজন পরিব্রাজক, শৈলবালা (১২৮৮)। করুণাকান্ত ভট্টাচার্য, শেঠ দুহিতা (১২৯০)। কালিদাস মুখোপাধ্যায়, যদু বায় (১৮৯৯)। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, রশিনাবা (১৮৬৯)। কালীপ্রসন্ন দত্ত, বিজয (১২৯১)। কালীবর ভট্টাচার্য, অকাল কুসুম (১৮৬৯)। কিশোবীমোহন বায়, হামিব (১২৯৮)। কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, একাকিনী (১৮৮০)। কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সিন্ধুগৌবব (১৯০৯)। কুসুমকুমাবী দেবী, লুৎফউন্নেসা (১৯২৪)। কৃষ্ণানন্দ শর্মা হীবাবাই (১৯০৫)। কেদাবনাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকেতু (১২৮৫)। কেদাবনাথ দত্ত, প্রিয়ংবদা (১৮৫৫)। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন (১৮৮০)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নাবায়ণী (১৯১৯)। ক্ষেত্রগোপাল বায়, ইন্দ্রকুমাবী (১৮৯১)। গজপতি রায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৩) চন্দ্রবোহিণী (?)। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, চিত্ত বিনোদিনী (১৮৭৫)। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়াবিনী (১৮৭৭), বীরবরণ (১৮৮৪)। চণ্ডীচরণ সেন, মহাবাজ নন্দকুমাব (১৮৭৫) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) অযোধ্যায় বেগম (১৮৮৬) ঝান্সীর রানী (১৮৮৮) এই কি বামেব অযোধ্যা (১৮৯৫)। চারুচন্দ্র দত্ত,

কৃষ্ণবাও (?)। জয়কুমার বর্ধন রায়, অদৃষ্ট চক্র (১৩২০)। তারকনাথ বিশ্বাস, কমলা (১২৯০) সুহাসিনী (১৮৮২)। তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী (১৯০৮)। দামোদর মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময়ী (১৮৭৪) তিলোত্তমা (?) প্রতাপ সিংহ (১৮৮৪)। দীনেন্দ্রকুমার রায়, উজীরনন্দিনী (১৯১২) নানা সাহেব (১৯২৭) হামিদা (১৮৯৯)। দুর্গাদাস লাহিড়ী, রানী ভবানী (১৩১৬) রাজা বামকৃষ্ণ (১৩১৭) লক্ষ্মণ সেন (১৩২০)। নকুলেশ্বব বিদ্যাভূষণ, আকবব (১৮৯৮) কুমুদানন্দ (১৯০৭)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অমব সিংহ (১২৯৬) জয়ন্তী (১৩৩০)। ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোহিনূব (১৯০৭)। নবকুমার দত্ত, অমবাবতী (১৯০৮)। নবীনচন্দ্র সেন, ভানুমতী (১৩০৭)। নিখিলনাথ বায়, পৃথ্বীবাজ (১৯২৮)। পদ্মাবতী দেবী, বাজপুত বীরাঙ্গনা (১৩৩৫ তৃ, স)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গাধিপ পবাজয় ১ম ও ২য় (১৮৬৯, ১৮৮৪)। প্রবোধচন্দ্র সরকাব, শালফুল (১৮৯৭)। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীব মেযে (১৯২২) বাঙ্গালী বীব (১৩৩০) দেবতার দান (১৯২৩) দোকানদাব (১৯২১) বাঙ্গালীব মা (১৯৩২ দ্বি, স)। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মণিভদ্র (১৩২১)। প্রিয়কুমাব চট্টোপাধ্যায, নীলাম্বর (১৯২৫)। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তাস্তিয়া ভিল (১৮৮৯) ফকিবচন্দ্র বসু, উজীর পুত্র (১৮৭২) শিবাজীর অভিনয় (১৮৭০)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) মৃণালিনী (১৮৬৯) চন্দ্রশেখব (১৮৭৫) আনন্দমঠ (১২৭৯) রাজসিংহ (১২৮৮) দেবী চৌধুরানী (১২৯০) সীতাবাম (১২৯৩)। 'বনপ্রসূন' রচয়িত্রী, সফল স্বপ্ন (?)। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, বঙ্গ বীবাঙ্গনা রায় বাঘিনী (১৯১৯)। বিনোদবিহারী শীল, বেগম মহল (১৯১০) জুঁই মহল (১৯১৯)। বিপিনমোহন সেন, চাঁদরানী (১৮৮৪)। ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, বাসন্তী (১৯০৪)। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তুমি কি আমাব (১৮৭৮)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭)। ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক (১৯১৫)। মদনমোহন মিত্র, সমব শায়িনী (১৮৭৩)। মধুসূদন পাল, সংসার লীলা (১৮৯৮)। মণীন্দ্রনাথ বসু, সফিয়া বেগম (১৯০৯)। মনোমোহন বসু, দুলীন (১৮৮৩)। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশমান তারা (?)। যদুনাথ ভট্টাচার্য, রাজা শচীপতি বায় (১৯১৭) বক্তিয়ার খিলিজি বা বঙ্গ-বিজয় (?) রাজা দেবল রায় (১৯১৩) রাজা শত্রুজিৎ সিংহ (১৯১২)। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপসকুমাব (১৯০৫) বন্ধনমুক্তি (১৯১২) অনুরাগ (১৯১৪)। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শোভাসিংহ (১৩১৫)। যোগেন্দ্রচন্দ্র দে ও

নিত্যানন্দ রায়, নগনন্দিনী (১৮৮০)। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দরাফ খাঁ (১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮২) রাজর্ষি (১২৯২)। রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯)। বসিকচন্দ্র বসু, কালাপাহাড় (১৯১০)। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায, শশাঙ্ক (১৯১৪) ধর্মপাল (১৩২৩) করুণা (১৩২২) ময়ূখ (১৩২৭) অসীম (১৩৩১) লুৎফ উল্লা (১৩৩৪) ধ্রুবা (১৩৩৮)। বাজকৃষ্ণ আঢ্য, কামরূপ কামলতা (১৮৭১)। বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বীববালা (১৮৭০)। বামগতি ন্যাযরত্ন, ইলছোবা (১৮৯২)। লক্ষ্মীনাবাযণ ঘোষ, সংসাব দর্পণ (১৮৭৬)। লক্ষ্মীনাবাযণ চক্রবর্তী, শকদুহিতা (১৮৯৯)। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীব বল (১৩১৮) রাজা গণেশ (১৯১৪) বানী ব্রজসুন্দবী (?) বীবপূজা (১৩১২)। শফী অন-দীন-আহমদ, কনোজকুমাবী (১৯১৭)। শবৎকুমাব বায, মোহনলাল (১৯০৬)। শবৎচন্দ্র ধব, রানী জযমতী (১৯১১)। শশিচন্দ্র দত্ত, উপন্যাসমালা (১৮৪৫)। শশিভূষণ বিশ্বাস, সোনাবিবি (১৯১২)। শ্যামলাল গোস্বামী, নূবজাহান (১৯১৫)। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বানী লক্ষ্মীবাঈ (১৯২২) বামপাল (১৯১৪) বঙ্গেশ্বব (১৯০৪ তৃ, স)। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শক্তি-কানন (১৮০৯ শকাব্দ) ফুলজানি (১৮৯৪) বিশ্বনাথ (১৮৯৬) বাইবনী দুর্গ (১৩১৩-১৩১৪ পুস্তকাকাবে অপ্রকাশিত)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, জাল প্রতাপচাঁদ (১২৮৯)। সত্যচবণ চক্রবর্তী, বানী দুর্গাবতী (১৩২৭) সংযুক্তা (১৯৩১)। সত্যবঞ্জন বায়, বেণী বায (১৯১৬) রাজা দেবীদাস (১৯১২)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঙ্কানিশান (১৩৩০ পুস্তকাকাবে অপ্রকাশিত)। সীতানাথ চক্রবর্তী, সবোজসুন্দবী (১৯১২)। সুবঙ্গিনী (শ্রীমতী), তারাচবিত (১৮৭৫)। সুরেন্দ্রনাথ বায়, পদ্মিনী (১৯১৫) বঙ্গবিজয় বা ভীষকদুহিতা (১৯২০)। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, লাল পল্টন (১৯১৪ দ্বি, স) বৈরাগীব হাট (১৯১৯) ভবানীর মঠ (?) সোনাব কণ্ঠী (১৯০৪) স্বপ্নসুন্দবী (১৯০৮) যোগবানী (১৯০৫)। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, লজ্জাদেবী (১৯৩০)। সূর্যকুমাব সোম, মধুমালতী (১৯১৬)। স্বর্ণকুমারী দেবী, দীপ নির্বাণ (১৮৭৬) মিবাবরাজ (১৮৮৭) হুগলীর ইমামবাডী (১৮৮৮) বিদ্রোহ (১৮৯০) ফুলের মালা (১৮৯৫)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কাঞ্চনমালা (১৯১৬ দ্বি, স) বেণেব মেয়ে (১৯১৯)। হাবাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা (১৩০৪) রানী ভবানী (১৩১০) প্রতিভাসুন্দরী (১৯০৪) মন্ত্রের সাধন (১৩০৫) জ্যোতির্ময়ী (?)। হারাণচন্দ্র রাহা, রণচণ্ডী (১৮৭৬)। হরিনারায়ণ

আপ্তে, সিংহগড (১৯২৭)। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়াবতীর উপাখ্যান (১৮৬৩) কমলাদেবী (১৮৮৫)। হবিসাধন মুখোপাধ্যায়, রঙ্গমহল (১৯০১) শীশ্‌মহল (১৯১২) নূবমহল (১৯১৩) রঙ্গমহল রহস্য (১৯১৪) সুখের বাসব (১৯১৪) রূপেব মূল্য (গল্পগুচ্ছ ১৯১৪) কঙ্কণচোব (১৯১৬) লাল চিঠি (১৯১৭) মতিমহল (১৯১৭) মবণেব পবে (১৯১৭) শাহজাদা খসরু (১৯১৮) নীলাবেগম (১৯১৯) পান্নাব প্রতিশোধ (১৯১৯) দেওয়ানা (১৯২০) গুলকাশেম (১৯২০)।

নির্ঘণ্ট